থাকিত না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যেও নীচ শূদ্রাদি প্রধান এবং প্রধান ব্রাহ্মণাদি নীচ হইয়া যাইত।

সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥ ২২॥

এই সমুদায় লোক দণ্ডভয়েই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ লোক পাওয়া দুর্ঘট। এই সমুদায় জগতই কেবল এক দণ্ডের ভয়ে স্ব স্ব বিষয়ভোগে সমর্থ হইতেছে।

দেবদানবগন্ধর্ব্বারক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ॥ ২৩॥

দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস পক্ষী সর্পাদিও দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের ভয়পীড়িত হইয়াই ইন্দ্রাদি দেবগণ বর্ষণাদি কার্য্য করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে—সেই জগদীশ্বরের ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দেন, ইন্দ্র, পবন ও যম স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকেন।

দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ॥ ২৪॥

দণ্ড প্রণয়ন না করিলে অথবা অনুচিতরূপে দণ্ড প্রবর্ত্তন করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দূষিত হয়, অর্থাৎ পরস্পর স্ত্রীগমনাদি দ্বারা সঙ্কর দোষ ঘটিয়া উঠে, সর্ব্ব নিয়ম উৎসন্ন হইয়া যায়, এবং দস্যু তস্করাদির উপদ্রবে জগতে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়।

যত্র শ্যামোলোহিতাক্ষোদণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি॥ ২৫॥

যে দেশে শ্যামবর্ণ লোহিতনয়ন পাপনাশকারী দণ্ড বিচরণ করে, দণ্ড প্রণেতা সম্যক বিবেচনা করিয়া তথায় যদি দণ্ড প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে প্রজারা ব্যাকুল হয় না।

তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনং।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদং॥ ২৬॥

মন্বাদি ঋষিগণ অতিবেকাদিগুণসম্পন্ন, সত্যবাদী, বিমৃষ্যকারী, তত্ত্বা-তত্ত্ব বিচারক্ষম, বুদ্ধিমান, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গবেদী রাজাকে সেই দণ্ডের প্রণেতা বলিয়া বলেন। অর্থাৎ যাঁহার সত্যবাদিতা ও বুদ্ধি বিবেচনাদি গুণ আছে, তিনিই দণ্ডপ্রণয়নে অধিকারী।

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে কাষ্ঠ দণ্ড খাড়া রাখিবার কৌশল।

দেড় যব স্থূল তিন যব প্রস্থে এবং এক হাত দীর্ঘ, এক খণ্ড সরল চতুষ্কোণ কাষ্ঠ লইবে। পরে উহার ঊর্দ্ধ ভাগ হইতে এক চতুর্থাংশের নিম্নে ঠিক দুই পার্শ্বে দুই খানি সমান ওজনের ছুরিকা কিঞ্চিৎ হেলাইয়া বিঁধিবে অর্থাৎ ছুরীর বাঁট যেন কাষ্ঠে সংলগ্ন হইয়া না থাকে এবং কাষ্ঠ খণ্ডের পার্শ্বদ্বয় হইতে ছুরিকাদ্বয় পর্য্যন্ত ব্যবধানও যেন সমান হয়। ছুরীর অগ্রভাগ কিঞ্চিৎমাত্র কাষ্ঠে বিদ্ধ থাকিবে এবং উহাদের তীক্ষ্ণ প্রদেশ যেন কাষ্ঠ খণ্ডের দিকে থাকে। তৎপরে কাষ্ঠখানির নিম্নভাগ তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রভাগে খাড়া করিলে উহা বিনা অবলম্বনে সুস্থির থাকিবে, কোন দিকে পতিত হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই, ছুরিকাদ্বয় দ্বারা কাষ্ঠ খণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ ভার তুল্যরূপে রক্ষিত হয়; তজ্জন্য উহা সুস্থির থাকে।

পাদপূরণ।

কবিভূষণ! পূরণ কর,—তোমার আমার দেখায় প্রভেদ বিস্তর।

উত্তর—এক দিন বিভীষণ ভর্সিত বচনে।

করিল বিস্তর নিন্দা দুরন্ত রাবণে,—
ছি ছি রক্ষরাজ! একি দেখি তব কাজ,
পর নারী হরিতে না হয় মনে লাজ?
নয়নে সর্ব্বদা দেখি সুন্দরী অনেক।
নাহি যায় জ্ঞান বুদ্ধি, না যায় বিবেক।
না হই তোমার মত মোহেতে মোহিত।
তোমার সকলি হেরি অতি বিপরীত।
হাসিয়া রাবণ বলে,—তব বাক্য মানি।
তুমি যে হবে না মুগ্ধ, তা ত আমি জানি।
জগতে ধরে না যার রূপের মাধুরী,
কত সুখ পাবে তারে দুনয়নে হেরি?
বিশ নেত্রে হেরি আমি রূপের সাগর।
তোমার আমার দেখায় প্রভেদ বিস্তর।

—০—

কল্পদ্রুম।

প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি।

পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাগ্রে সভ্যতাপদবীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রকট যৌবন যখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কে সে তীব্র রূপগরিমা এক দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত?—চাহিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া পড়িত। তেমন শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি-প্রাগল্‌ভ্যের কি তুলনার স্থান আছে? আজ বৃদ্ধ ভারত; পলিতকেশ, গলিতচর্ম্ম, যষ্টির অবলম্বন না হইলে পা উঠে না, শিশু সভ্যেরা তদ্দর্শনে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। বৃদ্ধ হইলে মতিচ্ছন্ন হয়, তাহা ত জানেন না! বল বুদ্ধি কি চির দিন থাকে? বলিব না কেন?—সহস্র মুখে ভারতের গুণগরিমার উদ্ঘোষণ কেন না করিব? আমরা ভরতবাসী, তাই কি বলিতেছি? এত আত্মশ্লাঘা রাখি না; বলিবার অধিকার আছে, তাই এমন কথা বলিতেছি। মনে নাই, এই ভারতে বিকট-ঘোটকোদ্ধূট্টিত ক্ষিপ্র খুর রেণুতে রবিশশিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, দোর্দ্দণ্ড কোদণ্ড টঙ্কারে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল স্তব্ধ হইয়াছিল? গরিমা নয়?—ভারতে কি না হইয়াছিল? অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের তুলনা? অন্য দেশের বনে হিংস্রক পশু জন্মে; ভারতের তেমন বন নয়। জান না?—এই বন রত্ন প্রসব করিয়াছে। এই বেদ এই স্মৃতি এই বনের ধন; কাব্য নাটক এই বনে, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা এই বনে হইয়াছিল। ভারতের সঙ্গে কার তুলনা? আজ আমরা অশক্ত জড়বৎ হব না?—ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কত কালের লোক হইলাম; সম্বন্ধ নাই,—তাই যা বল; নচেৎ আমাদিগকে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলিয়া ডাকিলেও উপযুক্ত সম্পর্কে গৌরব দেখান হয় না। আমরা কত জাতির মাতামহকে হাতে করিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছি; জিজ্ঞাসা কর ফিনিক্ আরব মিশর কি বলে।

মনুষ্য-বুদ্ধিবলে এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিদ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ভারতের প্রসূত। তন্মধ্যে কোনটী এই দেশেই হৃষ্ট পুষ্ট

হইয়াছে, কোনটী দেশান্তরে গিয়া শ্রী-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্ক-শাস্ত্রেরও সূত্রপাত প্রথমে ভারতবর্ষে হইয়াছিল; বিদেশে ইহার যতই শাখা প্রশাখা প্রসারিত এবং পরিবর্দ্ধিত হউক না, কিন্তু অঙ্কবিদ্যার জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এ দেশ হইতে মিশর ফিনিক্ এবং আরব বণিকেরা ঐ বিদ্যা স্ব স্ব দেশে লইয়া যান, তৎপরে উহা ইউরোপের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে অনেকেই অঙ্কশাস্ত্রের কৌশল অল্প অল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন; বাণিজ্য কার্য্যের সুগমার্থ মিশর ফিনিক এবং আরব বণিকেরা যথাসাধ্য ইউরোপের অনেক জাতিকেই এই বিদ্যায় উপদেশ দিতেন, কালিফ আল্ মামুনের শাসনাধীনেই অঙ্কশাস্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে মিশর দেশীয় নরপতি ভারতবর্ষের যাবতীয় শাস্ত্রের স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে রাজবিপ্লবে বিস্তর পুস্তক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগারে যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক রক্ষিত হইয়াছিল, আজ সেই সমস্ত মহামূল্য গ্রন্থরাশি থাকিলে ভাবনা কি? কত পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত, তাহার স্থিরতা নাই। আর্য্যজাতির আজ দ্বিগুণতর গৌরব বৃদ্ধি হইত। কিন্তু সেই স্তূপাকার পুস্তকরাশি জিগীষু নৃপতির দুর্বৃত্তিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

আবু জাফর মহম্মদ বেন্ মুষা আল্খারিমি গণিত পুস্তক, ভারতবর্ষের গণিতশাস্ত্রের অনুবাদ। আরবেরা ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণেরাই মূল পুস্তকের রচয়িতা। সপ্তম কিম্বা অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদ নগরে উক্ত অনুবাদ পুস্তক দৃষ্ট হয়, পরে পুনর্ব্বার উহা লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল (১)। য়ুইপিক অনুমান করেন যে, দুটী প্রশস্ত উপায় দ্বারা গণিত শাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরব প্রভৃতি দেশে নীত হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে বাণিজ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ মিশর দেশীয় বণিকেরা অঙ্কবিদ্যা আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীতে লইয়া গিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন প্লাটিনস নিউমারিনো প্রভৃতি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উজ্জয়িনীর বণিকদের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরিশেষে আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে অঙ্কবিদ্যা রোম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে চালিত হয়।

যে কোন প্রকারেই হউক, অঙ্কশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে যে ইউরোপের

(1) Man Mulbr's 'Chips from a german workshop'.

হিমধৌত শীতল মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছে, তাহাতে আর মতবিসম্বাদিতা নাই। সর্ব্বাদৌ লোক প্রাচীরে গোময় কিম্বা অন্য কোন বর্ণক দ্রব্যের ফোটা দিয়া রাখিত, তখনও প্রকৃত গণনা প্রথা প্রচলিত হয় নাই। কেহ বা রজ্জুতে গ্রন্থি দিয়া রাখিত, কেহ বা যষ্টিতে চিহ্ন করিত। প্রকৃতির কৌমারাবস্থায় এই সরল গণনার রীতি অদ্যাবধি কোল, সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, প্রভৃতি অশিক্ষিত প্রাকৃত লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্বচিৎ কোন কোন ধাঙ্গড় গণনা বিদ্যায় পরিপক্ক হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের অনেকেই নিতান্ত নিরীহ; সরল হৃদয়ে কেবল সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। একটী সংখ্যা চারি পাঁচবার আবৃত্তি করিলে তবে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়। পূর্ব্বে ইংরাজেরা সাঁওতালদের সঙ্গে রণমদে মাতিয়া যার পর নাই নিন্দিত অবৈধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সে কেবল সুকোমল কুসুম দলে বজ্রপাত করা হইয়াছিল। নিরপরাধ সাঁওতালেরা এখনও মাতৃগর্ভে আছে বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। একমাত্র অযথা গণনাই সেই ঘোর বিভ্রাটের মূলীভূত কারণ। সাঁওতালেরা নগরে দধি দুগ্ধ ঘৃত বিক্রয় করিতে আসিত, ভূস্বামীকে রাজস্ব দিতে আসিত, লোকে তাহাদিগকে নিরীহ পাইয়া প্রবঞ্চনা করিতে ত্রুটি করিত না। বিক্রেয় দ্রব্যই হউক, আর অর্থই হউক গ্রহীতারা স্বহস্তে গণনা করিয়া লইতেন। প্রথম সংখ্যা রাম আরম্ভ করিলেন, তাহার আর শেষ হয় না; উপর্য্যুপরি দশ পনর বার রামই আবৃত্তি করিলেন। শিষ্টপ্রকৃতি সাঁওতালেরা বিনীত ভাবে বলিত,—রাম কথাটী ছেড়ে আর একটী বল ভাই! পাঠক! কত দূর অজ্ঞ দেখুন, তখন তাহারা দুই পর্য্যন্ত গণিতে জানিত না। রাজস্ব দিবার সময় রজ্জুর গ্রন্থিতে টাকার সংখ্যা মিলন করিয়া আনিত, তদ্ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু টাকা সঙ্গে রাখিত। প্রকৃত হিসাবের উপর অধিক রাজস্ব লাগিলে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল।

এ সমস্ত প্রাকৃত লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আদিম মনুষ্য জাতির উন্নতিপ্রক্রম বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। নিম্ন বঙ্গেও অদ্যাপি বনবাসী অসভ্য জাতির কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত আছে। নিরক্ষর নীচ জাতিরা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিবার সময় যষ্টিতে চিহ্ন করিয়া লয়, কেহ বা প্রাচীরে খটিকা দ্বারা চিহ্ন করিয়া রাখে। যে সভ্যজাতি আজি অঙ্কশাস্ত্রের সূত্র কৌশলে মনোগত নিগূঢ় সন্ধি পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিতেছেন,

এক কোটি পঁচিশ লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়া নভশ্চর গ্রহাদির নানাবিধ পরমাদ্ভুত ব্যাপার গণনা করিতেছেন, একদিন তাঁহাদের আদিম অবস্থা এই সমস্ত সামান্য গ্রাম্য লোকের মতই ছিল। আর আমাদের যে আদি পুরুষ, যাঁহারা আচার্য্য-বেদিকায় সমাসীন হইয়া সর্ব্বজাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদেরও পূর্ব্ব পুরুষেরা এই রূপে রজ্জুতে গ্রন্থি দিয়াছেন, এইরূপে প্রাচীরে অঙ্কপাত করিয়াছেন।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে ক্রমে লিপি-কৌশল প্রচলিত হইল। কিন্তু লিপিকালের অনেক পরে অঙ্কপাত পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সংখ্যারাশি শব্দে লিখিত হইত, যথা,—এক, দশ, বিংশতি ইত্যাদি। অথবা বর্ণমালার অক্ষর বিশেষের দ্বারা অঙ্কগুলি লিখিত হইত। ১, ১০, ২০, এইরূপ অঙ্কপাতের সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে হয় নাই। এই সমস্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন গণিত শাস্ত্রের সৃষ্টির সঙ্গে গৃহীত হইয়াছিল, এই রূপ বিবেচনা হয়। কারণ সংখ্যারাশিবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্কলন এবং ব্যবকলন ক্রিয়া রহিয়াছে। পঞ্চদশ বলিলে দশ এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইল; একোনবিংশতি বলিলে (২০—১) ব্যবকলন ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। এ দিকে আবার সংখ্যা রাশিতে দশমিক প্রথা অনুস্যূত রহিয়াছে। বিংশতি বলিলে দশগুণিত দুই (১০×২) ত্রিংশৎ বলিলে দশগুণিত তিন (১০×৩) এই প্রকার গুণের সূত্র অনুস্যূত থাকিবার তাৎপর্য্য কি? অপরঞ্চ, অঙ্ক কয়েকটীর সংখ্যা দশ পর্য্যন্ত, (০) শূন্য—অঙ্ক কিছুই নহে। ইহাতেও গণিত শাস্ত্রের কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নিহিত আছে, সন্দেহ নাই। সেই গূঢ় তাৎপর্য্যটী কি? ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, হস্তে সর্ব্বসমেত দশটা অঙ্গুলি, আদিম মনুষ্যেরা যখন সংখ্যা গণনা করিতে জানিতেন না, তৎকালে তাঁহারা করাঙ্গুলিতে সংখ্যা নিশ্চিত করিতেন। দশটী অঙ্গুলির মধ্যে একটী অঙ্গুলি দ্বারা বাকি অঙ্গুলিকে চিহ্নিত করিলে নির্দ্দেষ্টা অঙ্গুলটী গৃহীত হয় না। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা যদি অন্য অঙ্গুলিগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখান হয়, তবে তর্জ্জনী অঙ্গুলি স্পৃষ্ট হইবার উপায় নাই; তজ্জন্যই রূঢ় অঙ্ক গুলির সংখ্যা নয়টীর অধিক নহে। এই যুক্তি সর্ব্বথা বিবেচনাসঙ্গত বোধ হয় না। একটী অঙ্গুলি স্পৃষ্ট হয় না বলিয়া দশটী অঙ্গুলির মধ্যে কেবল নয়টী মাত্র অঙ্ক পরিগৃহীত হইয়াছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসার ও অলীক বোধ হইতেছে। কোন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নয়টী অঙ্গুলি চিহ্নিত হইলে

পরে অপর একটী অঙ্গুলি দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, মনুষ্যের হস্ত পদে বিশটী অঙ্গুলি; সকল গুলিকে নির্দ্দেশ করিলে সংখ্যা রাশিরও বৃদ্ধি হইত। ইংরাজিতে সংখ্যার সাংকেতিক চিহ্নকে ডিজিট কহে। লাটিন ডিজিটস্ শব্দের অর্থ অঙ্গুলি। বোধ করি তজ্জন্যই সকলে অনুমান করেন যে, নয়টী করাঙ্গুলি হইতে নয়টী রূঢ় অঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এ স্থলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অবান্তর তর্কপথ আশ্রয় করাতেই এ প্রকার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। আদৌ গণিত শাস্ত্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণদিগের সম্পত্তি। সে স্থলে ডিজিট শব্দ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহের প্রত্যাশা নাই। লাটিন ভাষার অঙ্গুলি, গ্রীক্ ভাষার নির্দ্দেশকরা, এরূপ ধাত্বর্থ লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গণিত বিদ্যা সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, অতএব আর্য্য ভাষায় সংখ্যা জ্ঞাপক কোন্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত ভাষায় সংখ্যার সাঙ্কেতিক চিহ্নকে অঙ্ক বলে। লিপি-কৌশল ও অঙ্ক শাস্ত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাচীরাদিতে এক একটী চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত, তজ্জন্য উক্ত সাংকেতিক চিহ্ন অঙ্ক নামে খ্যাত। সংস্কৃত ভাষায় অঙ্ক কিম্বা সংখ্যা জ্ঞাপক, এমন কোন শব্দ নাই যাহা ডিজিট শব্দের সদৃশ হইতে পারে। গণিত শাস্ত্রের অনুবাদকেরা সংস্কৃত অঙ্কের স্থলে ডিজিট শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আদৌ অনুবাদকের ঐ শব্দ সম্বন্ধে কোন অভিসন্ধি ছিল না। ডিজিট শব্দই তাঁহার অধিক সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি উহার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ এই কৌতুককর ব্যাখ্যা অনুকল্পিত হইবে, লেখক তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সংস্কৃত পুস্তকের অনেক স্থলে পরিচ্ছেদ ভাগ তরঙ্গ কল্প প্রভৃতি শব্দে লিখিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত শব্দ দৃষ্টে কোন অভিনব ভাবাকর্ষণ করিলে আর্য্য ভাষায় ঘোরতর একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে।

রূঢ় অঙ্কগুলি নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই পদ্ধতি যে কোন বিশেষ কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এমন বিবেচনা হয় না। গণিত শাস্ত্রকার দশটী কিম্বা এগারটী রূঢ় সংখ্যা গ্রহণ করিলেও আজি সেই আপত্তি উত্থাপিত হইত। যে কারণে এক শত পর্য্যন্ত সংখ্যায় একটী রাশিপাটী সমাপ্ত করা হইয়াছে, এখানেও সেই কারণ অঙ্কপাতের নিয়ামক। এক্ষণে অঙ্কপাতের রাশিপাটী পর্য্যালোচনা

করুন, যাবতীয় গূঢ়সন্ধান হস্তগত হইবে। যাহা হউক, সংখ্যাজ্ঞাপক দশটী রূঢ় অঙ্ক গ্রহণে যদি কিছু নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকে, তাহা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা উচিত, সেই সমস্ত প্রাচীন জাতি পূর্ব্বে কি প্রণালীতে অঙ্কপাত করিতেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, রোমকেরা আর্য্য গণিতশাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমক-দিগের অঙ্কপাত প্রণালীতে ১, ২, ৩ এ প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা বর্ণমালার বর্ণবিশেষের সংখ্যা লিখিতেন। যথা এক (I), দুই (II) চারি (IV) পাঁচ (V) ছয় (VI) ইত্যাদি। এস্থলে বর্ণবিশেষের সঙ্কলন এবং ব্যবকলনও গৃহীত হইয়াছে। ইহুদী জাতিকেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের বর্ণমালার প্রথম নয়টী বর্ণ ক্রমান্বয়ে এক হইতে নয় সংখ্যার (১—৯) জ্ঞাপক। তৎপরবর্ত্তী নয়টী বর্ণ দশ হইতে যথাক্রমে নব্বই সংখ্যার (১০—৯০) জ্ঞাপক। বর্ণমালার শেষ চারিটী বর্ণ যথাক্রমে এক শত হইতে চারি শত সংখ্যার (১০০—৪০০) জ্ঞাপক। গ্রীস্ দেশীয় লোকেরাও বর্ণ দ্বারা অঙ্কপাত করিতেন। আরব বাসিরাও পূর্ব্বে অঙ্কপাতের নিমিত্ত বর্ণ ব্যবহার করিতেন। আরবি ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমে বাম ভাগে লিখিয়া আসিতে হয়, কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন; অতএব গুরুর অবমাননা করিতে পারেন নাই,—সংখ্যারাশি বিন্যাসের সময় তাঁহারা বাম ভাগ হইতে ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কপাত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত কয়েকটী প্রাচীন জাতি ব্রাহ্মণদিগের সমীপে গণিত বিদ্যা শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের উপদেষ্টা। অতএব সংস্কৃত শাস্ত্রে যদি তৎকালে সাঙ্কেতিক অঙ্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকিত, তবে সহজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিষ্যেরা কখনই জটিলপথের পথিক হইয়া বর্ণ দ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না। এতদ্বারা স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, এ দেশেও প্রথমে বর্ণ বিশেষের দ্বারা অঙ্কপাত করা হইত। ইহুদীরা যেমন বর্ণমালার প্রথম নয়টী বর্ণের দ্বারা রূঢ় নয়টী সংখ্যার অঙ্কপাত করিয়া থাকেন, বোধ হয় আদিম আর্য্য গণিতশাস্ত্রকারেরা ঠিক তদ্রূপই করিতেন। আমরা এস্থলে শিষ্যের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে আচার্য্যের অনেকটুকু উপদেশ পদ্ধতি জানিতেছি। ইহুদীদিগের বর্ণমালার নবম বর্ণে বর্ণাদির

কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহাদের বর্ণমালা ইংরাজি আরবি পারসীর ন্যায় একাদিক্রমে অন্তিম বর্ণ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; সংস্কৃতের ন্যায় কুত্রাপি বর্ণচ্ছেদ গৃহীত হয় নাই। অতএব আর্য্যেরা ইহুদীদিগের গণিত বিদ্যায় উপদেষ্টা না হইলে রূঢ় সংখ্যা বোধক নয়টী আদ্যাক্ষর গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে সুসঙ্গত হইত না। আর্য্যেরা অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, এই দশটী বর্ণ প্রথমে সংখ্যার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালায় সর্ব্বত্র স্বরবর্ণগুলিই অগ্রে লিখিত হয়। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে শিশুরা অ, আ ইত্যাদি স্বরবর্ণগুলিকে "সিদ্ধি" বলে। কেন,—স্বরবর্ণের এ প্রকার নামকরণ করিবার তাৎপর্য্য কি? এস্থলে একটী বিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে, বোধ করি বালকেরা তাহা জ্ঞাত নহে। ব্রাহ্মণেরা বর্ণমালার প্রথমে স্বরবর্ণগুলির উল্লেখ করেন, তৎপরে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি লিখিয়া থাকেন। আবার, সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণ না করিয়া কোন কার্য্যে কখনই হস্তক্ষেপ করেন না। সে কারণ লিখিতে বসিয়া অগ্রে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়,—"সিদ্ধিরস্তু" কার্য্যসিদ্ধি হউক, এইরূপ যথারীতি সিদ্ধিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক অ, আ, ই ইত্যাদি স্বরবর্ণগুলি লিখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। স্বরবর্ণের প্রথমেই মঙ্গলাচরণের সিদ্ধি শব্দ আছে, তন্নিমিত্ত স্বরবর্ণমালাকে সিদ্ধি কহে। বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণগুলিই আদ্য অক্ষর, অতএব অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্নে ব্যঞ্জনবর্ণ গৃহীত না হইয়া স্বরবর্ণ গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এক্ষণে পাঠক আশঙ্কা করিতে পারেন, (আ) আকার (ঈ) দীর্ঘ ঈকার (ঊ) দীর্ঘ ঊকার (ঃ) বিসর্গ প্রভৃতি বর্ণগুলি গৃহীত হইল না কেন, তাহা হইলে ত রূঢ় অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত? তাহার কারণ দেখুন, পূর্ব্বতন বৈয়াকরণেরা আকার দীর্ঘ ঈকার প্রভৃতি স্বরগুলিকে বর্ণ সমাহারের মধ্যে পরিগণন করেন নাই। যথা পাণিনি—

অ ই উণ্। ঋ ঌ ক্। এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। এই নয়টী স্বরের উল্লেখ করিয়াই স্বরবর্ণ সমাহার পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। এস্থলে ণ্ ক্ ঙ্ এবং চ্ এই কয়েক ইৎবর্ণ পরিত্যাগ করিলে নয়টী বর্ণাত্মক সংখ্যার উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং এতদৃষ্টে বিচার করিলে আকারাদি বর্ণ গৃহীত হইতে পারে না। পরিশেষে বিসর্গ (২) সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে

(২) শিক্ষা গ্রন্থে অনুস্বার এবং বিসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সমস্ত বৈয়াকরণ ঐ দুই বর্ণকে স্বর বলিয়া স্বীকার করেন।

পারে যে, সংখ্যার বর্ণাত্মক সাঙ্কেতিক চিহ্ন মধ্যে (ং) অনুস্বার এবং বিসর্গ (ঃ) এই উভয় বর্ণ গৃহীত হইলে তাহাদের রূপসাদৃশ্য হেতু অনেক স্থলে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তজ্জন্যই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাঠক! আর একটী কৌতুক দেখুন; আসিয়াটিক সোসাইটীর প্রস্তরে এবং আসিয়াটীক রিসার্চ পুস্তকে প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরের সঙ্গে তদানীন্তন প্রচলিত অঙ্কগুলির মেলন করিলে উল্লিখিত স্বরবর্ণ গুলির অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়া ক্রমে ক্রমে কেমন ১ ২ ৩ ইত্যাদি সাঙ্কেতিক অঙ্করূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যিনি আপনার কৌতুক পরিতৃপ্ত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার প্রতি আমার এই অনুরোধ,—প্রথমে পুরাতন দেবনাগর অক্ষরগুলিকে বারম্বার নির্ব্বাচন করিয়া চক্ষুকে যেন কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত করেন, তবে আমাদের বাক্যের সারবত্তা প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধ হইবে। যাঁহারা দেবনাগর পাঠ করিতে পারেন, বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর বর্ণের কেমন সৌসাদৃশ্য আছে, সেটী কেবল তাঁহাদেরই চক্ষে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দেবনাগরে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সাদৃশ্যের লেশমাত্র জানিতে পারেন না।

এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক, রোমকেরা সংখ্যা রাশি লিখিবার সময় সঙ্কলন এবং ব্যবকলন পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল কি না? আমরা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে সঙ্কলন এবং ব্যবকলন ক্রিয়ানুকূল্যেই ব্রাহ্মণেরা অঙ্কপাত করিতেন। রোমকদিগের পদ্ধতি দেখা যায়, (I) আই বর্ণে এক (V) ভি বর্ণে পাঁচ; তাঁহারা চারি লিখিবার সময় ব্যবকলন ক্রিয়া অবলম্বন করিতেন (I V) (৫—১); আবার ছয় লিখিবার সময় (V I) (৫+১)। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন নবত্যধিক (৯০+১); একোনবিংশতি (২০—১) এই প্রকার সংকলন ও ব্যবকলন বাক্যের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বিশ্বাস হইতেছে, যৌগিক সংখ্যা লিখিবার সময় এতদ্দেশেও বর্ণের সংযোগ ও বিয়োগ প্রথা চলিত ছিল। আর্য্য সমাজে কতদিন সঙ্কলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ায় রাশি সমাবেশ প্রথা চলিত ছিল, এখন তাহা নিশ্চিত করিবার উপায় নাই। কিন্তু ঋগ্বেদ প্রণয়নের পূর্ব্বে সুগম দশমিক প্রণালীতে অঙ্কপাতের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী ঋকে দৃষ্ট হয়,—

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশা বন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নবশ্রুতোণি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্।
১।১০।৫৩।৯

হে ইন্দ্র, আপনি লোকবিশ্রুত সহায় রহিত হইয়া সুশ্রবা রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত বিংশতি সংখ্যক (দ্বিদর্শ) জনপদাধিপতি এবং তাহাদের ষাট হাজার নিরানব্বই সংখ্যক (৬০০০০+৯০+৯) অনুচরগণকে শত্রুনাশক চক্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন।

এ স্থলে দ্বিদর্শ (২+১০) ইহাতে গুণক্রিয়া গৃহীত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন দশ (১০) ষষ্টি সহস্র (৬০০০০) এবং নব্বই (৯০) এই কয়েকটী স্থলেই দশমিক প্রক্রিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ সংখ্যার উদাহরণ ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে? সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী সুবিজ্ঞ আর্য্যেরা কেবল অঙ্কসূত্রের বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কলন এবং ব্যবকলন প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না, তাঁহারা গণিতশাস্ত্রের সুগম প্রণালীর উদ্ভাবন বহুকাল পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; দশমিক পদ্ধতির কার্য্য-সৌকর্য্য অতি প্রাচীন কালেই তাঁহাদের হৃদগত হইয়াছিল। যে কারণে আজ ফরাসি জাতি দশমিক মান পরিভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যেরাও প্রথমে সেই কারণেই অঙ্কপাতে দশমিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে দশের গুণ দ্বারা সংখ্যা রাখিতেন। এক দশ দ্বিদর্শ ইত্যাদি। তৎপরে তাঁহারা বিংশতির গুণ দ্বারা সংখ্যা গণনা করিতেন যথা,—এক বিশ, দুবিশ, ইত্যাদি। এই প্রকার মান পরিভাষা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কিন্তু দশমিক অঙ্কপাতে কাজের সুবিধা দেখিয়া সংখ্যা গণনায় তাঁহারা ঐ প্রথাই মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহাতে আর্য্যদিগের সমধিক বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কোন অন্ধকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা ঐ পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

অতি পুরাকালেই ভারতবর্ষ হইতে গণিত শাস্ত্র অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছিল। শেষ জ্যোতিষ এবং লগধ জ্যোতিষ ব্রাহ্মণদিগের অতি প্রাচীন ধন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুরোধে গণিত বিদ্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিন দিন বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। অন্যূন সাড়ে তিন হাজার বৎসর অতীত হইল উল্লিখিত জ্যোতিষ শাস্ত্র দুই খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। এ দিকে গর্গ মুনির জ্যোতির্ব্যাখ্যার অনেক স্থলে যবনদিগের নাম দৃষ্ট হয়। যবনেরা জ্যোতি-

র্বিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রশংসানুবাদ করা হইয়াছে। তজ্জন্য অনুমান হয়, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশ হইতে গণিতশাস্ত্র ইউরোপে নীত হইয়াছে, জার্ম্মণ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যে প্রকার কাল নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

বরুণ। চন্দন নগর হইতে গোঁদলপাড়া নামক একটী স্থানে যাওয়া যায়। ঐ স্থানের কুকুরে কামড়ানর ঔষধ বড় বিখ্যাত। তৎপরে তেলিনী-পাড়া নামক একটী স্থান আছে। তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিখ্যাত ধনী জমিদার। ঐ বাবুদের একটী দেবালয় আছে সেখানে অন্ন-পূর্ণা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেবালয়ে প্রত্যহ শত শত অতিথীর সেবা হইয়া থাকে।

এই সময় দেবগণ দেখেন দুটী বাবু গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। এক জন কহিতেছেন "মহাশয় বড় বিপদস্থ হইয়াছেন।" অপর কহিতে-ছেন "আজ্ঞে হাঁ, আমার লোকের কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা করে, আবার না দেখালেও চলে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! বাবুটীর কি হয়েছে?

বরুণ। হয়েছে কি জানেন—ঐ বাবুরা তিন ভ্রাতা। অপর ভ্রাতাদ্বয় নাবালক, এজন্য উঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। বাবুর এক সময় বেশ ভাল চাকুরী ছিল; সেই সময়ে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এবং ভ্রাতাদিগকে ফাঁকী দিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত টাকায় স্ত্রীর নামে বিষয় খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে বাবুর কর্ম্মটী নাই বেগার বসিয়া আছেন। বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্ব হইতেই একটু চরিত্র-দোষ ছিল। সম্প্রতি সে উপপতির পরামর্শে স্বামীকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে বাবু কিরূপে স্ত্রীধনে দখল পান তাহার জন্য কলিকাতায় উকীলদের নিকট পরামর্শ আনিতে চলিলেন।

এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধ পিতামহ ফোগড়া দাঁত বাহির করিয়া আর হাসিয়া বাঁচেন না। নারায়ণ কহিলেন "মাগী উচিত বিচার করিয়াছে।"

এই সময়ে " টিটুং ল্যাটাং " " টিটুং ল্যাটাং " শব্দে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতে লাগিল। দেবগণ বৈদ্যবাটীর টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ হুপ হুপ শব্দে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

যে গাড়িতে তাঁহারা বসিয়াছিলেন সেই গাড়িতে একটী বাবুও বসিয়াছিল। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইবে। বাবুটী একে সুন্দর পুরুষ তাহাতে যৌবনকাল। বিশেষতঃ নানারূপ পরিচ্ছদ পরিধান করায় আরো সুন্দর দেখাইতে ছিল। তাঁহার মস্তকে সোজা সিঁতি হস্তে ৩। ৪ টী অঙ্গুরীয়ক এবং বক্ষঃস্থলে চেন সহিত ঘড়ি শোভা পাইতেছিল। বাবুটী রেলিং ঠেস দিয়া অপর কামরার এক যুবতীর প্রতি চাহিয়া হাসিতেছিলেন। যুবতীর নিকটে তাহার স্বামী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। ইহাঁরও বিষয় বিভব এক সময় মন্দ ছিল না; কিন্তু এক্ষণে মদে ও বেশ্যায় প্রায় সমস্তই গিয়াছে। বাবুটী দেখিতে অতি কদাকার। স্ত্রী স্বাধীনতা ইনি বড় ভাল বাসেন; এজন্য স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ইহাঁর এমন ইচ্ছা ছিল সস্ত্রীক এক দিন টাউনহলে লেকচার শুনিতে যাইবেন। যাহা হউক বাবু এক্ষণে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন তাঁহার স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভাবে অপর পুরুষের সহিত গল্প করিতেছেন।

বাবু। আমি ভাই এই বার নামিব।

স্ত্রী। আহা! বেশ দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম। তুমি নেমে গেলে কি করে থাক্‌বো?

বাবু। যদি না থাক্‌তে পার আমার সঙ্গে চল না কেন?

স্ত্রী। তুমি যদি নিয়ে যাও যাইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কি রকমে যাই?

বাবু এই কথা শুনিয়া অতি মৃদু স্বরে কি পরামর্শ দিলেন। উপ নিকটে বসিয়াছিল কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেণ আসিয়া ভদ্রেশ্বরে থামিল। পুনরায় যেমন ট্রেণ ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে বাবু অমি স্ত্রীলোকটীকে ইঙ্গিত করিয়া নামিয়া পড়িলেন। যুবতীও নামে নামে এমন সময় উপ চীৎকার করিয়া কহিল " ও ঘুমান বাবু, উঠে দেখ, তোর বৌ পালাচ্ছে।" বাবু " য়্যাঁ! য়্যাঁ! " শব্দে যেমন উঠিলেন তাঁহার গৃহিণীও অমি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। বাবু ক্ষিপ্রহস্তে যেমন স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়াছেন নীচেকার বাবু ছুটিয়া আসিয়া সপাসপ শব্দে তাঁহার হস্তে

ছড়ির আঘাত করায় বাবু অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। নিম্নের বাবু পাছে উপরের বাবুও লাফাইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় গাড়ির দ্বার চাপিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন " রাস্কেল, আমার স্ত্রীর অঞ্চল ধর্‌লি যে ? "জানিস্, তোর নামে আমি নালিশ কর্‌বো।"

আরোহী বাবু চীৎকার করিয়া কহিল "পুলিষম্যান ! পুলিষম্যান আটক কর আমার বৌ নিয়ে যায়।" স্ত্রী কহিল " মর মিন্সে তুই আমার স্বামী না ইনি আমার স্বামী।

এদিকে ট্রেণও " পোঁ " শব্দে বংশীধ্বনি করিয়া হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বাবু কত চীৎকার করিলেন কিন্তু সে চীৎকার অরণ্যে রোদন।

বরুণ। পিতামহ! এই ষ্টেষণটীর নাম ভদ্রেশ্বর। এই স্থানটীর এক দিকে রেলওয়ে অপর দিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখানে অনেক গুলি মহাজনের গদী আছে। শস্যের আমদানী রপ্তানীর জন্য ভদ্রেশ্বর বড় বিখ্যাত। ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর নামক একটী শিব আছেন। ঐ শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসে এক লক্ষ বিল্বপত্র দিয়া পুজা দিবার মনন করিয়া থাকেন।

এই সময় পিতামহ বাবুটীকে রোদন করিতে দেখিয়া রেলিংয়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিলেন—" বাবা, কেঁদোনা। নিজের দোষে হারালে এখন কাঁদ্‌লে কি হবে ? তোমার অর্থবল নাই, শরীরে বল নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে যাওয়া কেন ? অগ্রে সাহেবদের মত বলবান হও, সাহসী হও, তৎপরে এ কাজে প্রবৃত্ত হইও। তুমি স্ত্রী স্বাধীনতা দিবে অথচ ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাবে ; তাহাতে কি কাজ চলে ? তোমার ঢাল নাই, তরবাল নাই অথচ আন্দিরাম সর্দ্দার হইবার চেষ্টা করার উপযুক্ত ফলই হইয়াছে।

বাবু। আমি বৈদ্যবাটীতে নামিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া আটক করাব।

বরুণ। তাহারা এক্ষণে ভদ্রেশ্বর হইতে ৩২ ক্রোশ রাস্তা দূরে গিয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফ করে আর কেন লোক হাসাবে বাড়ি গিয়ে প্রচার করগে বৌ মরে গিয়েছে।

বাবু। আপনারাও এ কথা কাহারও নিকট প্রচার করিবেন না।

নারদ। আমরা প্রচার করবো। না করলে লোকের উপকার হবে

কিসে? চৈতন্য হবে কিসে? তোমার মত বোকা বাবুরা যদি তোমার দেখে শিক্ষা পান, সাবধান হন, সে ভাল নয়?

ক্রমে ট্রেণ আসিয়া বৈদ্যবাটী ষ্টেষণে উপস্থিত। দেবগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

বৈদ্যবাটী।

ব্রহ্মা। বরুণ! এস্থানের নাম বৈদ্যবাটী হইল কেন?

বরুণ। এখানে অনেকগুলি দেশীয় চিকিৎসক বাস করেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন নগরের ধুম ধামের সীমা পরিসীমা নাই। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক তরি তরকারি এবং নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিতেছে। স্থানটীতে লোকে লোকারণ্য।

ব্রহ্মা। বরুণ! এখানে কি কোন মেলা আছে? নচেৎ এত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিতেছে কেন?

বরুণ। আজ্ঞে এখানে কোন মেলা নাই। ক্রমে আমরা কলিকাতা মহানগরীর অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঐ কলিকাতার প্রসাদে চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানগুলি নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই বৈদ্যবাটীর হাট কলিকাতাবাসিদিগের প্রাত্যহিক তরি তরকারি যোগায়; এই জন্য এখানে এত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে আসিতেছে।

এই সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে আসিল। তাহারা দূর দেশ হইতে আসিতেছে বলিয়া সঙ্গে চাল চিঁড়ে বাঁধিয়া আসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক কহিল "আহা! তাড়াতাড়িতে রামেশ্বরকে কাঁচকলা গুলো বৈদ্যবাটীতে এনে বেচে যেতে বলে আসতে ভুলে এলাম। বড্ডো পেকেছে আজ ঘরে থাক্‌লেই পচে যাবে।" এক রমণী কহিল "পাকা কাঁচকলা কি বিক্রী হতো?" প্রথমা কহিল "আহা! দিদি, পাড়তে পেতো না। কলিকাতার লোক পেলে খেয়ে বাঁচতো।"

ব্রহ্মা। বরুণ, এ সব স্ত্রীলোক কোথায় যাচ্চে?

বরুণ! গঙ্গাস্নানে।

"চল আমরাও অগ্রে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।" বলিয়া পিতামহ দেবগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন। ঘাটে উপস্থিত হইয়া

দেখেন অসংখ্য লোক জলে স্নান করিতেছে। তীরে অনেকগুলি মহাজনী নৌকা লাগান রহিয়াছে। মুটেরা মাথায় করিয়া বস্তা উঠাইতেছে। কোন নৌকা উবু করিয়া ফেলিয়া "দুপ দাপ" শব্দে মেরামত করা হইতেছে। কোন নৌকায় গাব মাখান হইতেছে। ঘাটের এক পার্শ্বে এক খানি শুঁটকী মাছের নৌকা লাগিয়াছে, তাহার পার্শ্বে এক খানি জোনড়া বোঝাই নৌকা। উভয় নৌকার দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। অসংখ্য নৌকা পাইল তুলিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছে। পাইলে বেশ বাতাস পাওয়ায় দড়ির কড় কড় শব্দ হইতেছে। দাঁড়ের মাঝি দাঁড় টানিতে টানিতে মনের আনন্দে গান ধরিয়াছেঃ—

বাঘ মহের উপরে তুমি খাড়া হৈয়ে কি কর।
তীর দিয়ে ধরচো ঠেসে, সাপ দিয়ে কেমড়ায়ে মার॥
পক্ষীর উপর জুহা পায়, বাবুর মহন দেহা যায়,
তার পাশে ঐ ধওলা ছুঁড়ি রাখতি পার কি না পার।
তার উপর ঐ কেলো ছোঁড়া, বোধ হয় যেন ঝি বৌ চোরা;
তার পাশে হলদি ছুঁড়ি—

ইন্দ্র। বরুণ, ঐ নৌকা খানায় কি গান গাইতে গাইতে গেল?

বরুণ। দুর্গা প্রতিমা বর্ণনা হচ্চে।

পিতামহ ভাগীরথীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন বরুণ, এখানেও কি মা নাই?

বরুণ। আজ্ঞে, না।

ব্রহ্মা। তুমি আমাকে গোপন করো না সত্য বল—মাতো আমার বেঁচে আছেন?

বরুণ। আজ্ঞে, দেবতাদিগের কি মৃত্যু আছে? এক্ষণে আপনি এই নিমাই তীর্থের ঘাটে স্নান করুন, মহা পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

ব্রহ্মা। নিমাই তীর্থের ঘাট কি?

বরুণ। এই ঘাটে চৈতন্য দেব তীর্থ পর্য্যটন সময় স্নান করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারই নাম হইতে নিমাই তীর্থের ঘাট নাম হইয়াছে।

দেবগণ স্নান আহ্নিক করিয়া উপরে উঠিতেছেন এমন সময়ে দেখেন একটী বাবুর সহিত একটী ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক যাইতেছে। বাবু কহি-

তেছেন "তোমাকে খুসি করে বিদায় করিব, কিন্তু যেন প্রসূতির কোন কষ্ট না হয়। স্ত্রী কহিতেছে কোন কষ্ট হবে না। আমি ঐ কাজ করিতে করিতে পেকে গেলাম। কিন্তু বাবু তোমার বাড়ীতে আমার যত দিন দেরি হবে সমস্ত টাকা ধরে নেব। কলকাতায় ও দেশে আমার নামডাক আছে তাই প্রত্যহ বিস্তর টাকা রোজগার করি।

ইন্দ্র। বরুণ, উহারা কারা এবং কি বলে ?

বরুণ। ঐ স্ত্রীলোক, দাই। উহার কাজ ঔষধ দ্বারা ভ্রূণহত্যা করা। ঐ বাবুর বিধবা ভগ্নী অন্তঃস্বত্বা। এই নিমিত্ত ভ্রূণহত্যা করাইবার জন্য দাই নিয়ে যাওয়া হচ্চে।

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণুঃ! হ্যা! ভ্রূণহত্যা করাবার জন্য! মাগী বল্লে—আমি বাড়ী বসে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করি। বরুণ! তবেত বাঙ্গালায় ভ্রূণহত্যার স্রোত বিলক্ষণ প্রবল ? তবেত সত্বরেই এই পাপে বঙ্গ ডুবিবে!!

তীরে উঠিয়া দেবগণ একটী কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন কালীর বেস সেবা হইতেছে। নৈবেদ্যাদিরও আয়োজন মন্দ করে নাই।

নারদ। বরুণ, এ কালী কাহার ?

বরুণ। ইনি একজন মহান্তের তত্ত্বাবধানে আছেন। ইহাঁর কিছু বিষয় থাকায় সেবার বন্দোবস্ত ভাল দেখিতেছ।

দেবতারা কালীবাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখেন এক যুবা একটী মস্তক বিহিন পাঁটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কতক গুলি বেশ্যা এই সময় রঙ্গ ভঙ্গীর সহিত স্নান করিতে আসিতেছিল। তাহাদের পায়ে ৮।১০ গাছি করিয়া মল। পরিধান পাছাপেড়ে শাটী। অঞ্চলের অগ্রভাগে এক গলো করিয়া রিং দেওয়া চাবি। মস্তকে একখানি করে পাড়ওয়ালা গামচা। দলটা যুবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এক বেশ্যা কহিল "ও শালা, পাঁটাটা কি একলা খাবি, আমাদের আদখানা দেনা।

যুবা। সরে যা ভাই। আমার কাছ থেকে সরে যা, দাদা, ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে আছেন দেখতে পাবেন।

বেশ্যা। তোর দাদাকে তুই ভয় করিস্ আমরা কি ডরাই ? আয়লো সকলে যুঠে পাঁটাটা কেড়ে নিই।

যুবা। না ভাই, না ভাই, তোদের একটা কিনে দেব। পায় পড়ি সরে

যা, তোদের মাইরি একটা কিনে দেব। এ দেখ্ চিসনে কলকাতা হতে বাবুরা আসবেন বলে এখানে কাটতে এসেছি। নিজের খাবার জন্যে কি এখানে আসি, বাড়ীতেই নিকাশ কর্তাম।

দূর গুয়োটা, একটা পাঁটা দিতে পারলিনে? বলিয়া বেশ্যাগণ হাসতে হাসতে চলিয়া গেল।

ব্রহ্মা। বরুণ, একি! পিতা এমন সব ছেলে জন্ম দিয়াছেন যে বেশ্যার মল খেয়ে মলেন!

উপ। কর্ত্তা জেঠা, এক আদ জন নয়, এই এক পাল মাগীর। তাঁর মুখেতে তাংড়াবে কেমন করে?

দেবগণ ইহার পর একটী দোকানে যাইয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন এই বৈদ্যবাটীর সন্নিকটে সেওড়াপুলি নামক একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে শনি মঙ্গলবার হাট বসে। হাটে দেশের যাবতীয় আলু এবং আম্রের আমদানী হয়। সেওড়াপুলিতে নিস্তারিণী নামে এক কালী মূর্ত্তি আছেন। উহাঁর রীতিমত সেবা ও অতিথি সেবা হইয়া থাকে। ঐ দেবমূর্ত্তি সেওড়াপুলির দশ আনি মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত।

ইন্দ্র। বরুণ, এসব মজুর আসছে কোথা থেকে?

বরুণ। ইহারা চাঁপদানী নামক স্থানে চটের কলে কাজ করে। ঐ কলটী অনেক গুলি দেশীয় দুঃখী লোককে প্রতিপালন করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ চাঁপদানীর জঙ্গলে বড় বোমবেটের ভয় ছিল। এই বৈদ্যবাটীর অনতিদূরে আর একটী স্থান আছে যাহার নাম গরিটী। গরিটী ফরাসিদিগের একটী বগান এবং চন্দননগরের গবর্ণরের হাউস থাকার জন্য বিখ্যাত। ঐ স্থানের এক সময়ে বড় সমারোহ ছিল। তখন কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং সার্ উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি নাটকাভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ঐ সব যাত্রী কোথায় যাচ্চে?

বরুণ। তারকেশ্বরে।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাদেরও যে তারকেশ্বরে যেতে হবে, কারণ উপর কল্যাণে পূজা মেনেছি।

বরুণ। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।

দেবগণ একটী দোকানঘরে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর

দশ টাকা দিয়া এক খানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলেন এবং বেলা আন্দাজ একটার সময়ে তারকেশ্বর অভিমুখে চলিলেন।

গাড়ি এক স্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন, বরুণ! ঐ সব ধ্বংসাবশেষ বাড়ী ঘর দেখা যাইতেছে কাহার?

বরুণ। ঐ স্থানের নাম সিঙ্গুর। ঐ যে বাড়ী ঘর এবং গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছ, উহা সিঙ্গুরের বাবুদিগের। ইহাঁদের এক সময় বিলক্ষণ সঙ্গতি ছিল। ইহাঁদেরই নববাবুর একটী বৈঠকখানা হুগলিতে আছে। যাহাতে পূর্ব্বে নর্ম্মাল স্কুল বসিত। এক্ষণে আর ইহাঁদের বিষয় বিভব তাদৃশ নাই।

এই সময় সকলে দেখিলেন একটী আড্ডাতে বসিয়া যাত্রিগণ জলযোগ করিতেছে। দেবগণের গাড়ী এখান হইতে ধীরে ধীরে যাইয়া কোলা নামক স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল "বরুণ কাকা দেখা যাচ্চে ওটা কি?"

বরুণ। দেখ দেবরাজ! এই স্থানের নাম কোলা। ঐ অত্যুচ্চ বাড়ীটী সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাফের ঘর। উহা সর্ব্বসমেত প্রায় সাত তালা। টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উহার উপর এক জন লোক লাল, কাল নানা রঙ্গের নিশান হাতে করিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিত এবং পথে কোন বিপদ আপদ দেখিলে হস্তস্থিত নিশান উত্তোলন করিত। নিশানের আকার দৃষ্টে জানা যাইত যে, বিপদ আপদ ঘটিয়াছে। টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইবার পর কিছু দিন এই বাড়ীটী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকায় দস্যুরা আশ্রয় লইয়া পথিকদিগের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং এক্ষণে উহার দ্বার গুলি পাকা করিয়া গাঁথিয়া প্রবেশ পথ এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর দেবগণের গাড়ি কতকগুলি অপর গাড়ীর সহিত একত্র হইয়া নালিকুলের আড্ডায় আসিয়া থামিল। ঘোড়াগুলি চক্ষু বুজাইয়া ঝুঁকিতে লাগিল। কোচম্যানেরা ছুটিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্য হইতে আগুণ কষ্টে বাহির করিয়া গুড়ুক তামাক খাইতে বসিল। দেবতারাও কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি হইতে নামিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন নিকটে আর একটী বাজারে বসিয়া যাত্রিগণ আহারাদি ও জলযোগাদি করিতেছে।

এই সময় বাজারের একটী দোকানঘরে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। চারি দিক হইতে যাত্রিগন "কি!" "কি!" শব্দ করিতে করিতে সেই দিকে দৌড়াইল। দেবগণ দ্রুতবেগে দেখিতে চলিলেন। দেখেন একজন স্ত্রীলোক যাত্রী রোদন করিতেছে। কে তাহার বস্ত্রাদির পোটলাটী অপহরণ করিয়াছে। তাহার নিকট আর এমন একটী পয়সা নাই যে পথ খরচ করিয়া বাটী যায়। পিতামহ তাহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন "বরুণ একি! ইংরাজরাজ্যে এত আট ঘাটে পাহারা তার মধ্যে চুরি জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা!!"

গাড়োয়ানেরা দেবগণকে ডাকিল, তাঁহারা আবার গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। আবার অশ্ব পৃষ্ঠে সপাসপ শব্দে কশাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহাদের গাড়ী বালগড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে নাপিত ও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, এবং গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, ক্রমে দেবগণের গাড়ী যাইয়া তারকেশ্বরে উপস্থিত হইল।

তারকেশ্বর।

দেবগণ দেখেন সেদিন কি একটা পর্ব্ব থাকায় গ্রামে লোকে লোকারণ্য, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যের ও অপরাপর দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে। যাত্রিদিগের মধ্যে কাহারও কোলে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে ছেলে কাঁদিতেছে। কাহারও পায়ের মল খোয়া গিয়াছে। কাহারও অঞ্চল হইতে কে পয়সা খুলিয়া লইয়াছে। অসংখ্য দোকানে অসংখ্য যাত্রী বসিয়া কেহ জল খাইতেছে, কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ চুড়ি পরিতেছে। সন্নিকটে দেব মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। ভিক্ষুকেরা খঞ্জনীর তালে গান ধরিয়াছেঃ—

বন্দিনে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারি দিকে জলা জঙ্গল খাকড়ার বসতি॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর॥
কপিলা দিত দুগ্ধ একচিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর॥

তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোর সেবা কর বাপা হইয়া সন্ন্যাসী। ইত্যাদি।

দেবগণ একটী দোকানে বাসা লইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ তারকেশ্বরের বিষয় বল?"

বরুণ। তারকেশ্বরের মন্দির যে স্থানে ঐ স্থানকে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ কহিত। ইনি ঐ স্থানের জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তর আকারে পড়িয়াছিলেন। রাখালেরা ঐ প্রস্তরকে সামান্য প্রস্তর বোধে তদুপরি ফল মূলাদি ছেঁচিয়া খাইত। এই কারণে তারকেশ্বরের মস্তকে অদ্যাপি একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জঙ্গলের মধ্যে ইনি সামান্য আকারে পড়িয়া থাকেন, মুকুন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী যাইয়া প্রত্যহ দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসে। মুকুন্দ ঘোষ গাভীর দুগ্ধ হয় না কেন এই কারণের অনুসন্ধানে যাইয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন। ইঁহারই সহিত তারকেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়। শিব নিজ পরিচয় দিয়া মুকুন্দ ঘোষকে কহেন, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার সেবা কর। মুকুন্দ ঘোষ তদবধি তারকেশ্বরের আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। এ দিকে তারকেশ্বর বর্দ্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, আমি অনাবৃত স্থানে থাকিয়া বড় কষ্ট পাইতেছি, আমাকে একটী বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেও। রাজা স্বপ্ন দৃষ্টে ইহঁার মন্দির ও বিষয়াদি করিয়া দিলেন। তৎপরে লোকের উৎকট পীড়াদি আরোগ্য হইলে পূজা দিতে থাকায় ক্রমে ইহঁার অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে এবং মহান্তেরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দেবগণের সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল "আপনারা কত মূল্যের ডালার পূজা দেবেন?"

নারদ। দুই আনার।

ব্রাহ্মণ। দুই আনার কি ডালা হয় মহাশয়?

নারদ। তবে দশ পয়সার।

ব্রাহ্মণ। আট আনা মূল্যের কম ডালা নাই।

ব্রহ্মা। তাই হবে। এক্ষণে আমাদের অগ্রে কি করা উচিত?

ব্রাহ্মণ। আপনাদের কি কোন পূজা মানা আছে?

ব্রহ্মা। হঁা, ঐ ছেলেটীর পীড়া হওয়ায় কিছু পূজা মানিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ। তবে আপনারা মহান্ত মহারাজের গদীতে আসুন ? তাঁহাকে সেই পূজার পয়সা নগদ দিতে হইবে।

নারা। তা দেব কেন ? যখন পূজা মেনেছি পূজার উপকরণ কিনে দেব।

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, তা হবে না, যা নিয়ম তা করতেই হবে।

উপ। ঠাকুর কাকা! চল না, তবু চেহারাখানা দেখা হবে। লোকে যে পয়সা খরচ করে কত কি দেখে থাকে।

এই কথায় দেবগণ হাস্য করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মহান্তের গদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন মহান্ত মহারাজ কাছারি ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। নিকটে দেওয়ান প্রভৃতি উপবিষ্ট। যাত্রিগণ আসিয়া পূজা মানার টাকা আধুলি, সোণা, রূপা দেওয়ানের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিতেছে। পিতামহ দেওয়ানের নিকটে যাইয়া কহিলেন "পূজা মানার চারিটী পয়সা লউন।" দেওয়ানজী " হো " " হো " শব্দে হাস্য করিয়া কহিলেন " মহারাজ, এঁরা চারি পয়সার পূজা দিতে এসেছেন!

মহান্ত। না না পয়সা ফেলে দেও। দেবগণের প্রতি চাহিয়া মুখ খিচাইয়া " বলি, বাবা কি চুণ খাবেন ? "

ব্রহ্মা। আমরা পয়সা চিনি না, পয়সার মূল্যও জানি না এজন্য চার পয়সার পূজা মানা হইয়াছে।

দেওয়ান। দেখুন মহারাজ ইঁহারা বোধ হয় রাঢ়দেশের লোক, সেই জন্যই বলিতেছেন আমরা পয়সাও চিনি না, পয়সার মূল্যও জানি না। কারণ, রাঢ় অঞ্চলে চাউল ধান্যের বিনিময়ে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। তথায় পয়সা কেহ সহজে বাহির করে না এবং পয়সাকে উপাদেয় জিনিষ মনে করে।

মহান্ত। আচ্ছা, ওঁদের একটী সিকি দিতে বল।

পিতামহ একটী সিকি প্রদান করিলে মহান্ত উপকে নিকটে ডাকিয়া একটী অঙ্গুরির দ্বারা তাহার কপালে একটী চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অমনি একজন নাপিত ছুটিয়া আসিয়া উপোর হাত ধরিয়া এক স্থানে বসাইয়া পিতামহকে কহিল " মাথা কামানোর দক্ষিণা একটী আধুলি দেন দেখি। "

নারা। কেন আমরা কি ভুসনোর বাঙ্গাল! তাই মাথা কামাইতে এক পয়সার স্থানে এক আধুলি দেব ?

নাপিত। আপনি বলেন কি? এ যে তীর্থ স্থান! এখানে মাথা কামানোর দক্ষিণা এক আধুলির কম নাই। কমে চল্‌বে কেমন করে—আমাদের মহান্তকে এক মুটো করে টাকা জমা দিতে হয়!

নারা। ভাল এক পয়সার স্থানে এক আনা লও। ওর বেশী আমরা দেব না। বরং মাথা থেকে এক গাছি চুল ছিঁড়ে পূজা দিতে হয় তাহাও স্বীকার।

"আসুন বাবু" বলিয়া নাপিত উপোর সম্মুখের চুলগুলি ঠিক নাটুরে মাজিদের মত কামাইল, চারি দিক কামাইল না। কহিল "দেন বাবু, পয়সা দেন।"

ইন্দ্র। ও কিরূপ কামান হল?

নাপিত। মেপে দেখুন ঠিক চারি পয়সার মত কামায়ে দিইছি। আপনাদের যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।

নারা। বেশ কামান হয়েছে। তারকেশ্বরের বাহিরে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে কামায়ে লওয়া যাইবে, তত্রাপি এখানকার নাপিতকে এক আনার বেশী দেব না।

দেবগণ নাপিতকে বিদায় দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত দোকানে ডালার ফরমাস দিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ কহিল আপনাদের কত মূল্যের ডালা চাই?

ব্রহ্মা। চারি আনা মূল্যের।

ব্রাহ্মণ। ও হরি! আপনারা কোন দেশের মহাশয়? চারি আনা মূল্যের কি ডালা বিক্রয় হয়? বলি—বাবাকেত পেট পুরে খেতে দেবেন?

নারা। চারি আনায় ক্ষুধা যাবে না? ভাল কত মূল্যের ডালা বিক্রয় হয়?

ব্রাহ্মণ। ১০ দশ টাকা হইতে ৫০ টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত ডালা আছে।

নারা। কম মূল্যের আছে কি না বল?

ব্রাহ্মণ। কম মূল্যের মধ্যে ঐ দশ টাকার।

নারা। এক টাকার মত দেবো। বলি তোমাদের বাবা কি সর্ব্ব গ্রাস করিতে বসেছেন?

ব্রাহ্মণ একজন দোকানীকে এক টাকার মতন একখানি ডালা সাজাইতে বলিয়া দেবগণকে শিবগঙ্গায় স্নান করাইতে লইয়া চলিল। স্নানান্তে

সকলে আসিলে দোকানী তাঁহাদিগকে ডালা প্রদান করিল। ডালায় একটী ওলা, একটী কলা, চাট্টি আতপ চাউল ও ২। ৪ টী বিল্বপত্র ছিল।

উপ। এই কি এক টাকার ডালা?

দোকানী। বাবু! ওর বেশী আমরা কোথা থেকে দেব। আমাদের মহান্তকে এক এক মুটো টাকা জমা দিতে হয়, সে টাকা ত এর মধ্য হতেই তুলতে হবে।

উপ ডালা লইয়া অগ্রে অগ্রে এবং দেবগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইবার সময় নারায়ণ ব্রাহ্মণকে কহিলেন আসুন মহাশয় পূজা করাবেন না?" ব্রাহ্মণ কহিল "আপনারা চলে যান, মন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ আছে। পূজা করান আমাদের কাজ নহে।" দেবতারা অদৃশ্য হইলে ব্রাহ্মণ দোকানীকে কহিল "দোকানী ভাই আমার অংশের পয়সা দেও।" দোকানী কহিল "অবশ্য দেব ডালা প্রতি টাকায় ছয় আনা যেমন চুক্তি আছে সে পয়সা তোমাকে কেন না দেব?"

এদিকে দেবগণ "জয় তারকনাথ!" "বোম তারকনাথ" শব্দ করিতে করিতে ঠাকুর বাড়ীর দ্বারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পাহারাওয়ালা দ্বার ছাড়িল না।

ব্রহ্মা। বরুণ এ কি! ধর্ম্ম মন্দিরের দ্বার বন্ধ।

বরুণ। আজ্ঞে! কালটী এম্নি পড়েছে কোন বিষয়েই পয়সা না হলে নিষ্কৃতি নাই। এই দ্বারবানকে কিছু না দিলে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেবে না।

দেবগণ দ্বারবানকে কিছু দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন সম্মুখে এক বৃহদাকার মন্দির। সকলে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "ঐ যে মন্দিরের মধ্যে একটী গহ্বর দেখিতেছেন, উহারই মধ্যে তারকেশ্বর আছেন। গহ্বরের উপরি ভাগটী রৌপ্যনির্ম্মিত ঢেকে ঢাকা রহিয়াছে। তারকেশ্বর একটী অনাদিলিঙ্গ শিব। যাত্রীদিগের মধ্যে যদ্যপি কেহ বেশী পয়সা খরচ করে, তাহা হইলে গহ্বরমধ্যে হস্ত দিয়া স্পর্শানুভব করিয়া দেখিতে দেয়

সকলে এইরূপ গল্প করিতেছেন এমন সময় একজন পুরোহিত ছুটিয়া আসিয়া দেবগণের হস্ত হইতে ডালা খানি লইয়া গৃহের এক কোণে ঢালিয়া রাখিল এবং ডালার উপর ২। ৪ টী বিল্বপত্র, চাটি আতপ চাউল এবং

যৎসামান্য ওলা ভাঙ্গা প্রসাদ স্বরূপ দিয়া কহিল "তোমরা বাহিরে যাও।"

ব্রহ্মা। দেখ্‌ব না?

পুরোহিত। দেখা কি আর সমস্ত দিনে শেষ হবে না? তোমরা একা দেখলে অন্যান্য যাত্রীরা দেখবে কি?

দেবগণ মন্দিরের পার্শ্বে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই যে প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, লোকে বলে ইনিই মুকুন্দ ঘোষ। ওদিকে ঐ যে কতকগুলি কবর দেখিতেছেন, উহাতে অনেকগুলি মহান্তকে রাখা হইয়াছে। মহান্ত হইতে হইলে সংসার ধর্ম্ম এবং পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।

উপ। বরুণ কাকা! আমার মহান্ত হলে হয় না?

নারা। দূর হতভাগা ছেলে, তোর বাপ মা বেঁচে থাক, তুই কি দুঃখে মহান্ত হবি?

এই সময় পাহারাওয়ালা চীৎকার করিয়া কহিল "যাত্রিগণ বাহিরে যাও মহান্ত মহারাজের পূজা আসিতেছে, তোমাদের আর ভিতরে থাকিবার হুকুম নাই।

ইন্দ্র। বরুণ! মহান্তের পূজার সময় অন্য লোককে থাকিতে দেয় না কেন?

বরুণ। মহান্ত লোকের নিকট এই ভাব প্রকাশ করেন যে, ঐ সময় তাঁহার শিবের সহিত কথা হয়। তিনি শিবকে বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া লন। তদ্ভিন্ন শিবকে "এ খাও ও খাও" বলিয়া হাতে পেঁপে ক্ষীর প্রভৃতি তুলিয়া তুলিয়া দেন। তিনি আর খেতে পারিনে বল্লেও মহান্ত ছাড়েন না।

দেবগণ এই কথা শ্রবণে হাস্য করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন। ওদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া মহান্তের পূজা আরম্ভ হইল। পূজা সমাপ্ত হইলে মহান্ত শিবিকারোহণে অগ্রে পশ্চাতে পাহারা দেবালয় হইতে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

ইন্দ্র। তারকেশ্বর চাল কলা খেয়ে মরেন, সুখ দেখচি মহান্তের।

বরুণ। সুখ বলে সুখ। শিবগঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়াছ তাহাতেই মহান্ত বাস করেন। ইহার এত সুখ

যে রূপার খাটে শয়ন করা হয়, সোণার থালে ভাত খান। গৃহে কত সোণা ও রূপা বান্ধান হুকা এবং ফরসী আছে। বাবুর গৃহে টানা পাখা টাঙ্গান এবং নিজেই সক করে গৃহ প্রাচীরে বত বিশ্রী আয়না টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।

ব্রহ্মা। তারকেশ্বরের সেবা কিরূপ হয়?

বরুণ। বেলা একটা দেড়টার সময় ইহার মহুই ভোগ অর্থাৎ পায়স রাঁধিয়া ভোগ দেওয়া হয়। বেলা ২। ২॥ টার সময় শৃঙ্গার রস হয় অর্থাৎ শিবকে পুষ্পাদির দ্বারা সুশোভিত করিয়া যাত্রিদিগকে দেখান হয়। রজনীতে শিব লুচি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার করেন। আহারের পর একটী ধুতুচী আকারের কল্কেতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ তামাক সাজিয়া তাহাতে তালের জটার আগুন দিয়া গুড় গুড়িতে বসাইয়া শিবকে ধুম পান করিতে দেওয়া হয়। ঐ সময় কোন যাত্রীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। তবে বাহিরে দাঁড়াইয়া গুড় গুড়ির শব্দ শুনিবার অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন কিছু সময়ের পর কল্কেটী আনিয়া উবু করিয়া ঢালিয়া দেখান হয় যে, শিব সমস্ত তামাক খেয়ে গুল করে ছেড়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মা। নারায়ণ! দেখ—কে বলে কলিতে দেবতা নাই!

নারা। থাকলে নিঃসন্দেহ কাশীর ন্যায় ভোলাদা আমাদিগকে দেখা দিতেন। আমার বোধ হয় গৃহ মধ্যে এক বেটা পাকা গুলিখোরকে লুকায়ে রাখে, সেই সমস্ত তামাক পোড়ায়।

নিকটে একজন কলু দাঁড়াইয়াছিল দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়েরা এখানে কি করিতে এসেছেন?

নারা। এই ছেলেটীর গুহ্য দেশে একটী ফোঁড়া হওয়ায় তারকেশ্বরের পূজা মানা ছিল, সেই পূজা দিতে আসিয়াছি।

কলু। আপনারা এত কষ্ট করে না আসিয়া মহান্তের ঘানির এক ছটাক আন্দাজ তেল কিনে ঐ স্থানে দিলেই ভাল হয়ে যাইত।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ কি বলে? মহান্তের ঘানি আছে না কি?

বরুণ! আজ্ঞে না, মহান্তকে চরিত্র দোষের জন্য ঘানিকলে যুতে তৈল বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই ও এ কথা বলিতেছে।

ব্রহ্মা। মহান্ত হিন্দু দেবমন্দিরের একজন অধ্যক্ষ। তাহার চরিত্র দোষ!

বরুণ। আজ্ঞে, মহান্তই এ প্রদেশের রাজা। সম্পত্তি ত যথেষ্ট আছে। মহান্ত মাববগিরি অল্প বয়সে গদী ও অতুল ঐশ্বর্য্য হাতে পাওয়াতেই দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ঐ রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, উচ্চবংশীয়েরাও বিষয় পাইলে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু যাহাদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নাই,এমন সব ফকীরই প্রায় মহান্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার কিরূপে জানিবে? কয়েক বৎসর গত হইল, মহান্ত ও এলোকেশীর যে অভিনয় হয়,তাহা চিরকাল বঙ্গবাসিদিগের চিত্রপটে অঙ্কিত থাকিবে। এবং সহজে আর কোন ভদ্র লোক পরিবারকে তীর্থ স্থলে পাঠাইবেন না।

ব্রহ্মা। মহান্ত এবং এলোকেশীর অভিনয় আমাকে সংক্ষেপে শ্রবণ করাও।

বরুণ। এই তারকেশ্বরের সন্নিকটে কুমরুল নামক একটী পল্লিগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নীলকমল মুখোপাধ্যায় নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জেষ্ঠা কন্যার নাম এলোকেশী। এলোকেশীর নবীন নামক এক যুবার সহিত বিবাহ হয়। নবীনের আত্মীয় স্বজন কেহ না থাকায় স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিত এবং মাস মাস খরচ পাঠাইত। নীলকমলের প্রথমা স্ত্রী গত হইলে দ্বিতীয় বার যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে,সেই স্ত্রীর সহিত মহান্তের বিশেষ ভালবাসা ছিল। মহান্ত এক দিন যুবতী এলোকেশীকে চক্ষে দেখিয়া উন্মত্ত হয় এবং তাহার বিমাতাকে প্রলোভনে বশ করিয়া দূতীর কাজ করিতে বলে। ঐ বিমাতা নিজ পতি নীলকমলকে "রাজার শ্বশুর হবে, মহান্ত বিষয় করিয়া দেবে" ইত্যাদি প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া মেয়েটীকে মহান্তের করে সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেয়। এবং স্ত্রী পুরুষে পরামর্শ স্থির হইলে,মাগী মেয়েকে তারকেশ্বরে ছেলে হইবার ঔষধ খাওয়াইতে লইয়া যায়। মহান্ত প্রথম দিন বালিকা এলোকেশীকে সন্তান হইবার ঔষধ খাওয়ান ছলে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অচৈতন্য করিয়া সতীত্ব নষ্ট করে। তৎপরে নানারূপ সোণা রূপার গহনা পাইয়া এলোকেশীর মন মহান্তের প্রতি অনুরক্ত হয়। সে সর্ব্বক্ষণ মহান্তের ভবনে থাকিয়া স্ত্রী পুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। ক্রমে এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল, নবীনেরও কাণে কিছু কিছু উঠিল। নবীন সন্দিগ্ধচিত্তে শ্বশুরালয়ে আসিয়া এলোকেশীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে এলোকেশী কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে

পরিত্যাগ করিতে নবীনের মন হইল না,সে বলিল এলোকেশি! তুমি আমাকে যথার্থ কথা বলায় তোমাকে ক্ষমা করিলাম চল,তোমাকে কলিকাতায় লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া পাল্কী বেহারা অনুসন্ধান করিতে যায়। মহান্ত শুনিল এলোকেশী হাতছাড়া হইতেছে। অতএব ছিনাইয়া লইবার জন্য ঘাটিতে ঘাটিতে পাহারা বসাইল। নবীন দেখিল স্ত্রী পাই না, মহান্ত প্রভুকাল ভোগ দখল করিয়া আবার চায়. অতএব উভয়েই নিরাশ্বাস হই, এই ভাবিয়া স্ত্রীকে আঁস বঁটিতে কাটিয়া পুলিষে গিয়া উপস্থিত হয়। দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, রাস্তায় রাস্তায় এই কথা, এই গান, এই সম্বন্ধে কত পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। দেশের যত ধনী লোকে অর্থ দিয়া নবীনকে খালাস করিবার জন্য মকদ্দমা করিতে লাগিলেন। গোলযোগে তারকেশ্বরের ষাঁড় (মহান্ত) ধরা পড়িলেন। রাজবিচারে ইহার নাকে দড়া দিয়া জেলখানিতে যুতে "ঠায় ঠায়" শব্দে খাঁটি সরিষার তৈল বাহির করিয়া এক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে।

এই সময় দেবগণ দেখেন, ১০। ১৫ খানি ঘোড়ার গাড়ি তারকেশ্বরে আসিতেছে। গাড়িগুলির দ্বার উদ্ঘাটন থাকায় তাঁহারা দেখিলেন, ভিতরে মেয়ে মিন্সেয় ঠেশাঠেশি করিয়া বসিয়া আছে। মাগীগুল্যোর লজ্জা নাই গলা ছাড়িয়া টপ্পা গান করিতেছে, মিন্সেগুলো করতালি দিতেছে। ক্রমে গাড়ি থামিল, মিন্সেগুলো গাড়ি থেকে লাফাইয়া পড়িয়া বৃহৎ বৃহৎ কাগজ গুলো চারি দিকে লটকাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ চাহিয়া দেখেন—কাগজ গুলিতে মুদ্রিত বৃহৎ বৃহৎ লাল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—অদ্য রজনীতে তারকেশ্বরে "মহান্তের ঘানি" নাটক এবং "এক টাকায় এক কাঁচ্চা তৈল" প্রহসনের অভিনয় হইবে। দর্শকেরা বিনা মূল্যে অভিনয় দেখিতে পাইবেন।

দেবরাজ কহিলেন "অদ্য এখানে অভিনয় দেখিতে হইবে।" নারায়ণ কহিলেন দেখ্‌লে হয়। যে স্থানের ঘটনা সেই স্থানে অভিনয়; অতএব অভিনয় যে কি সুন্দর হইবে বলা যায় না।"

উপ। ঠাকুর কাকা! থিয়েটরে কি আবার স্বতন্ত্র মহান্ত সাজাবে না ঐ মহান্ত নিজেই এসে রঙ্গ দেখাবে?

এই সময়ে দেবগণ দেখেন মহান্ত ছুটিয়া আসিতেছে। সে আসিয়াই থিয়েটরের দলের কর্ত্তার হাত ধরিল এবং সরোদনে কহিল

"মহাশয়! আমাকে মাপ করুন, আমায় যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আর কেন?

সম্পা। কি করি মহাশয় আমরা বেহালা নামক স্থানে অভিনয় করিতে গিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াই তারকেশ্বরকে মানিয়াছিলাম, বাবা যদি আমাদের উদ্ধার কর, আমরা এক দিন সদলে যাইয়া তোমাকে রঙ্গ দেখাইয়া আসিব। এক্ষণে বাবা উদ্ধার করাতেই আমরা রঙ্গ দেখাইতে আসিয়াছি। এখানে দর্শকদিগের নিকট হইতে এক পয়সা গ্রহণ করিব না।

মহা। ভাল অন্য নাটকের অভিনয় করুন। আপনারা যে নাটকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ও নাটকের অভিনয় আমার দ্বারা ত অতি উৎকৃষ্টতর হইয়া গিয়াছে। তার চেয়ে কি আপনারা ভাল পারিবেন?

সম্পা। সে বাবা তারকনাথের অনুগ্রহ। আপনি বসে থেকে ত সকলই দেখ্‌তে পাবেন।

না মহাশয়! না মহাশয়! আপনারা ২। ১০ হাজার টাকা যাহা ইচ্ছা লইয়া আমাকে মাপ করুন।

ব্রহ্মা। বরুণ! মহান্ত দেখচি টাকার আণ্ডিল!

মহান্ত অনেক কাঁদা কাটা করিয়া ও হাতে ধরিয়া যখন সম্পাদককে নিরস্ত করিতে পারিল না, তখন বিবাদ করিবার উদ্যোগ করিল। থিয়েটরওয়ালারাও পুলিষে সংবাদ দিতে চলিল। এবং কহিল "বাবা! পুলিষ মোতায়েন রাখিয়াও অভিনয় করিব, তোমাকে ছাড়িব না।"

পিতামহ কহিলেন "বরুণ পলাই চল। যেখানে পুলিষ ডাকাডাকির কাণ্ড উপস্থিত, সে স্থানে আর থাকিতে নাই।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইয়া এক খানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আবার বৈদ্যবাটীর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "তারকেশ্বরে চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে এবং শিবরাত্রির সময় বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে সর্ব্বদা উৎকট উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কি পাপে ঐ রোগ হইয়াছে এবং কি করিলে আরোগ্য হয়, জানিবার জন্য আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে। যাত্রীদিগের নিকট হইতে প্রত্যহ তারকেশ্বরের যথেষ্ট টাকা আয় হয়। মহান্ত কর্ত্তৃক দেশের যাহাতে উপকার হয় এমন কোন কাজ হয় নাই। মহান্তদিগের গিরি, পর্ব্বত, বন, অরণ্য, পুরী, ভারতী, নদী, সমুদ্র, ইত্যাদি দশটী উপাধি আছে। তন্মধ্যে তারকেশ্বরের মহান্তের উপাধি

গিরি এবং বৈদ্যবাটীর কালীর মহান্তের উপাধি ভারতী। কোন মহান্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান চেলা গদীতে বসিয়া থাকে। গদী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্রিত হইয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরে একটী কালী বাড়ী আছে।

নারা। শৈবতীর্থে কালী বাড়ী কেন ?

বরুণ। যদি কাহারও মদের মুখে পাঁটা খাইতে ইচ্ছা হয়, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় কালী বাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ক্রমে দেবগণের গাড়ী বৈদ্যবাটিতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা দেখেন, অসংখ্য লোক অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তারকেশ্বরে থিয়েটার দেখিতে যাইতেছে। দেবতারা সে রাত্রি বৈদ্যবাটীতে অতিবাহিত করিয়া প্রাতে ষ্টেষণে যাইলেন এবং শ্রীরামপুরের টিকিট লইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে সেওড়াপুলি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীরামপুরে পহুছিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

জগতের আদিম মানব-জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ।

অদ্য আমরা জগতের আদিম মানব-জাতির অনুসন্ধান বাসনায় লেখনী ধারণ করিয়াছি। বিচক্ষণ পাঠক হয় ত এই অসাধ্য সাধনে প্রোৎসাহিত দেখিয়া আমাদিগকে বাতুল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিবেন। কিন্তু এই বাতুলতা যে কেবল আমাদিগের মানস-ক্ষেত্রে আজ নূতন উদ্ভাবিত হইয়াছে এমত নহে,—আমাদিগের বহু পূর্ব্বে জগতের আদিম জাতি, ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই ত্রিবিধ জটিল বিষয়ের তত্ত্বোদ্ঘাটন মানসে বৈদেশিক দূরদর্শিগণ গভীর গবেষণাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিস্তর আন্দোলন ও সত্যানুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু কে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে অধুনা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় যে সমস্ত মনুষ্য বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে কোন জাতির কি কোন বংশের আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত যে কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায় না এমত নহে,—আদৌ ঐরূপ ইতিবৃত্তের অস্তিত্বই অসম্ভবনীয়। ইতিবৃত্ত যে কি উপাদেয় পদার্থ ও উহার উপকারিতা কি তাহা জগতের আদিম অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে আদৌ উপলব্ধি হয় নাই। মনুষ্য জাতির আদিম সৃষ্টি

বলিয়া যদ্যপি কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে সে "এক"মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র সমূহ মনুষ্যদিগের সামাজিক ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের অসদ্ভাবে বিশ্বব্যাপী নানাজাতীয় মানবমণ্ডলীর মধ্য হইতে তাহাদের আদিম বংশের নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে; বরং জলধিতল সিঞ্চন পূর্ব্বক তত্তল-নিহিত রত্নরাশির উদ্ধার করা কদাচিৎ সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য জাতির পুরাতত্ত্ব এতই অন্ধকারাবৃত যে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার বিশিষ্ট কোন উপায়ই দৃষ্ট হয় না। যদিও মানবীয় পুরাবৃত্ত-গগন চিরন্তনরূপে ঘোর ঘনঘটাবৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ বিদ্যুতের উজ্জ্বল স্ফুরণে ক্ষণে ক্ষণে উহার অন্তর্ভূত গূঢ়তত্ত্বসকল যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলক্ষিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব সেই আলোকের সাহায্যে আমাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য ইতিতত্ত্বের যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাই শ্রেয়স্কর।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতঃ প্রাধান্যপ্রিয়;—তাঁহাদের আবার স্বদেশ ও স্বজাতিপক্ষপাতিতা এবং ধর্ম্মান্ধতা এত প্রবল যে, সত্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়াও তাঁহারা সত্য সংগ্রহের পরিবর্ত্তে স্বকপোল-কল্পিত কূটতর্কের সাহায্যে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রাধান্য সমর্থন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করেন না। সম্প্রতি খৃষ্টোপাসকগণ নাকি আমাদিগের দৈবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তা যিশু খৃষ্টের সমন্বয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা নাকি তর্ক করেন যে, সেণ্টপাল ভারতবর্ষে আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করায় আর্য্য ব্রাহ্মণগণ সেই উপদেশের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। যদিও আমাদিগের সুবিজ্ঞ সহযোগী শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই অন্তঃসারশূন্য প্রলাপবাদের উপযুক্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের পুনরুক্তির আবশ্যকতা নাই, তথাপি আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে কাল সহকারে ইহা শুনিতে হইল যে সেণ্টপাল আমাদের মহর্ষি বেদব্যাসের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন!! ভালই ত, আমরাও এক্ষণ হইতে খ্রীষ্টীয় যাজকগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিব—যদি কোন মতে একটা ব্যাস বাল্মীক হইতে পারি, তাহাতে ক্ষতি কি?

আমরা অদ্য যে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত

জগতের সর্ব্বজাতীয় লোকের সংস্রব রহিয়াছে; অতএব এরূপ গুরুতর বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে হইলে সত্য সংগ্রহের যত কিছু প্রতিবন্ধ, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; ধর্ম্মান্ধতা ও স্বজাতি-পক্ষপাতিতার সংস্রববশতঃ যদ্যপি আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ কোন প্রকার মতামত ব্যক্ত করি, তাহা হইলে জনসমাজে তিরস্কৃত ও উপহাসাস্পদ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তবে মানব-প্রকৃতিসুলভ কোন প্রকার ভ্রমে পতিত হইলে সর্ব্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ যে আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণাকল্পে পৃথিবীর বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থাগত তারতম্য সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করিব।

এই বিচিত্র-বিশ্বরাজ্যের অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য বাস করিতেছে, তাঁহাদের পরস্পর দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও দেশভেদে বাহ্য সৌন্দর্য্যের এবং রুচিভেদে আহার, ব্যবহার রীতি নীতি ও পরিচ্ছদাদির তারতম্য লক্ষিত হয়; আবার ভাষা সম্বন্ধে পরস্পর এতই পার্থক্য যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ত কথাই নাই, এক দেশের মধ্যেও জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমরা এই প্রকাণ্ড পৃথ্বীমণ্ডলের অন্তর্ভূত যে সমস্ত দেশের বিবরণ জ্ঞাত আছি, তত্তদ্দেশীয় আস্তিকমাত্রেই পৃথক পৃথক অভিধানে একমাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন; তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ ও পৃথক পৃথক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন উপলক্ষিত হয়। ফলতঃ কালক্রমে মনুষ্যদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি ভাষা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্নতা ঘটিলেও সমস্ত মানব জাতি যে এক আদিম বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে সমগ্র ধরাতলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। অধুনা কোন প্রকার ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের অসম্ভাব স্থলে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানবমণ্ডলীর মধ্য হইতে তাহাদের আদিম বংশের নির্ণয় করা দুষ্কর ব্যাপার বটে; কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দিব্যালোক প্রভাবে উল্লিখিত জাতিবর্গের মূল ও শাখা প্রশাখা নিতান্ত অপরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, এই জটিল বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে আমাদিগের দুটী গুরুতর বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়;—তাহার একটী ধর্ম্ম-শাস্ত্র; অন্যটী ভাষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি চ এই উভয় গুরুতর বিষয়ে

আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিচারে আমাদিগের অধিকার সর্ব্বদাই সুপ্রশস্ত রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতই অন্ধ; অতএব ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে আমাদিগের যুক্তির মূল ভিত্তি করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের যথাযথ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পৃথ্বীতলে নানা প্রকার ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মোপাসনার বিধি ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী সংযুক্ত যে সমস্ত লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্র পুরাকাল হইতে লোক সমাজে প্রবর্ত্তিত ও সমধিক আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাই মনুষ্য জাতির প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) আর্য্যজাতীয় (২) অনার্য্যজাতীয়। আমরা সর্ব্বাগ্রে আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থূল স্থূল বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তৎপরে অনার্য্য-জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল একে একে অঙ্কিত করিব।

আর্য্যজাতীয় মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ—ইহা এক মাত্র পদার্থ হইলেও ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত ও চতুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়, ত্রিপিতক বা বৌদ্ধ শাস্ত্র। তৃতীয়, সঙ্গিতা বা জৈন শাস্ত্র। যদিও শেষোক্ত দ্বিবিধ শাস্ত্র বেদের এক একটী শাখা স্বরূপ, তথাপি তত্তৎ শাস্ত্রের আচার্য্যগণ বিভিন্ন যুক্তি ও বিশ্বাস বলে বেদের সহিত স্ব স্ব মতের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে বৌদ্ধ শাস্ত্রের কলেবর অধিকতর বিস্তৃত ও মার্জ্জিত। এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বৈদেশিক জাতি বিশেষের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু জৈনধর্ম্ম কেবল মাত্র ভারত মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে; এই ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাব সারবান কি সতেজ বলিয়া বোধ হয় না, তজ্জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় ইহা লোক সমাজে সমধিক আদৃত হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি অদ্যাপি বৈদেশিক জাতি মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে। তদ্ভিন্ন চতুর্থ স্থলে আমরা আর এক খানি ধর্ম্ম-শাস্ত্র দেখিতে পাই, ইহা জেন্দ অর্থাৎ পারসী ভাষায় প্রথিত এবং জেন্দাভেস্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ন্যায় ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বৈদিক রীত্যনুসারে গঠিত হইলেও বিশ্বাস ও যুক্তি ভেদে ইহাও একটী স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। এই শাস্ত্র জোরস্তান জাতি ভিন্ন অন্য জাতি মধ্যে প্রবর্ত্তিত কি সমাদৃত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতীয় বিশেষ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্ট হয় না, যাহা এ স্থলে উল্লেখ

করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। অতএব আমরা এক্ষণে অনার্য্যজাতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের যথাযথ উল্লেখ করিতেছি।

যেরূপ আর্য্য জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলভিত্তি বেদ, তদ্রূপ অনার্য্য জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলভিত্তি পুরাতন বাইবল; ইহার প্রধান শাখা নূতন ধর্ম্মনিয়ম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং অন্য শাখা কোরাণ অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র। যদিও শেষোক্ত দ্বিবিধ শাস্ত্র প্রথমোক্ত শাস্ত্রের এক একটী শাখা ভিন্ন অন্য নহে, কিন্তু খ্রীষ্ট ও মহম্মদ স্ব স্ব প্রভুত্ব দৃঢ়ীকৃত করিবার প্রত্যাশায় পৃথক পৃথক মতের উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়! আমরা উপরিভাগে যে দুই জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার এক জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ, অন্য জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বাইবলের আদিম ভাগ; সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রাচীন শাস্ত্রই আমাদিগের বিচারের প্রধান অবলম্বন স্থল। অতএব সর্ব্বাগ্রে অনার্য্য জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করাই বিধেয়।

বাইবলের আদি পুস্তক মনুষ্যকৃত,—দ্বিতীয় পরিচারিকার গর্ভসম্ভূত পুত্র মূসা কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কৃত হইয়া তদ্বংশীয় পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মূসা য়িহুদী জাতির আদিম পুরুষ নহেন। বাইবল্ গ্রন্থোক্ত আদম অর্থাৎ আদিম ব্যক্তি হইতে দশম পুরুষে আমরা নোয়া নামক ঈশ্বরভক্ত মনুষ্যকে দেখিতে পাই। এই নোয়ার জীবিতকালে একটী জলপ্লাবন বা প্রলয় কল্পিত হইয়াছে। সেই প্লাবনে নোয়া ও তাহার স্ত্রী পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ জীবিত ছিল না। পরন্তু নোয়ার পুত্র পৌত্রাদি অনেক পুরুষ গত হওয়ার পর মূসা জন্মগ্রহণ করেন। মূসা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে খৃষ্টীয় পরমেশ্বর যে ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমত নহেন, বরং তিনি নোয়া হইতে তদ্বংশীয় ইব্রাহাম প্রভৃতি পুরুষ পরম্পরার মস্তক আশ্রয় করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু মূসার জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নোয়া হইতে মূসার সময় পর্য্যন্ত বাবিলন, বিথেল, লিশা, সিনার প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের নাম সৃষ্টি প্রকরণানুসারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইজিপ্ট দেশের উল্লেখ যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কাররূপে বোধ হয়, ঈশ্বরের আদি সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতে ইজিপ্টদেশ বিশেষ বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। ফলতঃ বাইবল গ্রন্থে যে ভাবে সৃষ্টি বিবরণ বর্ণিত হই-

য়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগের বোধ হয় যে, উহা পৃথিবীর আদি সৃষ্টি বৃত্তান্ত নহে, শুদ্ধ ইস্রায়েল দেশের আদি সৃষ্টি বিবরণ মাত্র।

আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পরম পবিত্র ধর্ম্মরাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরাৎপর পরম পুরুষের অপার মহিমা ও অনন্তশক্তি প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত হইব—না মনুষ্য জাতির আধিপত্য ও প্রভুত্বের পক্ষপাতী হইয়া মানুষে মিশিতে চেষ্টা করিব? আমরা এক্ষণে যে শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই শাস্ত্রে রাজমন্ত্রীর ন্যায় এক জাতীয় মনুষ্যের আধিপত্য অধিক। ইহারাই ঐশিক রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, এবং ঈশ্বর ও উপাসকের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া স্বর্গপথ প্রদর্শন করেন। তদ্ভিন্ন এই শাস্ত্রের দুটী জীবনীশক্তি আছে (১) স্বপ্নদর্শিত বৃত্তান্ত (২) ভবিষ্যদ্বাক্য। কিন্তু উক্ত স্বপ্নদর্শিত বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যদ্বাক্যের সফলতা সম্বন্ধে পরস্পর কতকগুলি মতভেদ আছে।

আমরা ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় শাস্ত্র বাই-বলের আদি পুস্তকের এক একটী শাখা স্বরূপ। কিন্তু বাইবল শাস্ত্রানুসারে যে য়িহুদীরা ঈশ্বরের এক মাত্র অনুগৃহীত বংশ, যে বংশে মুসা হইতে খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই য়িহুদী জাতি যিশু ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সত্তা ও সারবত্তা স্বীকার করেন না। খৃষ্টোপাসকগণ বলেন আদি পুস্তকে এক জন মহাপুরুষ পরে প্রাদুর্ভূত হইবেন বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, যিশুর জন্মপরিগ্রহ দ্বারা সেই বাক্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু য়িহুদীরা সেই বাক্যের সত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন আদি গ্রন্থে এক জন রাজার প্রাদুর্ভূত হওয়ার কথা আছে, তিনি অদ্যাপি ভূতলে অবতীর্ণ হন নাই। আবার মহম্মদীয় শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ কৌতুক দেখা যায়। মহম্মদ খৃষ্টীয় বাইবলের একটী ভবিষ্য বাক্যের উপর স্বপ্রণীত শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং তদীয় পুস্তকে বাই-বলের আদি অন্ত ও উভয় ভাগের পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে। মুসল-মানেরা মুসাপ্রণীত পুস্তককে তউরিত, দায়ুদপ্রণীত পুস্তককে জব্বুর এবং খৃষ্টীয় পুস্তককে ইঞ্জিল বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ইঞ্জিল কেতাবে ঈসানবির (যিশু খৃষ্টের) হুকুম আছে যে তাঁহার পরে আর এক জন "পয়-গম্বর" অর্থাৎ মহাপুরুষ জগতে প্রাদুর্ভূত হইবেন, এবং মহম্মদের জন্ম-পরিগ্রহের দ্বারা সেই বাক্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টোপাসকেরা সেই

কথা আদৌ স্বীকার করেন না। এই সকল কারণে শেষোক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূলেই পরস্পর ঘোর মতবিসম্বাদিতা দৃষ্ট হয়।

আমরা উপরিভাগে যে কয়েকটি ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে বাইবলের আদিম ভাগ হিব্রু ভাষায়, খৃষ্টীয় নূতন ধর্ম্মপুস্তক গ্রীক ভাষায় এবং মহম্মদীয় পুস্তক আরবীয় ভাষায় গ্রথিত। এই ত্রিবিধ ভাষার মধ্যে হিব্রু ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন; পুরাতন বাইবল হইতে যেরূপ খৃষ্টীয় এবং মহম্মদীয় শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাচীন হিব্রু ভাষা হইতেই গ্রীক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। আরব দেশীয় লোক অপেক্ষা গ্রীকদিগের সহিত য়িহুদী জাতির * অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতার ফল খৃষ্টীয় পুস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টের প্রাদুর্ভাবকালে বোধ হয় গ্রীক ভাষার অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার শিষ্যগণ গ্রীক ভাষায় স্ব স্ব পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আরব দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে যদিও দেব-দেবী এবং অগ্নির উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল, তথাপি বাইবল ব্যবস্থিত ধর্ম্ম যে উক্ত দেশে একবারে অপ্রসিদ্ধ ছিল তাহা নহে। আরব দেশের প্রাচীন রহস্য আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থেও বাইবলোক্ত সলেমন্ রাজার নামোল্লেখ রহিয়াছে; সুতরাং য়িহুদী জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র আরবের সর্ব্বত্র না হউক, কোন কোন ভাগে যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক বাইবল্ এবং বৈদেশিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইজিপ্ত, য়িহুদা, ইটালী, গ্রীক, রোম, এই কতিপয় দেশ অধিকতর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আরব দেশও নিতান্ত আধুনিক নহে। বৈদেশিক আচার্য্যগণ ঐ সকল প্রাচীন দেশের ইতিতত্ত্ব সংগ্রহার্থ বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণ সকলি প্রাচীন কালে পৌত্তলিক ছিলেন, অদ্যাপি তত্তদেশে যে সকল প্রাচীন মন্দির ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এবং প্রস্তর ফলকে নানা প্রকার দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু কালসহকারে তৎসমুদায় এতই বিকৃত ও অপরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে যে বিভিন্ন দেশীয় লোকের ত কথাই নাই, তত্তদ্দেশীয় লোকেরাও উহার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ নহেন। এইরূপ নানা কারণে আমাদিগের বোধ হয় মুসা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া যান, মুসা কিম্বা যোষেফ প্রভৃতির সময়ে তাহাদের ধর্ম্ম মত জনসমাজে আদৃত হয়

* আমরা অতঃপর ভাষা সম্বন্ধে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিব।

নাই। বরং তৎকালে বিবিধ দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি অধিক প্রবর্ত্তিত ছিল। পরে প্রবল প্রতাপ দায়ুদের সময় হইতে ঐ ধর্ম্মের সর্ব্বত্র প্রচার আরম্ভ হইয়া সলোমনের সময়ে অধিকতর উন্নতি লাভ করে। আমরা অনার্য্য-জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও আভ্যন্তরিক তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করিলাম, এক্ষণে আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও আভ্যন্তরিক ভাব-সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক জগতের আদিম জাতির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব।

আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ—এই বেদের রচয়িতা কে? আর কোন সময়ে রচিত হইয়াছে? রচয়িতার সংখ্যা এক কি ততোধিক? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিস্তর আন্দোলন ও অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালত্রয়দর্শী প্রাচীন মহর্ষিগণ এ বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া যে কেবল দেশীয় সুধীসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে এমত নহে, বৈদেশিক দার্শনিকগণও সেই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। এই উপাদেয় বস্তু বহ্বর্থপ্রতিপাদক এবং বহুশাখাবিশিষ্ট। কিন্তু উহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোন স্থলেই রচয়িতার নামোল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে পুরাণ, সংহিতা, দর্শন প্রভৃতি যত প্রকার প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাবলী দৃষ্ট হয়, তৎ-সমস্তই বেদ মূলকঃ—বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যদিগের কোন প্রকার শাস্ত্র-সম্পত্তি ছিল অথবা বৈদিক ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁহারা কখন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এমত কোন প্রমাণ কি প্রাচীন প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। আমরা একমাত্র বেদ ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ যত প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থাবলীর বিবরণ অবগত আছি, উহার প্রত্যেক গ্রন্থে ও শাস্ত্রে রচয়িতার পরিষ্কার নামোল্লেখ রহিয়াছে; এমত স্থলে মানব প্রকৃতি জানিবার জন্য তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়ার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। যাহারা এই বহু-বিস্তৃত বেদের আভ্যন্তরিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক সামগ্রী পৃথিবীতলে আর নাই। এই শাস্ত্রে যে কেবল আর্য্যজাতিকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে এমত নহে, বরং ইহা মানব জাতির শব্দ জ্ঞানের এক মাত্র আকর। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কখন কেহ বেদরূপ মহাসিন্ধুর পার হইতে পারেন নাই এবং পারিবেন না। যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞান-বিকাশ জন্য জগদীশ্বর মানবদিগকে কোন বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, তবে সে কেবল এক মাত্র বেদ। গৃহী, যতি, বানপ্রস্থ প্রভৃতি

শ্রেণীভেদে পৃথিবীতে যত প্রকার লোক দেখা যায়, ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম্মই বেদে বিবৃত রহিয়াছে। বেদকর্ত্তা মনুষ্য-সমাজের অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করিয়া পরিশেষে তাহার এবম্প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন যথা,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" বেদে যতপ্রকার উপাসনাবিধি—থাকুক না কেন,তৎসমস্তই ব্রহ্মোদ্দেশে। বাস্তবিক পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মোপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম যে অপেক্ষাকৃত জ্যোতিষ্মান্ ও বিশুদ্ধ,এ কথা আজ কাল জগতের সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। অতএব এই অতি প্রাচীন বেদশাস্ত্র জগতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না তদ্বিষয় সাবধানে পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ মহর্ষি মণ্ডলে তর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, মহামহোপাধ্যায় পরাশর তাহার এইরূপ মীমাংসা করিয়া দেন যথা,—" ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ " কোন ব্যক্তি বেদের কর্ত্তা নহেন। কিন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই বেদ স্মরণ করেন। মহর্ষির এই নির্দ্দেশ অতীব গূঢ়ার্থ প্রতিপাদক। তিনি বলেন বেদপ্রণয়নে ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তৃত্ব নাই। পিতামহ ব্রহ্মাই বেদস্মরণ পূর্ব্বক আর্য্য সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। অবিদিত নাই যে ব্রহ্মাই আর্য্যবংশের অদিপুরুষ, তজ্জন্য তিনি পিতামহ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টির আদিতে প্রজা বৃদ্ধি করা যেরূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল, তদ্রূপ তাহাদের মঙ্গল কামনায় জ্ঞানতত্ব বিস্তারেরও বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছিল। তজ্জন্য কৃপাময় পরমেশ্বর সেই আদিম পুরুষের হৃদয় ক্ষেত্রে বেদরূপ ধর্ম্মবীজের বপন করেন; তদনুসারে সেই মহাপুরুষের মানস-ক্ষেত্রে অব্যর্থ বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত ও বিস্তৃত হওয়ায় তিনি তৎসমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি ব্যক্তিগণকে ক্রমান্বয়ে উহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে পৃথিবীতলে প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেদ শিক্ষা ও বৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের আলোচনা ও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এবং উত্তরকালে তত্বজ্ঞানের বহু বিস্তৃতি নিবন্ধন আর্য্যসমাজে সত্য যুগ দেখা দিল, আর আর্য্যভূমী যাগ যজ্ঞ মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমরা যে সকল কারণে বৈদিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রথম কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে,—অর্থাৎ এই ধর্ম্ম-

শাস্ত্র মনুষ্য কৃত নহে। দ্বিতীয় কারণ এই যে অনার্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর ও উপাসক এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক এক জন মনুষ্যের অসীম প্রভুত্ব কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের অণুমাত্র প্রভুত্ব কি কর্ত্তৃত্ব নাই। এতদ্দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহা মনুষ্যকৃত, তাহাতে চিরদিনই মনুষ্যের প্রাধান্য থাকিবে। কিন্তু যাহা ঈশ্বর-কৃত তাহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ। তৃতীয় কারণ ...দের পুরাতন এবং নূতন উভয় পুস্তকে সপ্তাহের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার ...দিন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সকল সময়ের জন্যই ঈশ্বর চিন্তা ব্যবস্থিত হইয়া নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার দৃঢ় বিধান করা হইয়াছে। এই ধর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদির ব্যবস্থা বহুবিস্তৃত, এমন কি সর্ব্বভূতে সমভাবে দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিজাতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুখভোগের জন্য ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হওয়ায়, উপা-সকগণ সুখসাধন লালসার বশবর্ত্তী হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক উপাসকগণ সুখভোগ প্রত্যাশা করেন না, তাঁহারা ঈশ্বরের নিমিত্ত ঈশ্বরোপাসনা করেন। আর তাঁহারা ঈশ্বর প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া সেই পরমপুরুষকে প্রাণের প্রাণ এবং জীবনের জীবন ভিন্ন অন্যাভিধানে অভিহিত করেন না।

পাঠক! আমরা বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উপরিভাগে যে কয়েকটী হেতুর নির্দ্দেশ করিয়াছি, উহা আপনি সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন কি না? যদি আপনার অন্তঃকরণ সন্দেহসংশয় শূন্য না হইয়া থাকে, তবে ঐরূপ আরো অনেক হেতু ও প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বৈদিক ধর্ম্মের পরম পবিত্রতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা,—বেদপ্রণি-হিতোধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" অর্থাৎ বেদে যাহা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে তাহাই ধর্ম্ম, তদ্বিপর্য্যয় সমস্তই অধর্ম্ম। এরূপ নিঃসংশয় নির্দ্দেশ ও তেজস্বিতার একদেশ কি অন্য কোন শাস্ত্রে আছে? সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে পুনর্গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মবহি-স্কৃত ব্যক্তিকে চিরজীবনের জন্য ঘৃণা করেন; যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করে, এবং তদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস না হওয়ায় পুনর্ব্বার স্বধর্ম্ম গ্রহণে অভিলষিত হয়, তাহার জীবন চির কলুষিত, তৎপ্রতি কখন কি

বিশ্বাস করা যাইতে পারে? বিধর্ম্মী ব্যক্তিকে পুনর্গ্রহণ করা দূরে থাকুক সমুদ্র সদৃশ সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে পুনর্গ্রহণ-দ্যোতক আদৌ কোন শব্দই নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।—
শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার
যশোহর।

অদ্ভুত ভৌতিক তত্ত্ব।

এই অদ্ভুত বিশ্বব্যাপার মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। প্রকৃতির নিয়োজিত পরিবর্ত্তন হইতেছে; ক্ষণকালের নিমিত্ত একটী পরমাণুও একভাবে থাকে না। আমরা সর্ব্বদা চক্ষুর উপর যাহা কিছু দেখিতেছি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না, তাই রক্ষা; নচেৎ এই জড়বৎ মাংসপিণ্ড দেহের অন্তর্ভূত অদ্ভুত আনুমানিক ভূতাত্মক মনের এক তিলার্দ্ধকালও স্বস্তি থাকিত না। আমরা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতাম। কিন্তু যে গুলি অপরিহার্য্য, উপেক্ষা করিলেও মনকে ক্ষান্ত রাখিতে পারা যায় না; তৎসমুদায় প্রাকৃতিক তত্ত্ব লইয়া সময়ে সময়ে আন্দোলন করিতে হয়। নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনক্রম আমাদের সম্যক জ্ঞানগোচর হয় না। তথাচ সন্নিকৃষ্ট কার্য্যকারণ দ্বারা এবং প্রকৃতি পরিবর্ত্তন দর্শনে আমরা বিপ্রকৃষ্ট কার্য্যকারণ তত্ত্ব অনেকটা জানিতে পারি। ভারতবাসিদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন অনেক কাল হইতে বিশ্রাম করিতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশের আর অধিকার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ আমরা যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিব সেটী নূতন, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তৎপাঠে প্রথমে উপহাস করিবেন, এমন আশঙ্কা হইতেছে। নূতন মত প্রথমেই সর্ব্বত্র আদৃত ও পরিগৃহীত হয় না। অতএব অদ্য আমি যে মত প্রকাশ করিব, তাহা যে এককালে সর্ব্ববাদি-সম্মত হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? ইহার বিপক্ষে বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত হইতে থাকিবে, ইহার এক এক পদে এক এক প্রক্রমে কত ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে, পরিশেষে দধিমথিত উপাদেয় সসার নবনীতটুকু বিসৃষ্ট হইয়া তত্ত্বরসের স্বাদগ্রাহী সহৃদয় জনের রসনাকে পরিতৃপ্ত করিবে।

সৃষ্টির প্রাক্কালে এই পৃথিবী কেবল জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল; এখন পৃথিবী চলিতেছে, পৃথিবী বলিলেই আমাদের মৃৎপিণ্ড জ্ঞান জন্মে; কিন্ত

বস্তুতঃ, তৎকালে এই মৃত্তিকারাশি কিছুই ছিল না। কেবল অসীম অনন্ত জলধি শূন্যে ঢল ঢল করিতেছিল। আকাশ উহার আধারভাণ্ড, চতুঃ-পার্শ্বস্থ আকর্ষণী শক্তি উহার অবলম্বন। জলধি শূন্য-দেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হস্ত, জল-নিমগ্ন করিয়া অঙ্গুলিগুলিকে অধোমুখে রাখ, এক একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার জলবিন্দু ঝুলিতে থাকিবে। দোদুল্যমান বিন্দুগুলি লম্বাকার নহে, ত্রিকোণ নয়, চতুষ্কোণও নয়,—গোলাকার। তরল পদার্থ না হইলে এ প্রকার গোলাকারে কিছুই পরিণত হইতে পারে না। অঙ্গুলির আকর্ষণে জলবিন্দু অঙ্গুলিতে সংলগ্ন রহিল, এ দিকে পৃথিবীর এবং পার্শ্বস্থ আকর্ষণে উহাকে টানিতেছে, সুতরাং জলকণা গোল হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে আমরা যাহা কিছু লম্বাকার দেখি, সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া দেখিলে তৎসমুদায়ই গোল; সংসারে গোলাকার ভিন্ন অন্য আকারের পদার্থ এককালে নাই। বাঁশের একটী পর্ব্ব দেখ, চক্ষে দেখিতে দীর্ঘাকার; কিন্তু উহার এক একটী সূত্র কেবল গোলাকার অণুর সমষ্টি মাত্র। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা গায়ে গায়ে মালা গাঁথিলে এবং মুক্তাদ্বয়ের ব্যবধানে আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর মুক্তা সাজাইলে একটী লম্বাকার মাল্য হইয়া পড়ে, বংশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুগুলিও ঠিক তদ্রূপ। উহা কতকগুলি সূক্ষ্ম গোলাকার অণুর সমাহার মাত্র। একটী গুঁড়ির মধ্যস্থল কর্ত্তন কর, তাহাতে গোলাকার বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হইবে, আবার বৃক্ষের অঙ্গভূত সূত্রগুলি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি। যবক্ষার দ্রব করিয়া জাল দিতে দিতে যখন ঐ দ্রব ঘনীভূত হইয়া আইসে, তৎকালে (শীতল হইলে) যবক্ষার দীর্ঘাকার ধারণ করে। তরল পদার্থ গাঢ় হইবার সময় গোলাকার হইবারই কথা, তবে উহা কি নিমিত্ত লম্বাকার হয়? ইহার একটী বিশেষ কারণ আছে, আদৌ যবক্ষারের সূক্ষ্ম রেণুগুলি নিটোল গোলাকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। শীতল হইবার কালে ঐ সূক্ষ্ম রেণুকাগুলি পরস্পরের অঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া লম্বাকার ধারণ করে। এইরূপে জীব জন্তুর হস্ত পদ অস্থি চর্ম্ম শিরা প্রভৃতি যাহা কিছু সহজ চক্ষে দীর্ঘাকার বোধ হয়, সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া দেখিলে সমস্তই গোলাকার, সংসারে অন্যবিধ আকারের কোন পদার্থ নাই। ইহার কারণ এই সমস্ত কঠিন পদার্থ দ্রব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। দ্রব দ্রব্যই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তির কারণ।

সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবীও একটী দ্রব পদার্থ ছিল। তাহা বিশ্বপ্লাবিত

অকূল জলধি। এস্থলে আমরা "বিশ্ব" বলিয়া অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদিকে গণনা করিতেছি না, আমাদের বাস্তব্য পৃথিবীই প্রধান উপলক্ষ্য। সকল-জাতীয় ধর্ম্মপুস্তকে সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমে পৃথ্বী জলময় দ্রব পদার্থ ছিল। তজ্জন্য ইহা গোলাকার হইয়াছে। অতঃপর শূন্য দেশের উড্ডীয়মান রেণুরাশি ঐ জলে মিশ্রিত হইয়া এবং পার্শ্বস্থ গ্রহাদির সন্তাপে গাঢ় হইয়া পৃথিবী এখন কঠিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যে যে স্থল পরমাণু রাশিতে এখনও ভরাট করিতে পারে নাই, তত্তৎস্থান অদ্যাপি জলপূর্ণ সমুদ্র বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

মৃত্তিকা খনন করিলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় পৃথিবী ক্রমশঃ স্তরে স্তরে পুরু হইয়া আসিয়াছে। কোন স্থানের মৃত্তিকা উত্তোলন করিলে তাহার এক এক স্তরে গলিত উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব পদার্থের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্দর্শনে অবাধে প্রতিপন্ন হইতেছে, পৃথিবী চতুঃপার্শ্বেই ক্রমশঃ পুরু হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার কলেবরও উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবয়ব যত বড় দৃষ্টিগোচর হইতেছে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কখনই এত বড় ছিল না। এক এক স্তরে এক এক অংশ করিয়া পৃথিবীকে স্থূল করিতেছে। এক্ষণে বিবেচনা করুন, কেবল বিগলিত উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব পদার্থেই পৃথিবীর আকার বৃদ্ধি হই-তেছে না, ইহার অন্য কোন পৃথক কারণ থাকিবার সম্ভাবনা। একটী ক্ষেত্রে বারম্বার শস্য রোপণ কর, ক্রমশঃ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আসিবে। তাহার কারণ এই, মৃত্তিকার ফস্‌ফরস প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব পার্থিব পদার্থেই যদি পৃথিবীর শস্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইত এবং সেই শস্যাদি ভোজন করিয়া জীব জন্তু হৃষ্টপুষ্ট আকার হইত, তবে তাহাদের অত্যয়ে পৃথিবীর আকার ও ভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কই? পৃথিবী হইতে /৫ পাঁচ সের সার ভাগ লইয়া কোন শস্য বর্দ্ধিত হইল, এবং সেই শস্য ভক্ষণ করিয়া কোন জীব হৃষ্টপুষ্ট হইল, এমন স্থলে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর ক্ষয় বৃদ্ধিই ঘটিত, উত্তরোত্তর আকার ও অবয়বের বৃদ্ধি হইতে পারিত না। অতএব স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, এখনও বায়বীয় পদার্থ পৃথিবীতে সংমিশ্রিত হইতেছে। বাষ্পরূপে জল শূন্যে উত্থিত হয়, তাহাতে আকাশস্থিত নানাবিধ বায়বীয় বাষ্প এবং রেণুসংভৃতসলিল মেঘপটলে আসিয়া মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তদ্ভিন্ন নিয়ত বহমান বায়ুর সংযোগে মৃত্তিকা নানা প্রকার ধর্ম্মা-

ক্রান্ত হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদিচ এই ভারবৃদ্ধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষ্পাদিত হয় না, কিন্তু রেণুকা এবং বাষ্পাদির দ্বারা পারম্পারিক সম্বন্ধে অনেকটা ভারাধিক্য হয়। একটী জীবের ভুক্তদ্রব্য ভিন্ন নিশ্বাসিত বায়ুর অম্লজান দ্বারা দেহের পোষণক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত হয়, অম্লজান কেবল রক্তকে মার্জ্জিত করে। মৃত্তিকাও তদ্রূপ পৃথিবী বহির্ভূত উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়, তৎপরে তৃণলতাদিতে মৃত্তিকার ধর্ম্মে নীত হয়, এবং তৃণলতাদি বিগলিত হইলে পৃথিবী পুরু হইয়া উঠে। পর্ব্বতের পলীমৃত্তিকা নিঃসৃত জল সহযোগে সমুদ্রে আসিয়া পড়ে। ঐ মৃত্তিকা এক এক স্থানে সঞ্চিত হইয়া বৃহদাকার দ্বীপ হয়। কিন্তু একমাত্র পৈথিবিক দ্রব্যের ক্ষয়ে দ্বীপপুঞ্জ নির্ম্মিত হইলে এত দিন হিমবান্ শিখরিকেও অর্দ্ধাবশিষ্ট হইতে হইত। বৎসর বৎসর পর্ব্বতেরও আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। যে কারণে পৃথিবীতে মৃৎ সঞ্চিত হইয়া আজ এত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যে অব্যাহত কারণে হিমালয় আজি অত্যুচ্চ মস্তক উন্নত করিয়া অভ্ররাশি ভেদ করিতেছে, এখনও সে বর্দ্ধিষ্ণু কারণের বিরাম হয় নাই। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতেছে, সাগরকুক্ষি হইতে দূরবর্ত্তী স্থান ততই উচ্চ হইয়া আসিতেছে, এবং কূলসন্নিহিত সাগরগর্ভ অল্পে অল্পে ভরাট হইয়া আসিতেছে। আমাদের নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থান পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভগত ছিল, ক্রমে পলী পড়িয়া তত্তৎ স্থল এখন লোকের আবাস ভূমি হইয়াছে। পুষ্করিণী নিখাত করিবার সময় অনেক স্থলে গলিত তরণী, কর্ণ, ক্ষেপণী প্রভৃতি জলপোতের উপকরণ দৃষ্ট হয়। আমাদের বাহুতা গ্রামের পূর্ব্বাংশে বরন্তী নামে একটী সুবিস্তীর্ণ বিল আছে, তাহা অদ্যাবধি সাগর অথা বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। এই পৃথিবীরও অন্যান্য স্থলও ঐরূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে অসীম জলরাশি মাত্র, তৎপরে টল টলে তরল পঙ্ক, তৎপরে স্থানে স্থানে কর্দ্দমের স্তূপ সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে লাগিল, কোন কোন স্থানে হ্রদ, নদ অথবা থাকিয়া গেল, কাল সহকারে তত্তৎস্থলও ভরাট হইয়া উঠিল।

যে স্থান সম্প্রতি ভরাট হইয়াছে, তথাকার মৃত্তিকা অদ্যাবধি সরস আছে। যে স্থান বহুকাল ভরাট হইয়া গিয়াছে, তথাকার মৃত্তিকা আর তেমন সরস নাই। নিম্ন বঙ্গের স্থল বিশেষে দশ হাত মৃত্তিকার নিম্নে জলোদ্গত হয় এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক ভূমির এক প্রাদেশ নিচে সরস মৃত্তিকা

পাওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে কোথাও বাট হাত কোথাও আশী হাতের নিম্নে জল উঠিয়া থাকে এবং তিন চারি হাত ভূমি খনন না করিলে সরস মৃত্তিকা পাওয়া যায় না। উপরের স্তর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতেছে এবং সাগরও নিম্নে গিয়া পড়িতেছে, তজ্জন্যই এত দূরের মৃত্তিকা নীরস।

পূর্ব্বে পৃথিবী তরল ছিল এবং ক্রমে ক্রমে সাগর ভরাট হইয়া আসিতেছে। যদি এ প্রকার অনুমান যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বহুকাল পরে সমস্ত সাগর যে একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। ক্রমে পৃথিবীতলে জলের বিন্দু বিসর্গও থাকিবে না, সুতরাং উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজগতের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কিম্বা অন্য কোন অভিনব পদার্থ ইহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে।

পৃথিবী জলশূন্য হইলে ইহার কি প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এক্ষণে তাহাই নিশ্চিত করা আবশ্যক। তৈলহীন সরস দ্রব্য ভক্ষণ করিলে প্রথমে ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ পয়োবৎ কাইলে পরিণত হয়, তৎপরে উহা রক্ত হয়, তৎপরে উহা মেদ হয়। গোধূম, তণ্ডুল, চণক প্রভৃতি শস্যে তৈল নাই, যৎকিঞ্চিৎ থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নহে; কিন্তু এই সমস্ত শস্য ভক্ষণ করিলে দেহে বিলক্ষণ মেদ সঞ্চয় হয়। নারিকেলে সর্ব্বাগ্রে জলের সঞ্চার; প্রথমাবস্থায় সেই জল তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তন্মধ্যে কিছু মাত্র তৈলাংশ উপলব্ধি হইবে না। তৎপরে সেই জল হইতে শস্যোৎপত্তি হয়, এবং শস্য হইতে তৈল জন্মে। অন্যান্য ফলের বীজেও পরিণত অবস্থায় অল্প বা অধিক তৈল উৎপন্ন হয়। বিগলিত উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব পদার্থ প্রথমে জলযুক্ত থাকে, শুষ্ক হইলে কালক্রমে তৈলাক্ত ও দাহ্য পদার্থে পরিণত হয়। পাথুরিয়া কয়লা, যবক্ষার, উষ্ণপ্রস্রবণ, গন্ধক, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি তাহার প্রমাণ স্থল। তৈলাক্ত এবং দাহ্য পদার্থ অধিক কাল সঞ্চিত থাকিলে তাহাতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। পাথুরিয়া কয়লায় এবং আগ্নেয়গিরিতে স্বভাবতঃ অগ্নি জন্মে। অতএব পরিণামে পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ অগ্নিরাশিতে পরিণত হইবে; তৎপরে কিছু কাল প্রদীপ্ত থাকিয়া ক্ষার হইয়া যাইবে; তখন পরমাণুগুলি আর পরস্পর সংলগ্ন থাকিতে পারিবে না,—একে একে পৃথগ্ভূত হইয়া পড়িবে।

এই তেজোরাশিপরিপূর্ণ মার্ত্তণ্ড প্রথমে পৃথিবীর তুল্য প্রভাহীন মৃণ্ময় পদার্থ ছিল, এইরূপ অনুমান হয়। কাল সহকারে পরিবর্ত্তন প্রক্রমের বশ-

বর্ত্তী হইয়া আজ উহা এ প্রকার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ক্ষণকালও বিরাম নাই, নিয়তই প্রকৃতির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। অতএব সূর্য্যমণ্ডল এখন যে অবস্থায় আছে, অবশ্যই তাহার প্রকৃতিগত রূপান্তর ঘটিবে।

প্রদীপের আলোকে পলকাটা এক খণ্ড বেলয়ারি কাচ ধরিলে তাহার মধ্যে নানা প্রকার বর্ণের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সূর্য্যালোকেও পলকাটা কাচ ধরিলে ততগুলি বর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। একটী প্রকোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের সমস্ত দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক ঘরটী অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া পরে সূক্ষ্ম একটী ছিদ্রপথে তন্মধ্যে আলোক প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাতে পলকাটা কাচ ধরিলে ঐ আলোক অবক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। তখন প্রতিফলিত আলোকরেখায় রামধনুকের ন্যায় যথাক্রমে বায়লেট, নীল, ঘোর নীল, হরিত, পীত, কমলা ও লোহিত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ মধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করাইয়া পলকাটা কাচ ধরিলে প্রতিভাসিত আলোকরেখায় ঐ সাতটী বর্ণ বর্ত্তমান থাকে।

পূর্ব্বে সকল বর্ণের অভাবকেই শুক্ল বর্ণ বলা হইত; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে মতের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যথোপযুক্ত কতকগুলি বর্ণের সংযোগে শুক্ল বর্ণ উৎপন্ন হয়, ইহাই এখন সকলে স্বীকার করেন। অতএব শুভ্রবর্ণ যৌগিক পদার্থ, উপযুক্ত উপায় দ্বারা বিশ্লেষ করিতে পারিলে তদন্তর্গত রূঢ় পদার্থ গুলি পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ আলোকও বিবিধ রূঢ় পদার্থ মিশ্রিত উপযুক্ত উপায় দ্বারা বিশ্লেষ করিতে পারিলে তাহার নিদানভূত উপাদানগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। পলকাটা কাচ দ্বারা কিম্বা আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা আলোক বিভাসিত হইয়া কোন যবনিকাতে প্রতিক্ষিপ্ত হইলে উপরের উক্ত সাতটী বর্ণ দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি বর্ণ আছে। ঐ সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তাহাদের মূলীভূত উপাদানের পরিচয় দিয়া থাকে। বর্ণগুলি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে না, তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাল রেখার ব্যবধান আছে। সোডা দগ্ধ করিলে অবক্ষিপ্ত আলোকে ঐ প্রকার কাল রেখা দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহাতে বর্ণের অভাব ঘটিবার কারণ কি তাহা আমরা " পরমাণুক ও দ্ব্যণুক " শীর্ষক প্রস্তাবে প্রকাশ করিব।

আলোকবিশ্ব প্রকৃতিভেদে তিন প্রকার। যে স্থলে বর্ণের মধ্যে কিছু

মাত্র ব্যবধান থাকে না, তাহাকে অবিচ্ছিন্ন আলোকবিম্ব বলা যায়। কৃষ্ণবর্ণ-রেখা-ব্যবহিত আলোককে বিচ্ছিন্ন আলোকবিম্ব কহে। তৃতীয়, সূর্য্যাদির শোষণ আলোক।

সকল বস্তুর আলোকের প্রকৃতি সমান নহে। পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের আলোকবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকার। অনেকগুলি ধাতব পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিলে তদুদ্ভূত আলোক বর্ণ এক প্রকার হয় না। আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারা যায়। বর্ণ বিক্ষিপ্ত হইলে মূলীভূত সকল পদার্থেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাড়িত অগ্নিতে অঙ্গার প্রজ্বালিত করিলে সাতটী বর্ণের মধ্যে কুত্রাপি অবসর থাকে না। ইহা অবিচ্ছিন্ন আলোকবিম্বের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্বালিত করিলে তদুদ্ভূত আলোক বিম্বে বর্ণের ব্যবচ্ছেদ থাকে।

পৃথিবীতে সন্নিকৃষ্ট পদার্থের আলোক বিম্ব দর্শনে আমরা বর্ণের নিদান ভূত কারণ স্পষ্ট জানিতেছি; তদ্রূপ আলোক দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট সূর্য্যেরও প্রকৃতি জ্ঞাত হইয়া থাকি,—উহা বাষ্পময়-তরল পদার্থ। যে কোন প্রকার আলোক হউক না, মূলে তাহার উপকরণ প্রজ্বলিত হইলে আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। আলোক বেগাদির বিবরণ আমরা কয়েক বার বর্ণন করিয়াছি, এ স্থলে আর পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই। সূর্য্যমণ্ডলোদ্ভূত আলোক দৃষ্টে আমরা স্পষ্টই জানিতেছি, তথায় বাষ্পাদি প্রজ্বলিত হইতেছে।

এক্ষণে বিবেচনা করুন, কোন আগন্তুক প্রতিবন্ধ না ঘটিলে শিশুকে দেখিলে আমরা বার্দ্ধক্যের অনুমান কল্পনা করিতে পারি এবং বৃদ্ধকে দেখিলে তাহার শৈশবাবস্থা সহজে বোধগম্য হয়। সূর্য্য প্রজ্বলিত তরল বাষ্পময় পদার্থ, তদ্দৃষ্টে আমরা আলোকের মূলীভূত কারণে অবতীর্ণ হইয়া যে যে পদার্থ হইতে তত্তৎবর্ণাক্রান্ত আলোক উৎপন্ন হয়, তাহাদের কল্পনা করিতে পারি। ইহাতে ক্ষার ও বিবিধ ধাতব পদার্থের জ্ঞান জন্মে। পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত ঐ সমস্ত দ্রব্য বিদ্যমান ছিল। তৎপরে আর এক গ্রাম নিম্নে আসুন, আমরা আগ্নেয়গিরির উপপ্লব হইতে ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব-নির্ণয় করিব, এবং গলিত জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে ক্ষারদ্রব্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিব। তৎপরে আর এক গ্রাম নিম্নে অবতীর্ণ হইলে কেবল উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থকেই কল্পনা করিতে পারি। কারণ, গৈরিক পদার্থও আদৌ জান্তব পদার্থ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জান্তব পদার্থের পূর্ব্বে

কেবল উদ্ভিজ্জ জগৎকে কল্পনা করা যায়। উদ্ভিজ্জের পূর্ব্বে মৃত্তিকা, মৃত্তিকার পূর্ব্বে জল। উপর হইতে আনুপূর্ব্ব নিম্নে আসিলে সূর্য্যের এই প্রকার পরিবর্ত্তন ক্রমে বুঝিতে পারা যায়। নিম্ন হইতে উর্দ্ধ প্রক্রমের বিচার করিয়া দেখুন, পৃথিবীর চরম দশা অনায়াসে আমাদের বোধগম্য হইবে। অতএব আজি যে ভূমণ্ডলের কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন সুশীতল তুষার স্তরে পরিবৃত আছে, কোন স্থান জলরাশিতে প্লাবিত হইতেছে, কোথাও কোন স্থান সরস পল্লব পুষ্প ফলে হাসিতেছে, সেই ভূমণ্ডল এক দিন প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে। আজ সূর্য্য নক্ষত্রাদির আলোক না পাইলে পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এক দিন এই পৃথিবী আবার উহাদিগকে আলোক বিকীর্ণ করিবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ধনের গরিমা।

ধনবান তুমি তাই অভিমানী
গরবে বেড়াও ফুলায়ে দেহ,
ভেবে দেখ মনে তোমার সমান
আছে কি জগতে নির্ব্বোধ কেহ ?
হয়েছ হে ধনী ঘটনার বশে—
এমন ঘটনা কতই ঘটে,
গরিমার কোন সার হেতু থাকে
সাজে ও গরব তবুও বটে ;
ধন আছে বলে আঁধারা হইয়ে
গরম হইয়ে যাও রে চলে,
গরিবের ছেলে, বিনীত জনে রে
অসমান ভেবে চাও না ভুলে।
মনে ভেবে দেখ প্রমাদ ছাড়িয়ে
অহঙ্কার করা কেমন সাজে ?—
স্বাস্থ্য বিনিময়ে ভোগ কর ধন
এ মতে সমান বিচার রাজে ;

যদি বল ভাই স্বাস্থ্য খালি ছাই
ধনের গোলাম স্বাস্থ্যই রবে—
ঈশ্বরে নির্ব্বোধ! বল পক্ষপাতী,
কাহারও কড়ি সঙ্গেতে যাবে?
স্বাস্থ্য বরং ভাল, স্বাস্থ্য শরীরের
যতনে জগতে রতনে পাও,
কমাতে বাড়াতে শরীর পার কি?—
দেখিব একটু উন্নত হও।
তুমি বড় লোক চড় বড় জুড়ী
নিতি নিতি নব পোষাক পর,
যার গাড়ি নাই ছাপোষা ছাবাল
তাহাকে আদর কর না বড়;
মুকুরে মুখের চেহারা হেরিয়ে
বুক ফুলাইয়ে বাগানে যাও,
সাবানে মুখের চামড়া ঘষিয়ে
ভাব পাছে রোদে মলিন হও;
খুসী হও মনে ধনীর আলাপে
তাদেরি বাড়ীতে চরণ সরে,
গরিব স্বজন রোগে যদি মরে
কত ভাণ কর পদ না পড়ে।
মন কর নীচু ওহে ধনবান
দেখ রে মানুষে সমান চোখে,
মিষ্ট সম্ভাষণে, বিনীত আচারে
সৌজন্যে, মানুষে প্রসন্ন থাকে;
মনে কর নাই কদাচই ভাই
গরিব হওয়া দোষের কথা
ধনহীন জনে অভিশাপ ভোগে
তাহাদের ঘৃণা করাই প্রথা;
তোমার আছে ত কুমারী কুমার
তুমি ত ছিলে হে বাপের ছেলে,

বল দেখি বেশী পিতার বাৎসল্য
পড়ে কি না ছেলে গরিব হলে?
তুমি ধনপতি, চুপী চুপী বলি
তোমারি বিপক্ষ হয়েছে ধনে,
কে জানে কেমনে কেমন উপায়ে
হল এত ধন সন্দেহ ভণে।
আর হয়ো নাক অভিমানে ভারী
জান নাক ওরে ভয়াল কথা?—
উচু মাথা হেঁট হবে সেই খানে
বিনীত দরিদ্র বাড়িবে তথা!
কর রে প্রার্থনা বিনীত হইতে
অনুভূতি যেন গরিবে থাকে;
গরিমা মায়াবী যেন না পশিয়ে
ধনের ধোঁয়াতে ঢাকিয়ে রাখে।

মনুসংহিতা।

সপ্তম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ॥ ৩২॥

রাজা নিজ রাজ্যে ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিবেন, শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণদণ্ড হইবেন, সুহৃৎগণের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন, ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলেও ক্ষমা করিবেন।

এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥ ৩৩॥

যে রাজা এইরূপে কার্য্য করেন, তিনি যদি শিলোঞ্ছজীবী হন অর্থাৎ তাঁহার যদি কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার যশ জলে নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর ন্যায় লোকে বিস্তৃত হয়।

অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশোলোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি॥ ৩৪॥

যে রাজা ইহার বিপরীত ব্যবহার করেন, সেই অজিতেন্দ্রিয় রাজার যশ জলে নিক্ষিপ্ত ঘৃতবিন্দুর ন্যায় সঙ্কুচিত হয়।

স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥ ৩৫ ॥

যে সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমবাসিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের রক্ষার্থ বিধাতা রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। টীকাকার বলেন, যাহারা স্বধর্ম্মরক্ষায় অভিনিবিষ্ট না হয়, রাজা যদি তাহাদিগকে না রক্ষা করেন, তাহাতে রাজার প্রত্যবায় হয় না।

তেন যদ্ যৎ সভৃত্যেন কর্ত্তব্যং রক্ষতা প্রজাঃ।
তত্তদ্বোঽহং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৩৬ ॥

প্রজার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত অমাত্য সহিত রাজার যে যে কর্ত্তব্য, তৎসমুদায় যথাক্রমে আপনাদিগকে বলিব।

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে॥ ৩৭ ॥

রাজা প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ঋক্, যজু, ও সাম এই ত্রিবেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রবেদী ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন।

বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে॥ ৩৮ ॥

রাজা বেদজ্ঞ বাহ্যান্তর-শৌচ-সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য সেবা করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সভাস্থলে আনিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। যে রাজা বৃদ্ধের মতানুসারে কার্য্য করেন, রাক্ষসেরাও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসিত হন।

তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৩৯ ॥

রাজা স্বভাবতঃ বিনীত হইলেও সেই সকল বৃদ্ধের নিকটে বিনয় অভ্যাস করিবেন। যে রাজা বিনীত হন, তাঁহার কখন বিনাশ হয় না।

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥ ৪০ ॥

করি-তুরগ-কোষাদি-সম্পন্ন হইয়াও অনেক রাজা অবিনয় হেতু বিষ্ট

হইয়াছেন, আবার অনেক রাজা বনস্থ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্ব-সম্পদ-শূন্য হইয়াও কেবল বিনয় হেতু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসোযবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেব চ॥ ৪১॥

বেণ, নহুষ, সুদাস, যবন, সুমুখ আর নিমি ইহাঁরা অবিনয় হেতু বিনষ্ট হইয়াছেন।

পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥ ৪২॥

পৃথু ও মনু বিনয় হেতু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, কুবের বিনয় হেতু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, এবং বিশ্বামিত্র জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল এক বিনয় হেতু ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥ ৪৩॥

যাঁহারা ত্রিবেদ জানেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজা ত্রিবেদ অভ্যাস করিবেন। দণ্ডনীতি, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা তত্তৎশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে শিক্ষা করিবেন, এবং অর্থাগমের উপায়ভূত কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবহার তদভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অভ্যাস করিবেন।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়োহি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥ ৪৪॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহাতে বিষয়ে আসক্ত না হয়, রাজা তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। যে হেতু যে রাজা জিতেন্দ্রিয় হন, তিনি প্রজাদিগকে স্ববশে রাখিতে পারেন।

দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৫॥

রাজা যত্নপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণস্বরূপ দশ প্রকার ইচ্ছাজাত ব্যসন এবং আট প্রকার ক্রোধজাত ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন। কারণ, ব্যসনের পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।

রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে যে যে অনিষ্ট ঘটে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষাত্মনৈব তু॥ ৪৬॥

রাজা কামজনিত ব্যসনে আসক্ত হইলে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ উভয় বিনষ্ট হয়, আর ক্রোধজাত ব্যসনে প্রসক্ত হইলে প্রজার কোপ জন্মে, তন্নিবন্ধন তাঁহার শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সেই ব্যসনগুলি কি তাহা বলা হইতেছে।

মৃগয়াক্ষোদিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজোদশকোগণঃ॥ ৪৭॥

মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরদোষকথন, সদা স্ত্রীগণ সহবাস, নৃত্যগীতবাদ্য, বৃথাভ্রমণ, এই দশটী স্বেচ্ছাজাত ব্যসন। এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইলে সর্ব্ব কার্য্য বিনষ্ট হয়।

পৈশুন্যং সাহসদ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোপি গণোষ্টকঃ॥ ৪৮॥

পৈশুন্য (যাহার যে দোষ অপরে জানে না তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া) সাহস (সাধু ব্যক্তির বন্ধনাদি দ্বারা নিগ্রহ) দ্রোহ (গুপ্তবধ) ঈর্ষ্যা (অক্ষমা) অসূয়া (অন্যগুণের দ্বেষ) অর্থদূষণ—এটী দুই প্রকারে হয়; এক, অর্থের অপহরণ; দ্বিতীয়, দেয় অর্থ না দেওয়া; বাক্ পারুষ্য (গালি দেওয়া) এবং দণ্ডদ্বারা তাড়নাদি এই আটটী ক্রোধজাত ব্যসন।

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্ব্বে কবয়োবিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ॥ ৪৯॥

উপরে যে আঠার প্রকার ব্যসনের কথা বলা হইল, পণ্ডিতেরা জানেন লোভ তাহার মূল। অর্থলোভ ও অন্য প্রকার লোভ হইতে উহারা জন্ম গ্রহণ করে। অতএব লোভের জয় বিষয়ে যত্নবান্ হইবে।

পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমং।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে॥ ৫০॥

উপরে যে দশ প্রকার কামজ ব্যসনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার মধ্যে সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীগণের প্রতি অধিকতর আসক্তি এবং মৃগয়া, এই চারিটী অধিকতর অনিষ্টের কারণ।

দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতৎ ত্রিকং সদা॥ ৫১॥

ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য আর অর্থদূষণ, এই তিনটী অধিকতর কষ্টদায়ক।

সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাৎ ব্যসনমাত্মবান্॥ ৫২॥

যে চারিটী কামজ ব্যসন ও তিনটী ক্রোধজ ব্যসনের দোষ বিশেষরূপে কথিত হইল, তাহা সকল রাজ্যেই বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুলি অধিকতর কষ্টকর বলিয়া জিতেন্দ্রিয় রাজা জানিবেন।

ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোধোব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ॥ ৫৩॥

ব্যসনাসক্ত হইলে চৈতন্য থাকে না, মৃত্যু হইলেও চৈতন্য থাকে না। এ অংশে উভয় তুল্য হইলেও ব্যসন মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। কারণ, ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি নরকে গমন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ব্যসনাসক্ত না হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে স্বর্গগামী হইয়া থাকে।

ব্যসনাশক্তির নিন্দা করা হইল। এক্ষণে যেরূপ লোককে রাজা মন্ত্রী করিবেন, তদ্বিষয় কথিত হইতেছে।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥ ৫৪॥

পিতৃ পিতামহাদিক্রমে রাজসেবক, শস্ত্রজ্ঞ, বিক্রমশালী, শস্ত্রবেত্তা, বিশুদ্ধ কুলজাত এরূপ সাত অথবা আট জনকে রাজা মন্ত্রী করিবেন।

মন্ত্রির আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং॥ ৫৫॥

যে কার্য্য অনায়াসসাধ্য তাহাও একের সম্পাদন করা কঠিন; বিশেষতঃ রাজ্য মহোদয় অর্থাৎ ইহাতে লাভালাভাদি নানাকাণ্ড ইহার রক্ষা আছে, সহজ সাধ্য নয়। রাজা অসহায় হইয়া কিরূপে ইহার রক্ষা করিবেন; অতএব রাজার সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবার একান্ত আবশ্যকতা আছে।

তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহং।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥ ৫৬॥

রাজা সেই সকল মন্ত্রির সহিত সামান্য সন্ধিবিগ্রহাদি; হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি এবং ধনাগার এবং নগর ও রাষ্ট্র, ধান্য হিরণ্যাদির উৎপত্তি

স্থান; আত্ম রক্ষা ও রাজ্য রক্ষা এবং লব্ধ ধনের সৎপাত্রে দানাদি চিন্তা করিবেন।

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥ ৫৭॥

রাজা সেই সকল মন্ত্রির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা সমুদায়কে একত্র করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপনার হিতের অনুষ্ঠান করিবেন।

সর্ব্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষড়্গুণ্যসংযুতং॥ ৫৮॥

ঐ সকল মন্ত্রির মধ্যে ধার্ম্মিকত্বাদি গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ এমন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সহিত বক্ষ্যমাণ ষড়গুণযুক্ত সন্ধি বিগ্রহাদির মন্ত্রণা করিবেন।

নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্ব্বকার্য্যাণি নিক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥ ৫৯॥

রাজা সেই ব্রাহ্মণের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবেন।

রাজা কিরূপ কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশিত হইতেছে।

অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্॥ ৬০॥

রাজা বিশুদ্ধাশয়, বুদ্ধিমান, ধনার্জ্জনক্ষম এবং ধর্ম্মাদি বিষয় পরীক্ষিত এইরূপ কতকগুলি কর্ম্মচারীকে নিয়োজিত করিবেন।

নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্॥ ৬১॥

রাজার যতগুলি লোক দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, ততগুলি আলস্যশূন্য, কার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মজ্ঞ লোক নিয়োজিত করিবেন।

যে কার্য্যে যেরূপ লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাহার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে॥ ৬২॥

ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে যাহারা বিক্রমশালী, চতুর, সৎকুলজাত আর অর্থলোভশূন্য, তাহাদিগকে ধনের উৎপত্তি স্থান যে আকরাদি তাহাতে নিয়োজিত করিবেন। আর যাহারা ভীরুস্বভাব, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে নিযুক্ত করিবেন। কারণ, অন্তঃপুরে সাহসিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে রাজার শরীরাদি বিষয়ে অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টাজ্ঞং শুচিন্দক্ষং কুলোদ্গতং ॥ ৬৩ ॥

দৃষ্টাদৃষ্টার্থ যাবতীয় শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, মুখভঙ্গী করাস্ফালন প্রভৃতি চেষ্টা দর্শন করিয়া অপরের হৃদয়গত ভাব বোধে সমর্থ, অর্থাদি লোভবিহীন, কার্য্যদক্ষ, সৎকুলজাত দেখিয়া রাজা দূত নিয়োজিত করিবেন।

অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্ব্বাগ্মী দূতোরাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৬৪ ॥

সকল লোকের প্রতিই অনুরাগবিশিষ্ট, অর্থাদিলোভ হীন, স্মরণশক্তি-সম্পন্ন, কার্য্যচতুর, দেশকালজ্ঞ, সুশ্রী, নির্ভীক; বাক্‌পটু, এই প্রকার লোকই রাজার দৌত্য কার্য্যে প্রশস্ত। উল্লিখিত বিশেষণ গুলির সবিশেষ সার্থকতা আছে। যথা—সকল লোকের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলাতে বিপক্ষ রাজাও তাহার প্রতি বিরূপ হইতে পারেন না। অর্থাদিলোভহীন এ বিশেষণ দিবার তাৎপর্য্য এই, বিপক্ষ রাজার প্রদত্ত অর্থাদি লোভে বিমুগ্ধ হইয়া নিজ প্রভুর কার্য্য ধ্বংস না করে। কার্য্যচতুর, এ বিশেষণের সার্থকতা এই আলস্য করিয়া কার্য্য নষ্ট না করে। স্মরণশক্তিসম্পন্ন বলাতে নিজ প্রভুর উপদিষ্ট উপদেশ বিস্মৃত না হয়। দেশকালজ্ঞ, এ বিশেষণ দিবার অভিপ্রায় এই যে দেশ কাল বিবেচনা করিয়া নিজ প্রভুর উপদেশের অধিক কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারে। সুশ্রী, এ বিশেষণ দেওয়াতে বিপক্ষ রাজাও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতে পারেন। নির্ভীকতা ও বাক্‌পটুতা দৌত্য কার্য্যে একান্ত আবশ্যক।

অমাত্যে দণ্ডআয়ত্তোদণ্ডে বৈনয়কী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৬৫ ॥

এখানে দণ্ড শব্দে হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি বুঝাইবে। ঐ সকল অমাত্যগণের আয়ত্ত, অর্থাৎ তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারেই ঐ সকলের ক্রিয়া হইয়া থাকে। শাসন কার্য্য দণ্ডের অধীন, ধনাগার এবং রাষ্ট্র রাজার

অধীন অর্থাৎ স্বয়ং রাজা এই দুটী বিষয়ের সুবিধানচিন্তা করিবেন। সন্ধিবিগ্রহ দূতের আয়ত্ত। অতএব ভাল লোককে দূত করা কর্ত্তব্য।

দূতএব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন বা ন বা ॥ ৬৬ ॥

পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের একতা সম্পাদন দূতই করিয়া থাকে। আবার একতা সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভেদ সম্পাদনে দূতই সমর্থ; দূত পররাষ্ট্রে এমন কার্য্য করে, যদ্দারা একতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পরস্পর ভেদ সাধিত হয়।

সন্ধি বিগ্রহ যে দূতের আয়ত্ত, ইহা বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে দূতের অপর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইতেছে।

সবিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢ়েঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
আকারমিঙ্গিতঞ্চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতং ॥ ৬৭ ॥

দূত বিপক্ষ রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টা অবগত হইবে, আর রাজার যে সকল ভৃত্য ক্রুদ্ধ লুব্ধ ও অবমানিত, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষ রাজা কিরূপ ব্যবহার করেন, দূত তাহাও জানিবে।

বুদ্ধা চ সর্ব্বং তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতং।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৬৮ ॥

রাজা দূত দ্বারা বিপক্ষ রাজার অভিপ্রেত অবগত হইয়া এরূপ যত্ন করিবেন যে, বিপক্ষ রাজা আপনার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারেন।

রাজার যেরূপ দেশে বাস করা কর্ত্তব্য,তাহা নির্দ্দেশিত হইতেছে।

জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলং।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যন্দেশমাবসেৎ ॥ ৬৯ ॥

যে দেশ সর্ব্বশস্যসম্পন্ন, ধার্ম্মিকবহুল, রোগাদি-উপদ্রবহীন, ফল পুষ্প তরুলতাদি দ্বারা মনোহর,আজ্ঞানুবর্ত্তি প্রধান লোক; কৃষিবাণিজ্যাদি সুলভ; রাজা এরূপ দেশে বাস করিবেন।

আলোকে আঁধার।

(১)

আঁধার জলদ ভ্রমিছে গগনে,
প্রকৃতির মুখ আঁধারপ্রায়;

যেন না হেরিয়ে দিবাকর ধনে
বিষাদের ছাই মেখেছে গায়।

(২)

থেকে থেকে থেকে পড়িছে জল,
সকলি সজল—পাদপ কানন—
কভু নভ হতে জীমূতের দল
ক্ষেপিছে অশনি ধাঁধিয়ে নয়ন।

(৩)

উতলা পবন বহিছে সঘন,
যেন মাতোয়ারা হারাইয়ে জ্ঞান;
নীরব বিহঙ্গ ছাড়িয়ে কূজন
পশেছে কুলায়ে আকুলিতপ্রাণ।

(৪)

এই এতক্ষণ নীল নভোভালে,
জগত-আনন্দ দীপ্ত দিবাকর;
বিতরি রজত কিরণের জালে
হাসাইতেছিল বিশ্ব চরাচর।—

(৫)

সুমন্দ পবন কুসুমের সনে,
খেলিতে আছিল সোহাগভরে
বিহঙ্গমকুল প্রফুল্লিত মনে
গাইছিল গান সুমধুর স্বরে।—

(৬)

অন্তর্হিত হায়, হইল এখন,
এই বিশ্ব-শোভা চকিত প্রায়
আলেখ্য নূতন দিল দরশন
অন্য ভাব পুনঃ দেখা যায় হায়।

(৭)

এই বিশ্যদৃশ্য দেখিয়া নয়নে,
ভাবের পাথারে উঠিল ঢেউ;

বিষম সমস্যা সমুদিত মনে
কে বুঝাবে হায় আছে কি কেউ?

(৮)

দুর্ভেদ্য নিয়ম কে বুঝিতে পারে,
কে বুঝিবে হায়, বিধির কল;
শকতি যাহার অনন্ত সংসারে
ভেদিবে কি ক্ষুদ্র মানব বল?

(৯)

কালি যে তপন গগনের ভালে,
ছিল শোভমান উজল কিরণে—
আজি তা আঁধার জলদের জালে
ঢেকেছে আমরি! সেমুখ তপনে।

(১০)

কালি যে প্রসূন পবনের করে,
দিয়েছিল নিজ পরিমল ধন;
আজি সে প্রসূন প্রভঞ্জন ভরে
পতিত ধূলায় মলিনবদন।

(১১)

কালি যে বিহঙ্গ—সুমধুর তানে,
মাতাইয়াছিল জগতের জন;
আজি মহাত্রাস সে বিহঙ্গ প্রাণে
পশিয়াছে মরি! বিধি নিয়োজন।

(১২)

মানব অদৃষ্ট স্বভাবের সনে,
দৃঢ় বাঁধে বাঁধা হেন মনে লয়;
সৌভাগ্য তপন আজি যে নয়নে
কালি অন্ধকার, বিপ্লব দুর্জ্জয়।

শ্রীপ্রাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাংখ্যকারের মতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। প্রতিপক্ষ বলেন, ঈশ্বর কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা। অতএব ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে। তৎখণ্ডনার্থ সাংখ্যকার যে যে বাধক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,তদতিরিক্ত আর একটী বাধক যুক্তির প্রমাণ-রূপে উল্লেখ করিতেছেন। সে যুক্তিটী এই:—

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬ ॥ সূ ॥

কিঞ্চ রাগং বিনা নাধিষ্ঠাতৃত্বং সিধ্যতি প্রবৃত্তৌ রাগস্য প্রতিনিয়তকারণ-ত্বাদিত্যর্থঃ। উপকারেষ্টার্থসিদ্ধিঃ রাগকৃৎকর্ম্মেত্যুচ্যতে ইতি ন পৌনরুক্ত্যং ॥ ভা ॥

কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা নিয়ত কারণ। ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। কার্য্যপ্রবৃত্তি ব্যতিরেকে কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবে না। ঈশ্বর ইচ্ছাশূন্য। অতএব তাঁহার কর্ম্মের অধিষ্ঠানকর্ত্তা হইবার সম্ভাবনা কি?

যদি বল ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে, তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন:—

তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥ সূ ॥

রাগযোগেঽপি স্বীক্রিয়মাণে স নিত্যমুক্তো ন স্যাৎ ততশ্চ তে সিদ্ধান্ত-হানিরিত্যর্থঃ।

ঈশ্বরে যদি ইচ্ছা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যমুক্তত্ব ব্যাঘাত জন্মে। তুমি ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাক। অত-এব তোমার সেই সিদ্ধান্তের হানি হয়।

কিঞ্চ প্রকৃতিং প্রত্যৈশ্বর্য্যং প্রবৃত্তিপরিণামভূতেচ্ছাদিনা ন সম্ভবতি। অন্যোন্যাশ্রয়াৎ। নিত্যজ্ঞানাদিকং চ প্রকৃতৌ ন যুক্তং শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধনানাত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ এতাবানপ্যশক্যত্বং। তথাচ। ঐশ্বর্য্যং কিং প্রধানশক্তিযোগেনাস্মদভিমতানামিচ্ছাদীনাং সাক্ষাদেব চেতনসম্বন্ধাৎ। কিন্তু বায়স্কান্তমণিবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বাদিতি ॥ ভা ॥

আর এক কথা এই, ইচ্ছা ত প্রকৃতির ধর্ম্ম, সেই ইচ্ছার সংযোগ তাহে ঈশ্বরে সম্বন্ধ হয়, অথবা যেমন অয়স্কান্তমণির পদার্থান্তরে প্রতিবিম্ব পড়ে,

সেইরূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম যে ইচ্ছা তাহা ঈশ্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম পক্ষের খণ্ডন করা হইতেছে।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥ সূ ॥

প্রধানশক্তেরিচ্ছাদেঃ পুরুষে যোগাৎ পুরুষস্যাপি ধর্ম্মসঙ্গাপত্তিঃ। তথা চ ন যৎ তত্র পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

তুমি ঈশ্বরকে নিঃসঙ্গ বলিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্ম ইচ্ছার যদি তাঁহাতে যোগ হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিঃসঙ্গতার ব্যাঘাত হয়।

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং ॥ ৯ ॥ সূ ॥

অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ চেচ্চেতনৈশ্বর্য্যং তর্হি সর্ব্বেষামেব তত্তৎসর্গেষু ভোক্তৄণাং পুংসামবিশেষেণৈশ্বর্য্যমস্মদভিপ্রেতমেব সিদ্ধম্। অখিলভোক্তৃসংযোগাদেব প্রধানেন মহদাদিসর্জ্জনাদিতি। ততশ্চৈক এবেশ্বর ইতি ভবৎসিদ্ধান্তহানিরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

অয়স্কান্তমণিরাগ সন্নিহিত পদার্থে যেমন সঞ্চারিত হয়, তেমনি প্রকৃতির ধর্ম্ম ইচ্ছা ঈশ্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে তোমার (প্রতিবাদির) অভিমত যে একেশ্বরবাদ তাহার ব্যাঘাত জন্মে। কারণ, আমার (সাংখ্যকারের) অভিপ্রেত বহু পুরুষে সেই ইচ্ছার প্রতিবিম্বিত হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে ঈশ্বরের বহুত্ব ঘটিয়া উঠিল।

ঈশ্বর সিদ্ধি বাধক অন্য অন্য যুক্তিও প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥ সূ ॥

তৎসিদ্ধির্নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তীত্যনুমানশব্দাবেব প্রমাণে বক্তব্যে তে চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

নিত্য যে এক ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ নাই। কারণ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল, অনুমান ও শব্দ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয়। তাহাও হইতে পারে না, পরবর্ত্তী দুটী সূত্র দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা হইতেছে।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং ॥ ১১ ॥ সূ ॥

সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ। অভাবোঽসিদ্ধিঃ। তথা চ মহদাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদিত্যাদ্যনুমানেষ্বপ্রয়োজকত্বেন ব্যাপ্ত্যসিদ্ধ্যা নেশ্বরেঽনুমানমিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে অনুমান হয় না। যেমন পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করা যায়। এ স্থলে ধূমকে বহ্নির ব্যাপ্য বলিয়া যেরূপ

জ্ঞান জন্মিতেছে, পৃথিবী কার্য্য; অতএব ইহার একজন কর্ত্তা আছেন, এ অনুমানে সেরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে না।

যদি বল ঈশ্বরবিষয়ক শ্রুতি আছে। শ্রুতি শব্দময়, এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হইবে। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেনঃ—

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ১২ ॥ সূ ॥

প্রপঞ্চে প্রধানকার্য্যত্বস্যৈব শ্রুতিরস্তি ন চেতনকারণে। যথা।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ॥

তদ্ধীদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়েতেত্যাদিরিত্যর্থঃ। যা চ তদৈক্ষত বহু স্যামিত্যাদিশ্চেতনকারণতাশ্রুতিঃ সা সর্গাদাবুৎপন্নস্য মহত্তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জন্যজ্ঞানপরা। কিংবা বহুভবনানুরোধাৎ প্রধান এব কূলং পিপতিষতীতিবদগৌণী। অন্যথা সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেত্যাদিশ্রুত্যুক্তাপরিণামিত্বস্য পুরুষেঽনুপপত্তেরিতি। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্যার্থমীশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক্ষপ্রতিপাদনার্থং চ প্রৌঢ়িবাদমাত্রমিতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতং। অন্যথা জীবব্যাবৃত্তস্যেশ্বরনিত্যত্বাদে গৌণত্বকল্পনাগৌরবং। ঔপাধিকানাং নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদীনাং মহদাদিপরিণামানাং চাঙ্গীকারেণ কৌটস্থ্যাদ্যুপপত্তেরিত্যাদিকং ব্রহ্মমীমাংসায়াং দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ভা ॥

প্রকৃতি সৃষ্টি করেন,এইরূপই শ্রুতি আছে,ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, এরূপ শ্রুতি নাই। প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে যে শ্রুতি আছে তাহার অর্থ এই—প্রকৃতির জন্ম নাই। সে এক। তাহার বর্ণ লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ। সে বহু প্রজা সৃজন করে। সেই প্রজাগণের রূপ এক প্রকার। তবে যে ঈশ্বর বোধক কোন কোন শ্রুতি আছে,সাংখ্যকারের মতে তাহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার।

ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সৃষ্ট মরীচি অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ আবার নানাপ্রকার সৃষ্টি করেন। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, বিধাতার সৃষ্ট পদার্থেরও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়ের সভাসদগণকে গিয়া দেখ, গাঁজা যেন একটা নূতন সৃষ্টিকার্য্য করিয়াছে। ত্রিভঙ্গের পারিষদগণ পৃথিবীতে জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু আকার প্রকার দেখিলে অন্য

স্তোকের ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয়। সকলে মুদ্রিত নয়ন, দেখিলে বোধ হয় যেন মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছে। সভাস্থলটী নিস্তব্ধ, কোন প্রকার শব্দ নাই, কেবল গাঁজার ধূমে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন। দিবা দ্বিপ্রহর হইলেও বোধ হইতেছে যেন ঘোর নিশীথ। এক জন গাঁজাখোর বক্তৃতার পর কথা আরম্ভ করিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল।—

বাবা ত্রিভঙ্গ! কেবল গাঁজাখেয়ে চক্ষু মুদে বুঁদ হয়ে বসে থাকলে হয় না। কাল রাত্রে মনে বড় একটা তর্ক উঠেছে। তার একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। যদি তোমার সভাতে তার মীমাংসা না হয়, কোন্ সভাতে হবার সম্ভাবনা নাই। বাবা তোমার সভ্যদের দানের গন্ধর্ব্ব সকল সভা জয় করেছে। অন্য অন্য সভা এমন সুশ্রী সভ্য কোথায় পাবে, এমন সভা সাজাবার সামগ্রীই বা কোথায় পাবে। দেখ হুঁকা কল্কে গুলি সভা কেমন আলো করে রয়েছে, সভাসদগণের শ্রীর ছটায় আবার সেই আলোকের বৃদ্ধি হয়েছে। এসব কথা এখন থাক, আমার তর্কটা সকলে মনোযোগসে শুন। তর্কটা কি জান, কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে একটা ভাবনা উঠলো। অনন্ত দেব ত মাথায় করে পৃথিবীটে ধরে আছেন। তাঁর মাথায় ভার লাগলে মাথা বদলান। তাহাতেই ক্ষিতি টল টল করে কেঁপে উঠে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তিনি যখন পাশের একটা মাথায় ভার রেখে মাথা বদলান, সেই সময়ে টাল সামলাতে না পেরে যদি পৃথিবী ফেলে দেন আমাদের কি উপায় হবে? তখন কি লোণা জল খেয়ে মরবো। এই সময় একটা আস্ত বেঁধে রাখলে হয় না? পৃথিবীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকে, এস আমরা এরূপ করে এক একটা ঘরবাড়ী বেঁধে রাখি। অনন্ত খুড়ো যদি দুষ্টতা করে পৃথিবীখান জলে ফেলে দেন, তখন আমাদের কিছু করতে পারবেন না।

আর এক জন গাঁজাখোর আর এক দিক হইতে বলিয়া উঠলো বাবা! বেশ পরামর্শ করেছ। আচ্ছা বাবা! চারবাসের কি মতলবটা ঠাউরেছ?

প্রথম গাঁজাখোর—কেন বাবা! তার ভাবনা কি? নোয়া যেমন প্রলয় কালে পশুপক্ষি প্রভৃতির এক এক জোড়া ও দ্রব্য সামগ্রীর বীজ লয়ে নৌকায় উঠেছিলেন, আমরাও তেমনি চাউল ডাইল তরিতরকারি প্রভৃতি নিয়া সেই ঘর বাড়ীতে গিয়া উঠবো। উঠানে চাউল ডাইল প্রভৃতি ছড়াইয়া দিব, বৃষ্টির জলে গাছ বাহির হবে, চাউল ডাইল প্রভৃতি ফলবে। অমনি গাছ হতে তুলেই হাঁড়িতে দেব, ভাত হবে আর খাব। কোন হাঙ্গাম থাকবে না।

খান রিক্ত কর যে শুকাও যে স্নান যে—কোন আশা থাকবে না। কাহার কাছে কিছু চাইতেও যেতে হবে না।

তৃতীয় গাঁজাখোর—রতন খুড়ো! বাবা বেশ মতলব করেছ। যাচঞ্চার পর লঘুতা আর নাই। যাচঞা কর্‌তে গেলে মান মর্য্যাদা থাকে না। অন্য কথা কি; যাচকের সঙ্গে কেহ ভাল করে আলাপও করে না। তাহার সহিত কথা কহিতে সকলে ভয় পায়। এক জন কবি রহস্য করে বলেছেনঃ—

তৃণাদপি লঘুস্তুল স্তুলতো যাচকোলঘুঃ।
বায়ুনা নীয়তে কেন কিঞ্চিৎ প্রার্থনশঙ্কয়া॥

তুল তৃণ অপেক্ষাও হাল্কি, আবার যাচক তুল অপেক্ষা হাল্কি। যাচক যদি এত হাল্কি, বায়ু তাহাকে উড়ায়ে লয়ে যায় না কেন? পাছে কিছু চায়, এই ভয়ে সে নিয়ে যায় না।

চতুর্থ গাঁজাখোর—বাবা! আমি তোমাদের কথোপকথন মন দিয়ে শুনছি, মনে বড় একটা সন্দেহ হয়েছে,ভাল জিজ্ঞাসা করি অনন্ত কে? উত্তর—তিনি ঈশ্বরের রূপান্তর বিশেষ। পুনরায় প্রশ্ন—তিনি যদি ঈশ্বর হলেন, তবে ত তিনি পৃথিবী তৈয়ের করে, বড় বিপাকে পড়েছেন। তাঁহাকে মাথায় করে সেই পৃথিবী ধরতে হোচ্চে। তাঁর আর পাশ ফেরবার যো নাই। একেই বলে আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারা। তিনি যদি পৃথিবী না কর্‌তেন, তাহা হইলে এ বিপাকে পড়তে হতো না। দিবা রাত্রি আহার নিদ্রা নাই, মাথায় একটা বোঝা করে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়ে থাকা, এ ত বড় যন্ত্রণা দেখতে পাই। ভাল ঈশ্বর কি এতই বোকা, ও এতই অক্ষম, তিনি পৃথিবী রক্ষার অন্য উপায় করতে না পেরে মহাভারতের উদ্দালকের জলনিরোধার্থ আইলে শয়ন করে থাকবার ন্যায় পৃথিবী ধরে রইলেন। আমি জানি তিনি এক জন পাকা কারিকর। তিনি কার্য্যকারণ বিধি এমন করে সৃষ্টি করেছেন যে তাঁকে আর তাতে হাত দিতে হয় না। ভাঙ্গা ফুটা সারিবার বা তালি দিবার প্রয়োজন হয় না। বলতে কি, তিনি পৃথিবীকে মাথায় করে ধরে আছেন, এ কথাটা আমার ভাল লাগলো না।

তৃতীয় গাঁজাখোর—ভাল লাগে নাই বলেই ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত খুড়ো বলেছেন, পৃথিবী নিজ শক্তিতে শূন্যে আছে। ইউরোপীয়েরা বলেন, সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তিতে বদ্ধ হয়ে আছে।

পঞ্চম গাঁজাখোর—বাবা! ও সব নানা মুনির নানা মত, ও ঢেঁকির কচ-

রুচিতে আমাদের কাজ কি? আপনার চরকায় আপনারা তেল দাও। আমাদের এখনকার ষ্টেট সেক্রেটরি খুড়ো বড় দয়ালু, তাঁর চক্ষুর লজ্জ টা বড় বেশী। তিনি মাঞ্চেষ্টরের বণিকদের অনুরোধে পড়ে তুলোর মাসুল তুলে দিচ্ছেন। এস এই সময়ে আমরা এক খান দরখাস্ত করি, গাঁজার মাসুলটা তুলে দিবার চেষ্টা পাই। তুলসী গাছের মত বাড়ী বাড়ী গাঁজার গাছ না হলে ত চলে না। বাজারে যাও, পয়সা ফেল, গাঁজা ওজন কর, তবে আন, এতে কি পোষায়। রতন খুড়ো! তুমি ভারতসভাকে এ বিষয়ে আমাদের একটু সাহায্য করতে বল। দেবাকাকা! তুমি সমাচারপত্রে এ বিষয়ের একটু আন্দোলন কর। আমি দরখাস্ত লিখতে চললাম। সভা ভঙ্গ হইল।

আমাদের দরখাস্ত করবার হেতুবাদটা মাঞ্চেষ্টরের বণিকদের অপেক্ষা অনেক টনকো। বণিকেরা বলেন, তুলার মাসুল উঠালে ভারতবাসী গরিব দুঃখিদের মঙ্গল হবে। তারা শস্তাদরে কাপড় পাবে। কথায় যেমন কাজে কিন্তু তেমন হয় না। মাসুল উঠলো বলে কৈ আমরা ত কাপড়ও বেশী শস্তা দেখতে পাই না। ওদিকে আমাদের দেশের তাঁতি ভায়ারা মারা গেলেন, দেশের লোকে দুই একটা কল করে যে কিছু পয়সা করবেন, সে চেষ্টাও নাই। কিন্তু গাঁজার মাসুল যদি উঠে যায়, ঘরে ঘরে যদি আমরা গাঁজার গাছ করতে পারি, তাহলে দেশের সব লোককে গাঁজাখোর করে তুলতে পারবো। তাতে ভারতের কত উপকার। ভারতবাসিদের পশু জন্ম ঘুচে মনুষ্য জন্ম হবে। এর পর ভারতের আর কি উপকার চাই।

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

ক্ষুদ্র একখণ্ড কাষ্ঠের উপর ভার সমেত বাঁকের অবস্থিতি।

একখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, দুই অঙ্গুলি স্থূল এবং আড়াই অঙ্গুলি প্রশস্ত। উহার এক প্রান্ত হইতে দেড় অঙ্গুলি দূরে দুই অঙ্গুলি লম্বা একটী খাঁচ কাটিবে। বিবেচনা কর (ক) প্রান্তের দেড় অঙ্গুলি দূরে দুই অঙ্গুলি দীর্ঘ খাঁচ কাটিলে অপর প্রান্তে অনুমান কর (খ) আড়াই অঙ্গুলি

অবশিষ্ট থাকে। খাঁচটী এক অঙ্গুলি গভীর করিবে এবং (খ) দিক হইতে (ক) প্রান্ত অভিমুখে ক্রমশঃ বিলক্ষণ গড়েন করিয়া আনিবে। পরে আড়াই হাত দীর্ঘ একটী বাঁশের বাকারি পাতলা করিয়া চাঁচিবে। এবং উহার পরি-সর খাঁচ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন করিয়া লইবে। পরিশেষে বাঁকের মত ঐ পরিষ্কৃত বাকারির প্রত্যেক অগ্রভাগে দেড়সের কিম্বা ছুই সের ভার রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ঝুলাইবে; অর্থাৎ এমন ভার ঝুলাইবে যদ্দারা ঐ বাকারি কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া পড়ে। কিন্তু কুত্রাপি অর্দ্ধ সেরের কম ভার ঝুলাইবে না। অতঃপর ঐ বাকারির ঠিক মধ্যস্থল কাষ্ঠখণ্ডের খাঁচের ভিতর পরাইয়া উহার (খ) প্রান্ত যষ্টির উপর কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া থাকিলে ভার সমেত কাষ্ঠখানি অনায়াসে শূন্যে অবস্থিতি করিবে। এই প্রক্রিয়াও ভসলির নিয়-মানুসারে সম্পাদিত হয়।

পাদ পূরণ।

কবিভূষণ! পূরণ কর—বাঁশরীর সুর যেন শুনিবারে পাই।

তোমার শ্লোকের প্রথম হইতে আনুপূর্ব্বিক চরণে চরণে পাঠ করিলে যেন—(১) যশোদার উক্তি হয়; আদ্যাক্ষরে যেন—(২) শ্রীদামের উক্তি হয়; এবং কোণাংশের অক্ষরে যেন,—(৩) শ্রীরাধিকার উক্তি হয়। এক কবিতায়, এই এক প্রশ্নে তিন জনের উক্তি প্রকাশ কর।

উত্তর।

১৪ ইন্দ্রের দুর্লভ দুগ্ধ নবনী সাঁপাই,
১৩ ভাসিছে বিষাদে রাণী, দুঃখিত নদাই।
১২ লোহিত কমল পত্র নয়ন সজল,
১১ হইয়া চঞ্চলা, মুছে অঞ্চলে কেবল।
১০ লাবণ্য দেহেতে নাই কাঁদি অহর্নিন,
৯ বেশ ভূষা নাই অঙ্গে, মুখ প্রভাহীন।
৮ নব-জল-ধরে দেখি কন নন্দরাণী,—
৭ ছেলে তুই, তোরে আর কি কব বাছনি!
৬ ঠেল না বারণ, যাদু! যেওনারে বনে;
৫ উঠনারে, প্রাণাধিক! কদম্বের ডালে।

৪ খাইবে, ৪ এ ক্ষীর সর হলে ক্ষুধাতুর,

৩ সহে না ৩ গোষ্ঠের ক্লেশ যেওনা সুদূর।

২ কাচে কাচে থেকে, বাছা! ২ চরাইবে গাই,

১ বাঁশরীর সুর যেন শুনিবারে পাই।

এস্থলে প্রথমতঃ, আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলে,—যশোদা বাৎসল্যভাবে ভোর; কৃষ্ণকে কিছুতেই গোচারণে পাঠাইতে অভিলাষ নাই, কিন্তু না পাঠাইলেও নয়; তজ্জন্য বিদায় করিবার সময় অনেক সাবধান করিয়া শেষ এই কথাটী বলিয়া দিলেন, তুমি দূর বনে যাইবে না। কেবল—

কাচে কাচে থেকে, বাছা চরাইবে গাই,

বাঁশরীর সুর যেন শুনিবারে পাই।

আদ্যাক্ষরে পাঠ করিলে,—শ্রীদামের সকাল সকাল নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; ওদিকে নন্দের গৃহে মহাধুম লাগিয়াছে, শ্যামলী ধবলী হম্বা রব করিতেছে; কৃষ্ণ পীতধড়া পরিয়াছেন, চূড়াটী বাঁধিয়াছেন, আর বাঁশীটী লইয়া এক এক বার বাজাইতেছেন; মুরলি রবে শ্রীদামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, নিকটে সুদামাদি অন্যান্য রাখালও নিদ্রিত। তখন তিনি ডাকিতেছেন—

বাঁকা সখা উঠেছেন, বেলা হলো ভাই;

বাঁশরীর সুর যেন শুনিবারে পাই।

কোণাংশে পাঠ করিলে,—শ্রীরাধিকা সাংসারিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, কিঞ্চিৎ যদি অন্যমনস্ক হইলেন; কর্ণে আর কিছুই শুনিতে পান না,—সর্ব্বদাই কেবল বংশীরব; তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, গৃহকর্ম্ম করিতে দেয় না। তজ্জন্য শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

বাঁচে না এ প্রাণ, আঁখি মুদিলে সদাই,

বাঁশরীর সুর যেন শুনিবারে পাই।

——:০:——

কল্পদ্রুম।

জগতের আদিম মানব-জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে জগতের আদিম মানবজাতির অনুসন্ধান-সংকল্পে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল পৃথক পৃথক রেখাঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছি। এবং উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহের আভ্যন্তরিক ভাব ও যুক্তির সারবত্তা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পরস্পর কত পার্থক্য, তাহাও সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীতলে কোন্ জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কোন্ কোন্ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই বা তাহার অনুকৃতি বা পরবর্ত্তী, এই দুটী জটিল তত্ত্বের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে জগতের আদিম মানবজাতি সহজেই আমাদিগের যুক্তিপথে আসিয়া উদিত হইবেন, তজ্জন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না।

এতদ্দেশে ব্রহ্মার বেদ বলিয়া একটী প্রাচীন প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, এবং আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে ভগবান্ কমলযোনি আর্য্যবংশের আদি পুরুষ, এবং তাঁহারই বাক্‌যন্ত্র হইতে সনাতন বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে বেদের মর্ম্মার্থ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করাই বিধেয়,—কারণ বেদ বলিলেই অনেকে মনে করিতে পারেন যে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বেদও কোন প্রকার লিখিত পুস্তক কি গ্রন্থ বিশেষ; কিন্তু কাল সহকারে উহা গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইলেও উহা আদিম অবস্থায় লিখিত কোন পুস্তক কি গ্রন্থাদি নহে। আদৌ উহা মানব জাতির বাক্‌যন্ত্রের বিষয়ীভূত শব্দার্থ প্রতিপাদক ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-প্রবর্ত্তক উপদেশ সমষ্টি। এই বেদের অপর নাম শ্রুতি,—যেহেতু উহার উৎপত্তি হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরা বাচনিক উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। এই শ্রুত্যভিধানই বেদের প্রাচীনত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শব্দের নিত্যতা প্রযুক্ত বেদের নিত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক,মানব জাতির শব্দোচ্চারণ শক্তি যেরূপ ঈশ্বর প্রদত্ত, শব্দার্থ বুৎপাদক অলিখিত বেদও তদ্রূপ ঐশিক শক্তির প্রতিপাদ্য। কিন্তু লিপি-কৌশল পরমেশ-দত্ত সম্পত্তি নহে,—উহা কালক্রমে মানবজাতির বুদ্ধি কৌশলে আবিষ্কৃত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন মনুষ্যেরা শব্দোচ্চারণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে লিপি-কৌশল অভ্যাস করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যকৃত যত কিছু শাস্ত্র]ও গ্রন্থাদি দৃষ্ট হয়, সে সমস্তই লিপি-কৌশলের আবিষ্কারের পরে রচিত হইয়াছে। কারণ, মনুষ্যেরা লিপি সাহায্য ব্যতিরেকে মনে মনে কোন গ্রন্থ কল্পনা করিয়া বাচনিক প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ নহেন,—বরং স্মৃতিভ্রংশ জন্য পুনঃ পুনঃ রূপান্তর হইতে থাকে। এই সকল কারণে সর্ব্বাদৌ আবিষ্কৃত অলিখিত বেদসকল অলৌকিক শক্তির পরিচায়করূপে শ্রুতি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল। পরে যখন বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি সহকারে আর্য্যদিগের শাস্ত্র চর্চ্চার আধিক্য হইয়া উঠিল, এবং সকলি মানব ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রোৎসাহিত হইলেন, তখনি তাঁহাদের কোন প্রকার স্মারক-চিহ্নের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল; তাঁহারা দেখিলেন স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাস্ত্র সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা অতীব দুষ্কর ব্যাপার। অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির অনায়ত্ততা নিবন্ধন উপাদেয় শাস্ত্র সকল দিন দিন বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তজ্জন্য তাঁহারা ধীশক্তি প্রভাবে লিপি-কৌশলের আবিষ্কার করিলেন। তদনন্তর পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিবাক্য সকল লিখিত শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু উহার আদিম শ্রুতাভিধান বিলুপ্ত হইল না। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে কি পুস্তকাদিতে কোন প্রকার শ্রুতিবাক্যের নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ অলিখিত শ্রুতিবাক্যসকল মানব জাতির আদিম সম্পত্তি এবং আদিম মানব-জাতি মধ্যেই উহা সর্ব্বতোভাবে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। অনার্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্তই লিখিত পুস্তকাকারে উপলক্ষিত হয়। মহাত্মা মূসা ঐ শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা,—ইহার প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইতে হয়; মূসা কখন ঈশ্বরের আদেশ বাক্য সকল লিখিয়া লইতেছেন, কখন তাঁহার উপাস্য দেবতার নিকট হইতে লিখিত পুস্তক ও প্রস্তর ফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন; এই প্রকার কৌতুকাবহ বিস্তর বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোরেব পর্ব্বত মূসার প্রধান পীঠস্থান; এই স্থানেই ঈশ্বর মূসাকে

বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং মুসা তৎসমুদায় লিখিয়া লইয়াছিলেন:—

"And moses wrote all the words of the
Lord, and rose up early in the morning,
And builded an altar under the hill,
And twelve hillars according to the twelve
tribes of Israel." Exodus.

Chap. XXIV Lesson 4.

পাঠক! মুসা ঈশ্বরের বাক্যসকল লিখিয়া লইলেন, ভালই—মুসার জীবিতকালে মানব সমাজে লিখন পঠন সম্যক প্রচলিত হইয়াছিল, সুতরাং ঈশ্বরের আদেশ বাক্য তিনি যে লিখিয়া লইবেন,তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ঈশ্বর যে নিজে লিখিতে পারেন,ইহা ত আমরা কখন শুনি নাই। মুসার উপাস্য দেবতা সাকার?—না নিরাকার? যদি বাস্তবিক তিনি নিরবয়ব দেবতা হন, তাহা হইলে লিখন পঠন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর বোধ হয় না। কিন্তু সাকার দেবতা হইলে তাঁহার পরম ভক্ত মুসাকে শত সহস্র পুস্তক লিখিয়া দিতে পারেন। আমরা মুসার পুস্তকে ঈশ্বরের বিস্তর লেখা পড়ার পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি।—

"And the tables were the works of god,
And the writing was the writing of god.
Graven upon the tables." Exodus.

Chap—XXXI
Lesson 16

পাঠক! পৃথীতলে যদি লিখিত এবং অলিখিত উভয়বিধ শাস্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ শাস্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে? আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তর্ক করিতেছি না,—সে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা শক্তির পরিচালন করিতে পারেন, তিনি কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে অলিখিত বাক্যোপদেশই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী; অতএব অনার্য্যজাতীয় লিখিত ধর্ম্মপুস্তক অপেক্ষা আর্য্যদিগের অলিখিত শ্রুতিবাক্য যে অধিকতর প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অলিখিত

শ্রুতি বাক্য হইতেই লিপি-কৌশল ও লিখিত শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে মানব-জাতির আদি পুরুষ, যাঁহাদিগের দ্বারা লিপিপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই,—(১) শুদ্ধ কতকগুলি (শ্রুতি) বাক্যোপদেশ মাত্র তাঁহাদের উপাস্য সম্পত্তি ছিল। কিন্তু পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মূসা ও তৎসাময়িক মনুষ্যেরা লিখন পঠন সম্বন্ধে সেরূপ অজ্ঞ ছিলেন না। মূসা মিডিয়মবাসী জনৈক যাজক-দুহিতার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক যদিও তদীয় শ্বশুরের মেষপাল চরাইতেন, তথাপি লিখন পঠন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিষ্কার প্রমাণ তদীয় পুস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই সকল কারণে আমরা মূসাকে এক জন সুসভ্য মানব সমাজের শিক্ষিত লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

পাঠক! আমরা মূসার পুস্তক হইতে আর একটী কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—মূসা অনার্য্য জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিম আচার্য্য কিন্তু তাঁহার পুস্তকে দেব দেবীর বৃত্তান্ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনারা আর্য্য জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতির মধ্যে পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কোন প্রকার প্রাচীন শাস্ত্রের পরিচয় কখন প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমরা ত আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যতীত অপর কোন জাতির প্রকৃত পৌত্তলিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গমাত্র এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু বৈদেশিক প্রাচীন জাতি সকল যে সর্ব্বাগ্রে পৌত্তলিক ধর্ম্মোপাসক ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি মূসার পুস্তকেই দেব দেবীর উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিবিধ নিগ্রহ সূচক ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে তৎকালে ইজিপ্ট ও ক্যানান প্রভৃতি দেশে পৌত্তলিক ধর্ম্ম সম্যকরূপেই প্রবর্ত্তিত ছিল। এস্থলে কৌতুকের বিষয় এই যে পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রাদি ছিল না, অথচ পৌত্তলিক মতানুসারিণী দেব দেবীর উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? ঐ সকল প্রাচীন কালের অধিবাসিগণ এমন কি বিশিষ্ট আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রগাঢ় ভাব ও অনুরাগ তাঁহাদের অন্তঃকরণে উদ্দীপ্ত

---

(১) সৃষ্টিকালে যাঁহারা সর্ব্বাদৌ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের দ্বারা লিপি কৌশল আবিষ্কৃত না হইয়া তৎপরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হইয়াছিল। (২) যদি তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রাজ্ঞ পুরুষের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে প্রথমতঃ কোনপ্রকার পৌত্তলিক ভাব উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে তিনি এক জন শাস্ত্রকার হইতেন, এবং তাঁহার খ্যাতি ও যশ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইত। কিন্তু মূসার পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে সেরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন নাই। এস্থলে আমাদিগের অপরিজ্ঞাত পৌত্তলিক কোনপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র তত্তদ্দেশে তৎসময়ে প্রবর্ত্তিত থাকিলেও থাকিতে পারে বলিয়া যদি কেহ তর্কোত্থাপন করেন, যুক্তিবলে অচিরেই তাহার খণ্ডন হইতেছে;— কারণ মূসার পুস্তকে ক্যানানবাসিদিগের পুরাতন দেবমূর্ত্তি, চিত্রপট ও পীঠস্থান প্রভৃতি সমুদায় পৌত্তলিক চিহ্ন ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ আছে; অতএব তাহাদের যদ্যপি কোনপ্রকার পৌত্তলিক ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে মূসার উপাস্য দেবতা সর্ব্বাগ্রে তাহাই দগ্ধ করিতে আদেশ করিতেন। কিন্তু মূসার গ্রন্থে তদ্রূপ কোন শাস্ত্রাদি নষ্ট করিবার প্রসঙ্গ নাই; যথা—

> "Then ye shall drive out all the inhabitants of the
> land from before you, and destroy all thier pictures,
> and destroy all thier malten images, and quite
> pluck down all thier high places"

Number XXXIII

Lesson 52.

উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মূসার পূর্ব্ব হইতে ইজিপ্ট ও ক্যানান প্রদেশে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল, অথচ উক্ত ধর্ম্মের নিয়মিত বিধি ব্যবস্থা সংযুক্ত কোন শাস্ত্রাদি ছিল না। অতএব তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে পৌত্তলিক ভাব ও বিশ্বাস কি সূত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, এই বিষয় সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে এই পুরাতন ভারতবর্ষই যে তাঁহাদের পৌত্তলিক ভাব সংগ্রহের এক মাত্র আকর; এ কথা

---

(২) অধিকাংশ স্থলে মনুষ্য জাতি আদর্শ দর্শন করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। একটী আদর্শ হইতে অন্যটী তাহা হইতে অন্যটী এইরূপে উত্তরোত্তর মনুষ্যদিগের জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে। আমাদের পৌরাণিকগণও আদর্শ ভিন্ন তাঁহাদের শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। পুরাতন সম্পত্তি বেদ ও ব্রাহ্মণাদিতে বরুণ ও ইন্দ্রাদি দেবতার যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহাদের দেব দেবী সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সহজেই উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, আমরা ভারতবর্ষের স্থূল স্থূল ইতিবৃত্ত সহকারে এই বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা করিব।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের কোনপ্রকার লিখিত শাস্ত্র সম্পত্তি ছিল না; মন্বাদি মহর্ষিগণ ব্রহ্মার নিকট যে সকল বাচনিক ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত-হন, তাহাকেই "শ্রুতি" কহে। আদিম ঋষিগণ অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তি প্রভাবে সেই সকল শ্রুতি বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে যথাশ্রুত শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত মানব-ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা রীতিনীতি সমস্তই বাক্যোপদেশের উপর নির্ভর ছিল, লিখন পঠন কি পুস্তকাদির সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষা যেরূপ জটিল, ভাব ও অর্থ সেইরূপ দুরবগাহ; আবার কলেবর এতই বিস্তৃত যে শত বৎসরেও অভ্যস্ত হইতে পারে না। তজ্জন্য বেদ বেদাঙ্গ বিশারদ পরবর্ত্তী ঋষিগণ সংক্ষিপ্ত বেদ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তারে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে আর্য্যদিগের বাক্‌পটুতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র চর্চ্চার আধিক্য হইয়া উঠিল। তখন স্মৃতি সাহায্যে শাস্ত্র চর্চ্চার উন্নতি সম্ভাবনা না দেখিয়া লিপি কৌশল আবিষ্কার করিলেন। যে শুভক্ষণে লিপি-কৌশল আবিষ্কৃত হইল, সেইক্ষণ হইতেই আর্য্যগণ মনুষ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর বেদ-বিহিত মানবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক এক দিকে কতকগুলি সংহিতা অন্য দিকে যোগশাস্ত্র এবং কতকগুলি পুরাণ রচিত হইল। যদিও সংহিতাকর্ত্তা ঋষিগণ সমাজের পরম হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং তাঁহারা মনুষ্যদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা বিশদরূপে সঙ্কলন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু পৌরাণিকগণ এক সময়ে সমাজে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ পুরাণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক বেশ ভূষায় সুসজ্জিত। মানবজাতির কৌতূহল উত্তেজিত করি-বার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, পুরাণাদিতে সেই সকল উপাদান অতি সুকৌ-শলে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; অতএব উহা যে আদিম মানব জাতির চিত্তবৃত্তি সহজেই আকর্ষণ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? পৌরাণিকগণ অচির-কাল মধ্যে আর্য্য জাতিকে ঘোর পৌত্তলিক করিয়া তুলিলেন। এই সময় হইতে ভারতমাতার সুখ সৌভাগ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক দিকে অশ্বমেধ, রাজপেয়, প্রভৃতি বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অপর দিকে পুরা-

শোক্ত দেবী দেবীর অর্চ্চনাদি বহু সমারোহে সম্পন্ন হইতে লাগিল। বাদ্যোদ্যম ও কোলাহল সহকারে আর্য্যভূমি অচিরেই মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন ভারতমাতার আর সুখ সমৃদ্ধির পরিসীমা রহিল না; যে দিকে অবলোকন কর,সেই দিকই অলঙ্কৃত ও বিচিত্র শোভায় সুশোভিত! ভারতের এইরূপ সুখ-সমৃদ্ধি কোন কালেই বৈদেশিকগণের অপরিজ্ঞেয় ছিল না; এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন জন্য নদ নদী সকল চির দিনই প্রশস্ত রহিয়াছে। বৈদেশিকগণ জল পথে গমনাগমন উপলক্ষে ক্রমে ভারত-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া এতদ্দেশের রীতি নীতি ক্রিয়া কলাপ সাবধানে পর্য্য-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন ভারতবাসিগণ যাগ যজ্ঞ ও দেব দেবীর উপাসনা করে; দেখিলেন তাহাদের সুখ সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই। তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া মনে মনে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাগ যজ্ঞ ও দেব দেবীর আরাধনা বলেই ইহারা সর্ব্বপ্রকার সুখ ও ঐশ্বর্য্যের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অমনি দেব দেবীর প্রতি তাহাদের আন্তরিক ভক্তির উদয় হইল। তদবধি বৈদেশিকগণের মধ্যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম অপরিস্ফুটরূপে প্রব-র্ত্তিত হইল। তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন না। কারণ, আর্য্য ঋষিগণ বেদাচার বহিষ্কৃত পরজাতীয়দিগকে জঘন্য ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের নিকট স্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রকাশ করিতেন না। এই সকল তর্কের অনুরোধে আজ আমরা নূতন প্রকাশ করিতেছি এমত নহে, যাঁহারা খ্রীষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত; যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মহামহোপাধ্যায় অভিধানে অভিহিত হইতেছেন, সেই সর্ব্ব তত্ত্ববিদ বৈদেশিক পণ্ডিতগণ নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

" Sir william Jones remarks

I strongly incline to believe that Egyptian Priests have actually come from the Nile to the Ganga and Jamuna, and that they Visited the Sarmans of India, as the sage of Greece Visited them rather to acquire than to impart Knowledge "

Introduction to the Science of Religion—Page 294.

মহামহোপাধ্যায় সার উইলিয়ম জোন্স দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সমর্থন করিয়াছেন যে, গ্রীক পণ্ডিতগণ যেরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের বিজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ইজিপ্টদেশীয় যাজকগণও নাইল নদী হইতে গঙ্গা ও যমুনায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের বিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর এতদ্দেশে যেরূপ অনুসন্ধিৎসু বৈদেশিকগণের গতি বিধি আরম্ভ হইয়াছিল, তদ্রূপ আর্য্যসমাজে হেতুশাস্ত্রের উপাদান সামগ্রী ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রগাঢ় যজ্ঞাদিতে সভাস্থলে যে, সকল মহামহোপাধ্যায় ঋষিগণ সমবেত হইয়া শ্রুতি স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন করিতেন, তাহার ভূরিপ্রমাণ পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান ঋষিগণ যদিও অরণ্য মধ্যে স্ব স্ব আশ্রমে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন, কিন্তু যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহারা সভাস্থ না হইলে অনুষ্ঠিত ব্যাপার সুসিদ্ধ হইত না; তজ্জন্য যজ্ঞাদি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই সমবেত হইতেন। এইরূপে যখন ঋষিদিগের সভা হইত, তখন শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ লালসায় চতুর্দ্দিক হইতে আবাল বৃদ্ধ যুবা—কি দেশীয় কি বৈদেশিক সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তত্তৎস্থলে উপনীত হইতেন। সভাস্থলে ঋষিগণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন, সাধারণের নিকটে আবার প্রসঙ্গক্রমে তৎসমুদায় আন্দোলিত হইতে থাকিত। এইরূপে বৈদেশিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া লোকপরম্পরায় আর্য্যদিগের শাস্ত্রসমূহের অনেক আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে পৌত্তলিক ধর্ম্মমত অপেক্ষা আর্য্যদিগের যে একটী বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত আছে, তদ্বিষয় তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন ঈশ্বররাজ্যের বিধি ব্যবস্থা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাদের যত্ন জন্মিল। ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহারা যে সমস্ত শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহ করিতেন, স্বদেশে যাইয়া তৎসম্বন্ধে পরস্পর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতেন। এইরূপ আন্দোলনক্রমে সভ্যতার বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিক মতের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা জন্মিল। তৎকালে ইজিপ্ট ক্যানান ও মিডিয়ম প্রভৃতি দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা ও মনুষ্যের মনোবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার—যশোহর।

পরমাণুক ও দ্ব্যণুক তত্ত্ব।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বিষয়োদ্ব্যণুকাদিস্তু ব্রহ্মাণ্ডান্তউদাহৃতঃ।

প্রিয়দর্শন! অধ্যবসায় এবং মনঃসংযোগ থাকিলে বালকেও নিতান্ত দুরূহ বিষয়ের ভাবসংগ্রহে সমর্থ হইতে পারে। কৌতুককর পদার্থবিদ্যার উপদেশ শুনিতে সর্ব্বদাই তোমার কৌতূহল জন্মে। বিদ্যাশিক্ষায় তোমার গাঢ় অনুরাগ; তুমি নৈসর্গিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়ত অনুরক্ত। বৎস! তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমি সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া আছি; অধ্যাপনকালে বাৎসল্যোদ্গত প্রেমধারায় পুস্তকের পত্র ভাসিয়া যায়। সে দিন ইন্দ্রধনুর কিঞ্চিৎ বিবরণ তোমাকে শুনাইয়াছি। আজ আর একটী বিষয়—পরমাণুক ও দ্ব্যণুকতত্ত্ব। পদার্থ বিদ্যার এ একটী দুরূহ অঙ্গ। ইহার সমস্ত শাখা প্রশাখার বিস্তারিত বর্ণনা করিলে তাবৎ বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে কঠিন হইবে। সে কারণ স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত গুলির বর্ণনা করিতেছি, প্রণিধান কর।

আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়রূপ দ্ব্যণুকের বিশ্লিষ্ট অবয়বই পরমাণু। ভাষাপরিচ্ছেদ, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির তাৎপর্য্যানুসারে উহা নিত্য এবং সূক্ষ্ম। অন্নপূর্ণা তোমার গৃহে বাঁধা; বৎস! আবার কার দ্বারে তুমি ভিক্ষা করিতে যাইতেছ? চিক্কণ কাগজের পত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে না; খুলিয়া দেখ,—বনজাত কর্কশ তালপত্রেই সকলি মিলিবে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম; তাহার বিনাশ নাই,—ভারতের এটী পুরাতন কথা। অধুনাতন সুসভ্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক দেখিয়া শুনিয়া, বিস্তর গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া এখনও যে নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন নাই,—এসো, বিস্ফারিত বক্ষে একবার শ্লাঘা করি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা বহু পূর্ব্বে সে কথার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যাবৎ দিবারাত্রির মানবিধাতৃ চন্দ্রার্ক থাকিবে, তাবৎ হিন্দুদিগের দর্শনসূত্র অভ্রান্ত বলিয়া জন সমাজে পরিগণিত হইবে। তুমি ইউরোপের পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ কর—দেখিবে, এখানে অণুবীক্ষণ, ওখানে দূরবীক্ষণ, লেন্স, টুর্ম্মোলিন, প্রিজম, নানা প্রকার আরক, নানা প্রকার আসবাব,—তার কত নাম করিব, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এ সকল ছিল না। তবু তাঁহাদের মীমাংসা কত সূক্ষ্ম, বিষয়বোধ কেমন অভ্রান্ত!

প্রিয়দর্শন! দেখ, আমরা এখানে উপবিষ্ট আছি। আমাদের দেহ, পরিধেয় বসনভূষণ এবং পরিদৃশ্যমান গৃহসজ্জা ভিন্ন এখানে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান আছে কি? শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া তুমি বলিয়া থাক,—এখানে কিছুই নাই। সে কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কোন পদার্থ নাই এমন স্থান জগতের কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। শূন্য স্থানই আকাশ (১)। যে স্থলে আকাশ আছে, তথায় কোন না কোন পদার্থও বিদ্যমান আছে। বৎস! বুঝিয়াছ, আমি বায়ুর কথা বলিতেছি। এই গৃহাভ্যন্তর বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ। তুমি দেখিতেছ না, স্পর্শেন্দ্রিয়ে অনেকটা অনুভব করিতেছ। কিন্তু, তাহাতেও সম্যক্ পদার্থবোধ হইতেছে না। বায়ু বাষ্পরূপ; উহা একটা বিমিশ্র পদার্থ,—কেবল একটী মাত্র উপাদানসঞ্জাত নহে। অম্লজান এবং যবক্ষারজান এই দুটী বাষ্প মিশ্রিত হইলে বায়ুরূপে পরিণত হয়। অতএব দেখ, বায়ু একটী মাত্র সমগ্র বিশুদ্ধ পদার্থ নহে,—উহা কতক গুলি পরমাণু সমষ্টি।

জগতে কোন পদার্থই অখণ্ড নহে। বৃক্ষ লতা পাতা প্রস্তর জীবের দেহ ও ধাতু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ অসংখ্য খণ্ড খণ্ড পরমাণুর সমষ্টি। আমার হস্তের এই স্বর্ণমুদ্রাটী দৃঢ় একাবয়ব। তুমি গণনা করিয়া সংখ্যা নিরূপণ কর, বলিবে—আমার হস্তে কেবল একটী মাত্র মুদ্রা আছে। এই মুদ্রা একটী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে কতগুলি পরমাণুর সমষ্টি তাহা সংখ্যা করিবার উপায় নাই। ঐ সমস্ত পরমাণু পরস্পর গাঢ়রূপে সংলগ্ন আছে। এই বায়ুও অতি সূক্ষ্ম দ্বিবিধ পরমাণুর সমষ্টি; তাহারা নিরন্তর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র আধারে বাষ্পের যত পরমাণু থাকিতে পারে, তাহারও সংখ্যা হয় না; তজ্জন্য পরমাণু অসংখ্য—অনন্ত

---

(১) ন্যায়মতে আকাশ অজন্য নিত্য এবং অশরীরী। আকাশের দ্বিতীয় নাই; কেবল উপাধিভেদে নানা প্রকার হইয়া থাকে। উহার ইন্দ্রিয় কর্ণ এবং বিশেষ গুণ শব্দ। এই স্থলে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তির আভাস আছে। কোন আধার হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিলে তন্মধ্যে দ্রব্য সংঘর্ষে শব্দ উৎপন্ন হয় না; অতএব আকাশের অস্তিত্বে শব্দের অভাব উপপন্ন হইতেছে। শব্দ বায়ুর গুণ; বায়ুর পরমাণুর দ্বারা শব্দতরঙ্গ চালিত হয়। এ মতটী প্রমাণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আকাশের অসত্ত্বে শব্দতরঙ্গের প্রতিঘাত সম্ভবিতে প্যারে না। সে কারণ শব্দ আকাশেরও একটী গুণ বলিতে হইবে।

বেদান্ত ন্যায়ের অনুবর্ত্তী হন নাই। তন্মতে আকাশ জন্য পদার্থ।

বলিলেও বিশেষ দোষ স্পর্শে না। সমস্ত পরমাণুই সমরেখ মার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে, কখন তাহারা বক্রপথ অবলম্বন করে না। কিন্তু, সঞ্চরণ কালে অন্য পরমাণুকে সংঘর্ষিত হইলেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হয়।

অম্লজান এবং যবক্ষারজান নামক দুটী বাষ্পের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এক এক জাতীয় বাষ্পের প্রকৃতি একই রূপ। যাবতীয় অম্লজান বাষ্পের পরমাণু এক একটী পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত; তাহাদের গুরুত্ব, স্পন্দন বা গতির বেগ সমস্তই একরূপ। আবার যবক্ষারজানের ধর্ম্ম অম্লজানের সদৃশ নহে। উহার পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু, সকল যবক্ষারজান বাষ্পের পরমাণুর ধর্ম্ম এক জাতীয়। তাহাদের গুরুত্ব ও গতি অম্লজানের তুল্য নয়, সত্য; কিন্তু একটী যবক্ষারজান-পরমাণুর গুরুত্ব ও গতি আর একটী তজ্জাতীয় পরমাণুর ঠিক অনুরূপ। তাহাদের স্বজাতির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈসাদৃশ্য নাই। দুটী পরমাণু একত্র মিলিত হইলে দ্ব্যণুক পদার্থে পরিণত হয়। বৈশেষিক সিদ্ধি অনুসারে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় সকলের মূল কারণ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও সর্ব্বাদৌ চারিটী ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে পৃথিব্যাদিও যৌগিক পদার্থ হইতেছে। অম্লজান এবং জলজান বাষ্প মিলিত হইলে জল উৎপন্ন হয়; অতএব জল কিরূপে একটী আদি ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? উত্তরোত্তর রসায়ন বিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধিত হইলে মূল পদার্থ গুলিও আবার পৃথক্ পৃথক্ উপাদানে বিন্যাসিত হইতে পারিবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বৎস! আমরা স্বীকার করিয়াছি, কি বায়ু, কি জল, কি অন্য কোন পদার্থ, কিছুই অখণ্ড বস্তু নহে,—কেবল সূক্ষ্ম পরমাণু রাশির সমষ্টি। তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন এবং তাহারা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। এই কথাগুলি কি আনুমানিক কিম্বা প্রামাণিক?—কোন বিশিষ্ট উপায় দ্বারা এগুলি প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে, অথবা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়?—না, এগুলি আনুমানিক তত্ত্ব নয়; স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা এই তত্ত্ব আমি তোমার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি। এ বিষয়টী সাতিশয় জটিল, প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া বিশদরূপে বর্ণনা করিতেছি। তুমি সতর্ক হইয়া আমার অনুসরণ কর; যেন পদস্খলন হয় না, তাহা হইলে দিশাহারা হইবে।

তোমার স্মরণ থাকিবে, সে দিন ইন্দ্রধনুর বৃত্তান্ত আমার নিকট শুনিয়াছিলে, তোমাকে শব্দতরঙ্গ এবং আলোকতরঙ্গের বিবরণ বুঝাইয়া দিয়াছি। আজ আবার সেই কথাগুলি তোমাকে মনে করিয়া দেখিতে হইবে। যদি বিস্মৃত হইয়া থাক, লজ্জিত হইও না, অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি,—শ্রবণ কর।

তোমার অঙ্গুলিটী জলসিক্ত করিয়া এই পানপাত্রের অগ্রভাগে ঘর্ষণ কর। শুনিতেছ, একটী মধুর সুশ্রাব্য স্বর উদ্ভূত হইতেছে কি না? একটী ধাতুময় কলসের ভিতর মুখ দিয়া সীস্ দাও, কিম্বা গান কর। এবার কি শুনিতেছ?—দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর তীক্ষ্ণ হইয়াছে এবং উহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বৎস! বুঝিয়াছ আমি তোমাকে কি বলিলাম? হস্ত কিম্বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ পদার্থ দ্বারা এই ধাতুময় পাত্রে ঘর্ষণ করিলে অথবা আঘাত করিলে যে ফল ফলে, তন্মধ্যে শব্দ করিলেও সেই ফল ফলিতেছে। দেখ, বিস্মৃত হইও না, এই দুটী কথা আমাদের অদ্যকার বিতর্কের মুল সূত্র, ইহাই আমাদের প্রস্তাবিত সত্য সংস্থাপনের এক মাত্র সহায়। এখানে ধাতুময় পাত্রের যেমন গুণ দেখিলে, অন্যান্য ধাতু পাত্রেরও সেইগুণ আছে। কিন্তু তাহাদের গঠনের তারতম্যানুসারে সকল প্রকার স্বরে প্রতিধ্বনিত না হইতে পারে। একটী পাতলা ধাতুকলসে মুখ দিয়া শব্দ করিলে প্রতিধ্বনি হয়, কিন্তু ধাতুর থালায় হয় না। আবার প্রচণ্ড বজ্রপাতে থালাও ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে। যে নিগূঢ় তত্ত্ব গোপন রাখিয়া কেবল তাহার ফলগুলি সোপানে সোপানে ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহা কেবল ধাতুময় পাত্রে নহে,জগতের সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছে। মৃণ্ময় প্রাচীরে ঠেস দিয়া থাক, বজ্রপাতের সময় দেয়াল কম্পিত হইয়া উঠিবে। সেতারার ও তানপূরার তারে এবং বেহালার তন্তুতে সেই কারণ বর্ত্তমান আছে।

সম্প্রতি ধাতুতে তুমি এই গুণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিলে। অঙ্গুলি দ্বারা ধাতুপাত্র ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার স্বর উৎপন্ন হয়। ধাতুপাত্রে মুখ দিয়া শব্দ করিলেও প্রতিধ্বনি হয়। অনুমান কর, এই গৃহমধ্যে কতকগুলি ধাতুময় ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলাম। ঘণ্টাগুলি এক প্রকার নয়; বিভিন্ন গঠনের; এবং বিবিধ গ্রামের স্বর দিলে তবে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রত্যেক ঘণ্টার নাভিরন্ধ্রে কতক গুলি সচ্ছিদ্র স্থিতিস্থাপক রজ্জু এমন করিয়া নিবদ্ধ রাখ যেন তাহাদের উপর ঘণ্টা অনায়াসে ফিরিতে ঘুরিতে পারে। এস্থলে মধ্য

স্থিত ঘণ্টাটাই কেন্দ্রবর্ত্তী, তাহার পরিবেষ্টিত সচ্ছিদ্র রজ্জুগুলি স্থিতিস্থাপক। কারণ, তাহা হইলে সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে চাপসহ হইবে। সম্প্রতি এই সমগ্র কাল্পনিক প্রতিকৃতিকে একটী পরমাণু বলিয়া অনুমান কর। দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমাণুর প্রকৃতিবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত এ প্রকার কল্পনা করিলাম। বস্তুতঃ, পরমাণু ধাতুনির্ম্মিত ঘণ্টাদির ন্যায় কোন পদার্থ বিশেষ নহে, তাহাতে রজ্জু আদিও বদ্ধ নাই। ঘণ্টার কেন্দ্রে সচ্ছিদ্র স্থিতিস্থাপক রজ্জু বদ্ধ থাকিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ। চতুর্দ্দিকে রজ্জুতে ঘণ্টা আবদ্ধ আছে, পতিত হইতেছে না অথচ নিজ কেন্দ্রে ঘুরিতে পারে। এই গৃহস্থিত বায়ুর পরমাণুও ঠিক সেইরূপ জানিবে। এই বায়ু পরমাণু রাশিতে বিমিশ্রিত; তাহারা নিয়তই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে; এবং নিয়তই পরস্পরের উপর সংঘর্ষ লাগিতেছে; তখনই তাহাদের গতি ফিরিতেছে। এস্থলে দেখ, যেখানে ঘণ্টাটী স্থাপিত আছে, তাহাই মধ্যস্থল। অনুমান কর, পরমাণুরাশি সর্ব্বাগ্রে তথায় সঞ্চিত ছিল; রজ্জুগুলি তাহাদের গতিপথের নিদর্শন। কেন্দ্র হইতে চারি দিকে ঐ সকল পরমাণু বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। রাত্রি কালে অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়াও তুমি ইহার অনুরূপ দেখিয়াছ। প্রদীপের শিখা এক স্থানে প্রজ্বলিত থাকে, সেইটী মধ্যস্থল। পরে ঐ জ্বলৎ শিখা হইতে সমরেখায় রশ্মিমালা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিরণগুলি ঠিক এক একটী আলোক সূত্রের ন্যায় অনুমিত হয়।

বাষ্পের পরমাণুগুলি পরস্পরের উপর ঘনিষ্ঠ রূপে মিলিত হইয়া থাকে। তথাচ তাহারা প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছে, তিলার্দ্ধ কালও সুস্থির নয়। কোন পরমাণু মুহূর্ত্ত মাত্রও এক স্থানে থাকে কি না সন্দেহ। এই আধার স্থিত জলের পরমাণু নিয়তই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। জলের তরঙ্গে এক স্থানের কণা বেগ দ্বারা শীঘ্র অন্যত্র চালিত হয় না। কিন্তু, অভ্যন্তরে এক স্থানের কণা অন্যত্র নীত হইতেছে। জলের উপর এক বিন্দু বর্ণক দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিয়া অত্যল্প ঢেউ দাও, পরস্পর জলকণার সংঘর্ষে তরঙ্গের আবেগ উত্থিত হইবে। কিন্তু, ঐ বর্ণক দ্রব্য তরঙ্গের উপর ভাসিতে ভাসিতে শীঘ্র এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবে না। কারণ, জলকণার সংঘর্ষে নিম্নে ও উর্দ্ধে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাতে পরমাণুর ঠিক সোজা গতি থাকে না। যাহা হউক, কিয়ৎকালের পর ঐ বর্ণক পদার্থের পরমাণু জলের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পুনশ্চ দেখ, এক গ্লাশ জলে কিঞ্চিৎ

শর্করা নিক্ষেপ কর, কিয়ৎকাল পরে সমস্ত জল মিষ্ট হইয়া উঠিবে। পরমাণু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করিলে কদাচ সমস্ত জল মিষ্টরসসিক্ত হইত না। যেখানে শর্করা নিক্ষেপ করিবে, কেবল তথাকার কিঞ্চিৎ জল মিষ্ট হইত। কিন্তু পরমাণুর স্বতই পরিভ্রমণধর্ম্ম,—কখন এক স্থানে সুস্থির থাকে না। দ্রব দ্রব্যের এই প্রকার স্পষ্ট পরীক্ষা উপলব্ধি হয়। পরন্তু, কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে বিভিন্নরূপ প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। আমার করতলস্থ এই শর্করা খণ্ড দেখ। ইহার সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি পরস্পরের গায়ে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহারা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তাহাদের স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইবারও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। বৎস! মনোযোগ করিলে? এস্থলে তাদৃশ ক্ষমতা নাই বলিলাম। ইহার তাৎপর্য্য কি ভাবিয়া দেখ। দ্রব দ্রব্যের পরমাণু অনায়াসে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু কঠিন পদার্থের পরমাণু গুলির তেমন ক্ষমতা নাই। তাহাদের গতি অন্য প্রকার। বিবেচনা কর, একটী পদার্থের ঠিক মধ্যস্থল ছয়গাছি স্থিতিস্থাপক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া, সমান আকর্ষণে একগাছি উর্দ্ধে, একগাছি অধোভাগে,এবং বক্রি চারিগাছি রজ্জু চারি পার্শ্বে বাঁধিলে যদি মধ্যস্থিত পদার্থের কোন অংশ বিচ্যুত হয়, তাহা কখন স্থানভ্রষ্ট হইতে পারিবে না। উহা স্বসীমাবর্ত্তী প্রদেশেই ঘুরিয়া বেড়াইবে। বল পূর্ব্বক অন্যত্র সরাইয়া দিলে আবার স্বস্থানে আসিয়া পড়িবে। কঠিন পদার্থের আভ্যন্তরিক পরমাণুরও তদ্রূপ গতি। বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যের ন্যায় কঠিন পদার্থও অসংখ্য সূক্ষ্ম পরমাণু রাশিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহারা দৃঢ়রূপে পরস্পরের গায়ে মিলিত হইয়া আছে, তজ্জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংকীর্ণ স্থানে বিলোড়িত হইতে পারে, কিছুতে অন্যত্র পরিচালিত হয় না। বৎস! এখানে তোমার পূর্ব্ব সংস্কারের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিল, তাই বিস্মিত নয়নে একবার আমার পানে চাহিলে। পদার্থ তত্ত্ব এইরূপ বিস্ময়করই বটে। অতঃপর পরমাণুর গতির বিষয় যখন সবিস্তার বিবৃত হইবে, না জানি তৎকালে আহ্লাদে তোমার নেত্র যুগল কতই প্রস্ফুটিত হইবে।

তুমি শুনিলে যাবতীয় আকার অবয়ব কেবল সূক্ষ্ম পরমাণু রাশির সমষ্টি মাত্র। কিন্তু একটী স্থলে ঐ পরমাণু গুলি কদাচ একত্র মিলিত হয়। এমন ক্ষেত্রে তাহাদের ঠিক সোজা গতি হইয়া থাকে। দ্রব দ্রব্যের পরমাণু গুলি অতি সন্নিকর্ষ হেতু একত্র মিশ্রিত হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের সন্নি-

লনে একটী পৃথক ফল উৎপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তরল পদার্থের পরমাণু কখন সোজা পথে পরিভ্রমণ করিতে পারে না। এখন বিচার করিয়া দেখা চাই, কি কারণে আমরা বায়ুকে একটী সমগ্র পদার্থ বলিতে পারি না। উহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুরাশির সমষ্টি, এমন বিশ্বাস কেন করিতেছি? বিবেচনা কর একটী আধারে কিঞ্চিৎ অম্লজান আছে। ঐ পাত্রের কিয়দংশ শূন্য,—আকাশময়। এই কথাটী নিতান্ত সুগম নহে;—আধারভাণ্ড অম্লজানে পরিপূর্ণ অথচ তাহার মধ্যে অবকাশ বিদ্যমান আছে। ঐ অবকাশের এক পার্শ্বস্থিত অম্লজান পরমাণুর যেমন বিধানোপাদান অপর পার্শ্বেরও সেইরূপ।

বৎস! এই অপরিস্ফুট প্রাকৃতিক তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছি, অনুধাবন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ধাতুময় কলসের অগ্রভাগে আর্দ্র অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলে শব্দ হয়, কলসের ভিতর মুখ দিয়া গান করিলেও শব্দ হয়—এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিস্মৃত হও নাই ত? পূর্ব্বে যে ধাতুময় ঘণ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছি, অনুমান কর, এই গৃহের চতুর্দ্দিকে তাহা ঝুলিতেছে। ঘণ্টাগুলি কাল্পনিক পরমাণু; কোন বিশেষ গ্রামের সুরে তাহাদের উপরে প্রতিধ্বনি হয়। অর্থাৎ কোন বিশেষ ওজনের সুরে চীৎকার করিলে তৎসমুদায় ধাতুবাদ্যে প্রতিঘাত হইতে পারে। এখন দেখ, ঐ ঘণ্টার শব্দ করিলে তোমার শব্দের উচ্চতানুসারে তিন প্রকার ফল উৎপন্ন হইবে। প্রথম, ঐ বাদ্যের গঠনানুরূপ সুরের উচ্চতা না হইলে উহা কিছু মাত্র বিচলিত হইবে না। দ্বিতীয়, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধসুরে চীৎকার করিলে বাদ্যযন্ত্র বিচলিত হইবে, পরন্তু উহা পূর্ব্ববৎ নীরব থাকিবে। তৃতীয়, অতীব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে বাদ্যযন্ত্রটী কম্পিত হইয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিবে।

প্রিয়দর্শন! তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হইয়াছ কি? আর একটী দৃষ্টান্ত শুন, তবে এ বিষয়ে আরও সংস্কার জন্মিবে। বিবেচনা কর, এই গৃহে তিনটী কাঁসার বাটী আছে। তন্মধ্যে একটী কাংস্যাধার এক যবোদরের অষ্টাংশের এক অংশ পুরু। আর একটী এক যবোদরের অর্দ্ধেক পুরু। অপরটী একটী যবোদরসদৃশ পুরু। গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া করতালি দাও। দেখিবে,—পাতলা পাত্রে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইবে; কিন্তু পুরু পাত্রে কিছুই হইবে না। তদ্রূপ আবার দেখিতে পাইবে, এই গৃহমধ্যে পিয়ানো বাদ্যের সকল সুরগুলি বাঁধিয়া তুমি উচ্চৈঃ

স্বরে গান কর; যেমন সুরে তান তুলিবে পিয়ানোরও ঠিক সেই সুরে প্রতিঘাত লাগিয়া উহা বাজিতে থাকিবে। অন্যান্য সুর নীরব; সেগুলি কিঞ্চিৎ বিকম্পিত হইতে পারিবে; কিন্তু তৎসমুদায় হইতে সুর উঠিবে না। অপরন্তু ঐ সমস্ত সুরের সমুচিত উর্দ্ধগ্রামে তান ধরিলে সেগুলি হইতেও সুশ্রাব্য মধুর সুর উত্থিত হইবে।

অনুমান কর, এই গৃহের দ্বারে পিয়ানোতার নির্ম্মিত এক খানি যবনিকা নিক্ষেপ করিলাম। ঐ তারগুলি আল্‌গা কিম্বা বস্ত্রের সুতার ন্যায় পরস্পর বপন করা নহে, পিয়ানো যন্ত্রের ন্যায় ঐ যবনিকার তারগুলিও সুরের অনুসারে খাটান। উপযুক্ত তান দিলে তাহারা বাজিয়া উঠে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। গৃহের অভ্যন্তরে আমি উপবিষ্ট থাকিলাম, তুমি যবনিকার অন্তরালে গৃহের বহির্ভাগে উপবেশন কর। গৃহমধ্যে আমি এক একটী তানে গীত করি, শুন দেখি। যে তান যবনিকার তারের সঙ্গে সম্মিলিত হইবে না, তাহা উহাদের উপর প্রতিঘাতও করিবে না। গৃহের বহির্ভাগে থাকিয়া তুমি তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। কিন্তু যে তান ঐ তারের লয়ে মিলিত হইবে, তাহার গ্রাম সমুচিত উর্দ্ধ না হইলে ঐ সুর তারে গিয়া বিলুপ্ত হইবে। শব্দমাত্রেরই একপ্রকার তরঙ্গ আছে, বায়ুসহযোগে তাহা চালিত হয়। তদ্রূপ আলোকেরও তরঙ্গ আছে, তাহা অন্য কোন প্রণালীতে চালিত হইয়া থাকে। ধাতুময় তার আশ্রয় করিয়া তাড়িতবেগ এক স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চরণ করিতেছে, তাহা তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ। জলপথ আশ্রয় করিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র নৌকা গতিবিধি করিতেছে। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া শব্দ সঞ্চরণ করে। আলোকের সঞ্চরণ করিবার বিশেষ আশ্রয় স্থান আছে। আলোকও তরঙ্গবেগবিশিষ্ট; কোন পদার্থকে আশ্রয় না করিলে উহা কদাচ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না। আলোকের সকল তরঙ্গ একপ্রকার কিম্বা এক জাতীয় নহে। যাহা হউক, সেগুলি তরঙ্গের ধর্ম্মাক্রান্ত এবং তরঙ্গবেগের নিয়মানুসারে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হয়। যেমন এক এক বিশেষ গ্রামের তান ধরিলে এক একটী বিশেষ সুরে প্রতিঘাত উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আলোকের বর্ণ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যানুসারে এক একটী উৎপন্ন হয়। আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বিবিধ আয়তনের হইলে বিবিধ বর্ণও প্রতিফলিত হইবে। সঞ্চরণাশ্রয়ের বিলোড়ন যে পরিমাণে সাধিত হয়, আলোকের বর্ণবৈচিত্র্যও তদনুসারে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অম্লজান বাষ্পের মধ্য দিয়া আলোক লইয়া গেলে কোন কোন বর্ণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোকে যে সমস্ত বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় অম্লজানের মধ্যস্থল দিয়া আলোক আনিলে তাহার কতকগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তোমার সম্মুখে যদি কতক গুলি স্তম্ভ সারি সারি প্রোথিত থাকে, তবে সেই অন্তরাল দ্বারা তোমার দৃষ্টি অনেকটা অবরুদ্ধ হইবে। স্তম্ভ শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগবর্ত্তী দ্রব্যগুলির সকল অবয়ব কদাচ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। এস্থলে দেখ, অম্লজান বাষ্পের মধ্যস্থল দিয়া আলোক আনিলে কোন কোন বর্ণক দ্রব্য তোমার দৃষ্টিগোচর হইল না। এখন বিবেচনা করা চাই, এটা কি ঐ বাষ্পের গুণ? কিম্বা এখানে অন্য কোন কারণ বিদ্যমান আছে? আমরা দেখিতেছি, জলজানের ভিতর দিয়াও আলোক আনিলে তদ্রূপ ঘটে। অতএব, অম্লজানের অন্তর্নিহিত বিশেষ কোন গুণ নাই, অবশ্যই অন্য কোন কারণ বিদ্যমান আছে।

বর্ণক দ্রব্যের এ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবার দুটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, আলোকের তরঙ্গ নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতে পারে। কারণ, যে স্ফুরিত বাষ্পের ভিতর দিয়া উহা সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সমধিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যানুসারে বর্ণক দ্রব্যের তারতম্য হয়, ইহা ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। দ্বিতীয়, পিয়ানোর তারে যেমন স্বর বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বাষ্পের উপাদানে ঐ বর্ণক রেণু বিলুপ্ত হইতে পারে। এই উভয় অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কতকগুলি রশ্মি বাষ্পকণায় অবরুদ্ধ হইতেছে। বক্রি কতকগুলি রশ্মি বাষ্প বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন অনুমানটী প্রামাণিক এবং ভ্রম-পরিশূন্য? বাষ্প না চাপিলে তাহার যতগুলি বর্ণক-রশ্মি অবরুদ্ধ হয়, বাষ্প চাপিলেও ঠিক ততগুলি বর্ণক-রশ্মি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। বিবেচনা কর বাষ্পের পাঁচটী কণা উপর্য্যুপরি শিথিল ভাবে বিন্যস্ত থাকিলে যদি দশটী বর্ণক-রেণু বিলুপ্ত হয়, ঐ পাঁচটী বাষ্পকণা নিবিড় নিষ্পীড়িত হইলেও পূর্ব্ববৎ দশটী বর্ণকরেণুকে বিলোপ করিবে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাষ্পরেণুর আকারের ন্যূনাধিক্যে আলোকের স্ফুরৎ তরঙ্গ লোপের ন্যূনাধিক্য হয় না। অর্থাৎ পরমাণুগুলি অধিক স্থান ব্যাপিয়া বিকীর্ণ থাকিলে আলোকের অধিক তরঙ্গবেগ অবরুদ্ধ হইবে, এবং স্বল্প স্থানে তাহারা সংযত

থাকিলে স্বল্প বেগ অবরুদ্ধ হইবে, এমত নহে। ঐ ন্যূনাধিক্যের অন্য কারণ আছে। পরমাণুসমষ্টির সমগ্র আকারে অবরোধের তারতম্য হয় না।

বাষ্পের পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মাংশ গুলিই ঐ অবরোধের মূল কারণ। বাষ্প নিষ্পীড়ন করিলে একটীও পরমাণু কিছুমাত্র নিষ্পীড়িত হয় না। তাহারা পূর্ব্বে কিছু কিছু দূরবর্ত্তী থাকে, নিষ্পীড়ন দ্বারা কেবল অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে (২)। এই সূত্র হইতে একটী অপূর্ব্ব সত্য সংস্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সূর্য্যে বর্ণক পদার্থ বিদ্যমান আছে। সূর্য্যরশ্মিতে পলকাটা একখণ্ড বেলোয়ারি কাচ ধরিলে আলোকে যে সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ আছে, তাহা পলে পলে বিভক্ত হইয়া প্রতিভাত হয়। কাচকর্ত্তৃক যে বর্ণবৈচিত্র্য-রেখা উৎপাদিত হয়, তাহাই সৌরচ্ছায়া। ঐ সৌরচ্ছায়ার প্রত্যেক অবয়ব সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হইলে উহার মধ্যে এক একটী কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে যে বিশেষ আলোক বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোক বিকীর্ণ হইবার সময় কোন বিশেষ অবরোধে তাহার গতি নিরুদ্ধ হয়, তজ্জন্য অন্তরালে রশ্মির কোন কোন অংশ আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং বিপরীত ভাগে তত্তৎ অংশ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে স্থির করা আবশ্যক, সেই অবরোধক পদার্থ কি? কোন বিশেষ আলোক অবরুদ্ধ হওয়ায় সৌরচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ রেখা লক্ষিত হয়। বৎস! এখন দেখ, যেমন কোন বিশেষ গ্রামের তান বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ একটী সুরের সঙ্গে ঐক্য হইলে ঐ তান অবরুদ্ধ বা বিলুপ্ত

(২) সার আইজাক নিউটন স্থির করিয়াছিলেন যে, আলোকে আলোক-রেণু নিহিত আছে; সূর্য্য হইতে উহা নিঃসৃত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ষ্টোক্স এবং কার্কফ্ ঐ মতের অনুমোদন করেন। কিন্তু, অন্যান্য অনেক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে আলোকে বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই। আলোক পদার্থান্তরে বিভক্ত হইলেই নানাবর্ণ কিরণ উৎপন্ন হয়। এতদুভয়ের যে মত প্রামাণিক হউক না, আমাদের সিদ্ধান্ত কিছুতেই অমূলক হইতেছে না। আলোকে প্রকৃত কোন পদার্থ না থাকিলেও উহার সঞ্চরণকালে আকাশবায়ুস্থিত পরমাণুতে আলোক সংঘর্ষ হয়। যেমন পলকাটা কাচ খণ্ডে আলোক বিভক্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ণ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে, শূন্য মার্গেও আলোক বিভাগের নিমিত্ত কোন পদার্থ চাই। সে পদার্থ কি?—পরমাণু।

হইয়া থাকে, এ স্থলেও ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান করিবে,—কোন একটী বিশেষ আলোক বিশেষ একটী অবরোধকের সঙ্গে ঐক্য হইয়াছে; সে কারণ ঐ আলোক অবরুদ্ধ বা বিলুপ্ত হইতেছে। সমুচিত উর্দ্ধগ্রামে যেমন তান ধরিলে বাদ্যযন্ত্রে সেই সুরের তার বাজিয়া উঠে, এস্থলেও ঐ অবরোধক পদার্থ যথেষ্ট সন্তপ্ত করিলে উহা হইতেও বিলুপ্ত আলোকের ন্যায় একটী আলোক উৎপন্ন হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ক্ষারদ্রব্য যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে তদ্রূপ আলোক নিঃসৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ক্ষারপরমাণুই ঐ আলোক রোধ করিয়া থাকে। আকাশবায়ুতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষারকণা নিয়ত বিচরণ করিতেছে; সূর্য্যরশ্মির কতক গুলি বর্ণভাগ উহাতে বিলুপ্ত হয়। ঐ ক্ষার পরমাণু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুতে উপলব্ধ হয় না, উহা শূন্যে অবস্থিতি করে। অতএব কোন বাষ্পের মধ্যস্থল দিয়া একটী আলোক আনিলে ঐ আলোকের যে যে বর্ণক অংশ বাষ্পের পরমাণুর সঙ্গে ঐক্য হইবে, সেই সেই বর্ণকরশ্মি গুলি অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে। কাজেই একটী বাষ্প অসংখ্য পরমাণুরাশিতে পরিপূর্ণ,তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। বৎস! অদ্য এই খানে বিশ্রাম করি। বারান্তরে তোমাকে পরমাণুর গতির বিষয়ে উপদেশ দিব।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

দেবগণ ষ্টেষণের বাহিরে আসিয়া এক খানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলেন এবং কয়েকজনে দেখিতে দেখিতে নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে দিকে চাহেন, দেখেন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসকল বিরাজ করিতেছে। ঘরে ঘরে কন্‌সর্ট বাজিতেছে। সকলেরই সানন্দ চিত্ত; যেন নগরবাসিগণ নিরানন্দ কাহাকে বলে জানে না। পিতামহ নগরের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, বরুণ! এ নগর নির্ম্মাণ করে কে?"

বরুণ। এই সুন্দর স্থানটীর নাম শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর ব্রিটিস ইণ্ডিয়ার মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে পূর্ব্বে খৃষ্টমিসনরিরা বাস করিতেন। নগরটী ডেনমৃদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহারা ইহাতে

১৭৫৫ খৃঃ হইতে ১৮৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তৎপরে অনুমান ১২০,০০০ টাকায় ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিয়াছে।

দেবগণ ইহার পর এক স্থানে বাসা করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন, তৎপরে ভাগীরথীতে স্নান করিতে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন "আহা! তীরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসকল বিশেষতঃ বাঁধা ঘাটসকল বিরাজ করাতে আমার সুরধুনীর কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে!

বরুণ। পিতামহ! সম্মুখে দেখুন ময়দা এবং সুরকীর কল।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! ময়দার কল! কলে ময়দা হোচ্চে?

বরুণ। আজ্ঞে, কলে গম ভাঙ্গিয়া অতি উৎপষ্ট ময়দা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। যে ময়দা শত শত লোক এক দিনে প্রস্তুত করিতে পারে না, কলে তাহা এক ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দেয়।

ব্রহ্মা। ইন্দ্র! ইংরাজেরা করেচে কি? য়্যাঁ! কলে মানুষ বয়, কলে জল তুলে, কলে কাঠ কাটে, কলে ময়দা করে, কলে সুরকী কুটে। কলেই ত সব হোচ্চে, তবে শ্রমজীবী লোকের চলবে কিসে? যা হোক, আচ্ছা রাজ্য এরা করচে, ভাবিতে গেলে রাজ্যটাও যেন কলে চলচে।

বরুণ। পিতামহ! কলেই প্রকৃত রাজ্য চলচে। নচেৎ ৬ মাসের পথে ভারতেশ্বরী থাকিয়া কি প্রকারে ভারত শাসন করতেছেন? ভারতে তাঁহার কয় জন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আছেন সত্য; কিন্তু তাঁহারাও অধিকাংশ সময় শৈলে বাস করেন। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন মহারাণী সাগর পারে, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারা পাহাড় পর্ব্বতে; অথচ রাজ্য যেন রামরাজ্য, তবে কলের শাসন নহে ত কি?

ব্রহ্মা। ওরে ভাই, কলেই রাজ্য শাসন হচ্চে আমি ত তাই বল্লাম। ঐ যে ঘট ঘট করে নেড়ে খবর দেওয়ার কলটা করেছে, ঐ সাগর পারে এবং পাহাড় পর্ব্বতে খবর নিয়ে যাচ্চে এবং এক মিনিটে হুকুম আনচে।

দেবগণ বাসায় স্নানান্তে আসিয়া আহারাদি করিয়া কলেজ দেখিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজ কহিলেন বরুণ! কলেজ বাড়ীটী ত বড় সুন্দর। বিশেষতঃ ইহার চূড়াসকল দেখিতে বড় নয়নপ্রীতিকর! কলেজের সন্নিকটস্থ বাড়ীসকল এবং তাহার সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানসকল দেখিয়া আমার যেন অমরাবতী বলিয়া বিস্ময় জন্মিতেছে।

বরুণ। দেবরাজ! এই কলেজ বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১৫,০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ছাদ এবং সিঁড়ি লৌহনির্ম্মিত।

দেবগণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বালকগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যেকেরই হস্তে এক এক খানি বাইবেল। তাঁহারা একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাহেন, দেখেন উত্তম উত্তম বাঁধান অসংখ্য পুস্তক রহিয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা! এ ঘরে যে পুস্তকগুলো রহিয়াছে, বোধ হয় এক দুই করে গুণতেই আমার জীবন কেটে যায়।

বরুণ। দেখ দেবরাজ! এই হচ্চে কলেজের পুস্তকালয়। এই পুস্তকালয়টীতে ৬০০০ হাজার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলে উপ চীৎকার করিয়া কহিল " বরুণ কাকা! বরুণ কাকা! আবার একটা কিসের কল!"

বরুণ। পিতামহ! কাগজের কল দেখুন। শ্রীরামপুরে-কাগজ বলে এক প্রকার যে বিখ্যাত কাগজ ছিল, তাহা এই কলেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে কাগজের কল উঠিয়া গিয়া পাটের কল হইয়াছে।

এখান হইতে যাইয়া সকলে শ্রীরামপুরের বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখেন, নানা দোকানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে " রামে রাম " শব্দে কয়ালেরা চাউল ওজন করিতেছে। কোন দোকানে বেণেরা চারি কড়ার ভুঁতে, অর্দ্ধ পয়সার সুপারি, দশ কড়ার তেজপাত বিক্রয় করিতে করিতে ক্লান্ত হইতেছে। এক স্থানে বসিয়া মেচুনীরা মৎস্য বিক্রয় করিতেছে। অপর স্থানে তরি তরকারী বিক্রয় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সকলে একটী চার্চ্চের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন,এই চার্চ্চটী ১৮০৫ সালে নির্ম্মিত হয়।

এখান হইতে সকলে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে দেখিতে গোস্বামীদের বাটীর নিকট দিয়া মৃত গোলোকচন্দ্র রায়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন,এক ব্যক্তি করযোড়ে দাঁড়াইয়া করুণ স্বরে কহিতেছে, " আপনারা শ্রীরামপুরের মস্তকস্বরূপ, অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া জাতিতে তুলে লউন। "

তৎশ্রবণে এক ব্যক্তি কহিতেছে—"তা আমরা কেমন করে পারি? তুমি যবনের উচ্ছিষ্ট লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিতেছ। তাহার হাতের খাইয়া

ধর্ম্মের মাথা খাইতেছে। আমরা কি কারণে তাহার হাতের খাইয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইব?"

নারা। বরুণ বিষয়টা কি?

বরুণ। ঐ ব্যক্তির স্ত্রী এক জন যবনের সহিত বাটী হইতে পালায়। বাবুটী অত্যন্ত স্ত্রৈণ বলিয়া কেঁদে কেঁদে পাগল। শেষে অনেক কষ্টে অনেক অর্থ ব্যয়ে সেই পলান ধনকে গৃহে আনিয়া ঘরকন্না করিতেছেন। সমাজ এই অপরাধে উঁহাকে সমাজচ্যুত করাতে উনি লোকের বাড়ী বাড়ী করযোড়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রহ্মা। এ বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। গোলোকচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তির। ইনি অত্যন্ত দানশীল ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ইনি এমন দাতা ছিলেন যে, অদ্যাপি বঙ্গদেশের অনেক লোক দিনটে ভাল যাইবার আশয়ে প্রাতে উঠিয়াই মহাত্মা গোলোক রায়ের নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

দেবগণ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! পর পারে যে স্থান দেখিতেছ, উহার নাম ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুরে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সামন্ত থাকিবার ব্যারিক ইত্যাদি আছে। অতএব দেখিবে কি?"

দেবগণ ব্যারাকপুর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বরুণ এক খানি নৌকা ভাড়া করিয়া সকলকে উঠিতে কহিলেন। সকলে নৌকারোহণ করিলে পিতামহ তীরের দিকে চাহিয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাব। সে পাছে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয় এই আশঙ্কায় লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। পিতামহ লোকটাকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া এক দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন, ক্রমে নৌকাও গিয়া পরপারে লাগিল।

ব্যারাকপুর।

দেবগণ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রাস্তার এক দিক দিয়া এক দল গোরা যাইতেছে। অপর দিক দিয়া ২। ৪ জন সিপাই চলিয়াছে। পিতামহ কহিলেন "এ স্থানে আসিয়া আমার বড় ভয় করতেছে। এ নগরের নাম কি বরুণ?"

বরুণ। এ স্থানের নাম বারাকপুর। এখানে গবর্ণমেণ্টের বারিক ইত্যাদি আছে। নগরটীর অপর নাম চাণক। কলিকাতা সংস্থাপক জব ,চার্ণক সাহেব এই স্থানে সর্ব্বদা বাস করিতেন। কথিত আছে উক্ত চার্ণক সাহেব একটী সুন্দরী হিন্দু বিধবাকে সহমরণের চিতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়ে এতদূর প্রণয় জন্মে যে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইলে সাহেব শোকে নিতান্ত অধৈর্য্য হন। তিনি প্রত্যহ ঐ রমণীর কবরের নিকট যাইয়া রোদন করিতেন, ভালবাসা দেখাইবার জন্য প্রতি দিন এক একটি কুক্কুট বলি দিতেন। কবরটি অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে।

উপ। বরুণ কাকা! মাগী বাঙ্গালী, সাহেব ইংরেজ। উভয়ে উভয়ের কথা কেমন করে বুঝতে পারতো?

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই বারাকপুরেই সর্ব্ব প্রথমে সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই স্থানের সিপাহিরা কালাপানী পার হইয়া যাইতে অস্বীকার করে।

দেবগণ বারিকের নিকট দিয়া বড় বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন নানা দোকানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানের সম্মুখে বসিয়া চারি জন দোকানী তাস খেলিতেছে এবং উভয় পক্ষের সপক্ষ হইয়া আরো ৪। ৫ জন জয় পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। খেলোয়াড়দিগের মধ্যে ঐ সময় কাহারও দোকানে খরিদার আসায় সে নিকটস্থ অপর এক ব্যক্তির হাতে "দাদা, আমার হয়ে খেলতো ভাই" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া খরিদদার বিদায় করিতেছে। কোন দোকানের দোকানী খাতায় হিসাব লিখিতেছে এবং এক একবার নিকটে টাঙ্গানো টিয়া পাখীর দিকে চাহিয়া "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম, পড় বাবা" বলিয়া চুমকুড়ী দিতেছে। কোন দোকানে এক জন দোকানী সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছে এবং ৪। ৫ জন শ্রোতা বসিয়া শুনিতেছে। বরুণ কহিলেন "পিতামহ! এ বাজারে সমস্ত দ্রব্যই হার বান্ধিয়া বিক্রয় হয়, নচেৎ দোকানদারেরা গোরাদিগকে মাতাল দেখিলে প্রতারণা করিয়া বেশী মূল্য লইতে পারে।

এখান হইতে সকলে চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন শৃগাল, বন্য মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, হরিণ ও নানা প্রকার পশু পক্ষী রহি-

য়াছে। বরুণ কহিলেন " চানকের চিড়িয়াখানা পূর্ব্বে বড় উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার যাবতীয় জীব জন্তু কলিকাতার জিওলজিকেল গার্ডেনে লইয়া গিয়াছে।

ইহার পর দেবতারা বারিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এক্ষণে বেলা অপরাহ্ণ, এজন্য ক্যান্টনমেণ্ট আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা দেখেন কোন স্থানে কতকগুলি সিপাই প্যারেড শিক্ষা করিতেছে; কোন স্থানে কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য চাঁদমারি নামক চিহ্নে গুলি মারিয়া লক্ষ্য শিক্ষা করিতেছে।

দেবগণ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজি-ষ্ট্রেটের বাটী, সিউনিসিপাল হাঁসপাতাল,এবং গবর্ণর জেনেরলের বাটী দেখিয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন " পিতামহ! ঐ যে দোতালা গুলি দেখিতেছেন, উহারই নাম বারিক। ঐ স্থানে সৈন্যেরা বাস করে। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বারিক মাটীর ছিল, এক্ষণে ইষ্টক-নির্ম্মিত হইয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা! আমাকে কেন সৈন্যের দলে দেও না?

নারা। সত্য বরুণ! উপকে সৈনিকের দলে দিলে হয়।

বরুণ। একে নেবে কেন, এ যে বাঙ্গালী।

ইন্দ্র। বাঙ্গালী হলে কি সৈনিকের দলে লওয়া হয় না?

বরুণ। না।

ব্রহ্মা। বরুণ! লওয়া হয় না কেন?

বরুণ। ভীত জাতি পাছে বন্দুকের গুলিতে হাত পা যাহা হউক একটা নষ্ট করে ফেলে। দেখুন পিতামহ, সন্ধ্যা আগত প্রায় এখানে রাত্রি নয়টার পর ভ্রমণ নিষেধ; অতএব আমাদের এখান হইতে প্রস্থান করাই উচিত হইতেছে।

নারা। এখানে নয়টা রাত্রের পর ভ্রমণ নিষেধ কেন?

বরুণ। পাছে কোন ছদ্মবেশী লোক রজনীতে ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত অনুসন্ধান করে, এই জন্যই ঐ নিয়ম করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা। আমাদের এখানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই। চল অদ্য রজনীযোগেই কলিকাতায় প্রস্থান করি।

বরুণ একথায় সম্মত হইয়া সকলকে লইয়া পুনরায় শ্রীরামপুরে আসিলেন

এবং ব্যাগ হস্তে গল্প করিতে করিতে দেবগণ ষ্টেষণ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—এক ব্রাহ্মণ একটী বাড়ীর দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া অতি মৃদু স্বরে কহিতেছে" বামা, দোর খোল আমি এসেছি।" পিতামহ জ্যোৎস্নার আলোকে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিয়া চিনিলেন ইনিই তিনি যিনি অপরাহ্ণে খেয়াঘাট হইতে পাছে কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয় এই আশঙ্কায় লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছিলেন।

বরুণ। ঠাকুর দা! এই বামুনকে দেখিয়া এক সময়ে আপনার বড় ভক্তি হইয়াছিল; এক্ষণে ইহার কার্য্য দেখুন। এ বাড়ীটী বেশ্যার বাড়ী। ঐ বামুনের বামী নামে একটী রক্ষিত স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে বাস করে। ঠাকুর রজনীতে সেই বামীর নিকট এসেছেন।

এই সময়ে বামী আসিয়া দ্বার খুলিল। এবং " পোড়ার মুখো কাল রাত্রে ছিলে কোথায়? আমি তোমার জন্য রুটি আর বেগুণভাজা ভেজে এক বোতল মদ এনে সমস্ত রাত্রি বসে বসে কাটিয়েছি" বলিয়া পৃষ্ঠে এক পদাঘাত করিল এবং হস্ত ধরিয়া চড় চাপড় দিতে দিতে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইল।

ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। শ্রীবিষ্ণু! কলিকালে লোক চেনা ভার!! এ ত সাজ গোজ, এত আচার ব্যবহার, এদিকে বেশ্যার বাড়ীতে রুটি বেগুণভাজা খান!

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! মিন্সে যেন মাখাল ফল।

সকলে ষ্টেষণে যাইয়া দেখেন রজনীতে ষ্টেষণটী বড় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। চারি দিকে আলোক জলিতেছে। এক স্থানে যাত্রীদিগের মাল ওজন হইতেছে। প্লাটফরমে কুলিরা দুই চক্র বিশিষ্ট গাড়ির উপর দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া ঘড় ঘড় শব্দে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। তখন ট্রেণ আসিবার বিলম্ব থাকাতে দেবগণ এক স্থানে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। নারায়ণ বারাকপুরের বাজার হইতে চুরট কিনিয়া আনিয়াছিলেন, এই সময়ে দেশলাই জালিয়া চুরট ধরাইবার উদ্যোগ করিলে পিতামহ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন " দেখ কৃষ্ণ! তুই কি মর্ত্তো এসে সাহেব হলি? আমি সব সহ্য করিতে পারি ও শূকরের গায়ের গন্ধের ন্যায় চুরটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। গন্ধে আমার গা বমি বমি করে, মাথা ধরে।

ফেলে দে নইলে গালে মুখে চড়াব।" নারায়ণ তৎশ্রবণে চুরট টানা রহিত করিলেন।

বরুণ। দেখুন পিতামহ! এই শ্রীরামপুরেই বাঙ্গালার মিসনরিরা বাস করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে মেজর ক্যারে, ওয়ার্ক এবং মার্সম্যান সাহেবই বিখ্যাত। এই মহাত্মাদিগের এই স্থানেই মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহারা এই স্থানেই কবরে আছেন। ইহাঁরা হিন্দু সন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে এক সময় ১০০,০০০ বাইবেল বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মিসনরিগণের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী; যে হেতু ইহাঁদেরই যত্নে ১৮০০ অব্দে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ইহাঁরাই প্রথমে মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরও ইহাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮১৮ অব্দে মার্সম্যান সাহেবের যত্নে "দিগ্‌দর্শন" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীরামপুরের মিসনরিরা ঐ অব্দে "সমাচার দর্পণ" নামে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার করেন। ইহাঁদেরই যত্নে সীসার অক্ষর সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই শ্রীরামপুরে প্রথমে মনোহর দাস মিশনরিদিগের উপদেশক্রমে সীসার অক্ষর প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস উহার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁজির বাঙ্গালা অক্ষর বাঙ্গালা দেশে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

শ্রীরামপুরের অতি সন্নিকটে মাহেশ। মাহেশে রথ ও স্নানযাত্রার সময়ে বড় সমারোহ হইয়া থাকে। ঐ সময়ে কলিকাতার অনেক বাবু বেশ্যা সঙ্গে লইয়া বোট ও ভাউলে ভাড়া করিয়া জলে বাচ খেলেন এবং মদ্য পানে মাতোয়ারা হইয়া বেশ্যার হাত ধরিয়া জগন্নাথের সম্মুখে নৃত্য করেন। মাহেশের জগন্নাথ বড় বিখ্যাত। ইনি এক সময় হাতের বালা বন্ধক রাখিয়া ময়রার দোকানে জল খাইয়াছিলেন। ঐ মাহেশে ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেবের একটী বাগান ছিল। বাগানের ২।১ টী গাছ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মাহেশের পরেই টিটেগড়। টিটেগড়ে পূর্ব্বে জাহাজ প্রস্তুত হইত।

এই সময় ষ্টেষণে যাত্রীরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহাদের কাহারও হস্তে পোটলা ও হুকা কক্ষে, কাহারও হাতে ব্যাগ ও ছড়ি। কোন বাবু স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব

স্ত্রী ও পেটরাদি সঙ্গে ষ্টেষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন স্ত্রীলোক বাবুদের মেয়ের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে, ষ্টেষণে আসিয়া মাথার ধামা নামাইল। মেয়ে অন্তঃসত্বা, এজন্য মেয়ের মা ঐ ধামাতে কয়েকটী কমলালেবু, কতকগুলি বিলাতি কুল, চাট্টি সজ্‌নের ফুল, কুলের আচার, চালিতার এবং আম্রের আচার পাঠাইয়াছেন। একটী হাঁড়িতে কিছু মিষ্টান্নও আছে; কিন্তু হাঁড়ির মুখ এমন শক্ত করে ময়দা দিয়া আঁটা যে, হাড়ি ভাঙ্গিবে তত্রাপি মুখ খুলিবে না। কোন বাবু স্বয়ং আসিয়া স্ত্রীকে দ্বিরাগমনে লইয়া যাইতেছেন। বালিকা এক গলা ঘোমটা দিয়া ফুপায়ে ফুপায়ে কাঁদিতেছে। বালিকার বাপের বাড়ীর পরিচারিকা প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতেছে,—"ও মা ছি! তুই এমন শেয়ানা মেয়ে হয়ে কাঁদছিস কেন? শ্বশুরবাড়ীর লোকে নিন্দে করবে যে।"

ক্রমে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিল. দেবগণ টিকিট কিনিতে যাইয়া দেখেন মস্ত ভীড়। ক্ষুদ্র একটী গহ্বরের নিকট উকি মারিয়া একজন যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উভয় স্কন্ধে প্রায় চৌদ্দটা মাথা ঠেস দিয়া "আমার এক খান হাবড়ার আমার একখান বালির, আমার একখান কোন্নগরের" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তৎপশ্চাতে প্রায় ২৫। ৩০ জন লোক "আমার একখান রিটরণ" "আমার একখান হাফ টিকিট চাই" বলিয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে। ভিতর হইতে টিকিট বিক্রেতা বাবু হস্ত বাহির করিয়া এক এক জনের পয়সা লইতেছেন এবং "খট খট খটাস খটাস খটাস খটাস" শব্দে টিকিট কাটিয়া যাত্রীদিগকে দিতেছেন। যাত্রীদিগের মধ্যে যাহারা পূরা টাকা দিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া পয়সা গণে কম হওয়ায় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

ভীড় কমিলে বরুণ যাইয়া পাঁচ খানি বালির টিকিট কিনিলেন এবং প্রত্যেকে পোট্‌লা পুট্‌লি লইয়া প্লাটফরমে যাইয়া এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, গাড়ী আসিয়া ফেলিয়া যাইতে না পারে। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল, দেবগণও ছুটিয়া গিয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া দেখেন গাড়ির প্রত্যেক কামরায় আলো দেওয়াতে রজনীতে গাড়ি যেন নবসাজে সুসজ্জিভূত হইয়াছে। আরোহিগণ বসিয়া তামাক টানিতেছে এবং নানা প্রকার গল্প করিতেছে।

আবার ট্রেণ ছাড়িল এবং ট্রেণ হুপাহুপ শব্দে কোন্নগরে আসিয়া

উপস্থিত হইল। বরুণ কহিলেন "কেরাণগরের ন্যায় গায় গায় বসতি কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। ট্রেণ আবার ছাড়িল এবং অনতি-বিলম্বে দেবগণকে বালি ষ্টেষণে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

দেবগণ কটকে টিকিট দিয়া বাহিরে যাইলেন এবং সে রাত্রি একটী দোকানঘরে বাসা লইয়া নিশাযাপন করিলেন।

বালি।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেবতারা নগর ভ্রমণে চলিলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—স্তূপাকার মড়ার লেপ, বালিস, ছিন্নবস্ত্র এবং পুরাতন ও জীর্ণ কাগজ রহিয়াছে।

উপ। বরুণ কাকা! এই থান থেকে আমাদের সকলের জন্য এক একটা বালিস ও লেপ কিনে নিলে হয় না? শীতে রাত্রে বড় কষ্ট হয়।

নারা। বরুণ! এখানে এত লেপ কাঁথা কেন?

বরুণ। এই স্থানে বালির কাগজের কল আছে। এই সমস্ত কাঁথা, বালিস ও লেপে কাগজ প্রস্তুত হইবে। পূর্ব্বে এই কলটী গোপী সাহেবের চিনির কল ছিল। তাঁহার লোকসান হওয়ায় কলটী কিছু দিন বন্ধ থাকে। এক্ষণে হ্যাণ্ডার্সন কোম্পানী লইয়া কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন। এই সমস্ত লেপ বালিস প্রভৃতি ঢেঁকীতে কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত হইবে। হল্‌দে রঙ্গের যাবতীয় কাগজই এই বালির কল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ এখানকার কাগজে লিখিলে লেখা চুপসে যাইত বলিয়া কোম্পানীর লোকসান হইতেছিল। এক্ষণে সে দোষ সংশোধন করায় বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ইহাঁদের লাভ হইবার আর একটী বিশেষ কারণ এই পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শ্রীরামপুরের মার্সমান সাহেবের কাগজের কল হইতে কাগজ খরিদ করিতেন, এক্ষণে এই কল হইতে খরিদ করিবার হুকুম দিয়াছেন। স্কটলণ্ড দেশীয় কতিপয় কারিকর দ্বারা কলটী চালিত হইতেছে। ইহাঁদের যে আলোর আবশ্যক হয়, তাহা আপনাদিগের প্রস্তুত করা গ্যাসের দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে।

এখান হইতে সকলে বালির পোলের উপর গিয়া সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ করেছে কি র‍্যা। এ পোলটা প্রস্তুত করিতে না জানি কত টাকাই ব্যয় হইয়াছে?

বরুণ। আজ্ঞে, ইহারই নাম বালির পোল। পোলটী প্রায় দুই হাজার স্তম্ভের উপর অবস্থিতি করিতেছে। এই পোল নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন ৬৫০০০

হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই স্থানে পূর্ব্বে খেয়াঘাট ছিল। খেয়াঘাটে বৎসর বৎসর প্রায় ৩০০০ টাকা আয় হইত।

এখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, পিতামহ! একটী মদের ভাঁটী দেখুন। এই ভাঁটীতে রম নামক এক প্রকার মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মদের ভাঁটীতেই দেশটাকে উৎসন্ন দিলে। ওদিকে দেখুন রেলওয়ে মাল মসলার কারখানা।

এখান হইতে সকলে ঝুলান পোলের উপর যাইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন" বরুণ! করেছে কি! স্তম্ভ নাই, কিছু নাই, পোলটা যেন শূন্যে ঝুলিতেছে!

বরুণ। ইহাঁরই নাম বালির ঝুলান পোল। ইহা কর্ণেল গুডউইন নামক এক জন সাহেব নির্ম্মাণ করান। যত ঝুলান পোল আছে, তন্মধ্যে এইটীই বিখ্যাত।

দেবগন ইহার পর একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর ও পরিষ্কৃত বাড়ী দেখিয়া বারম্বার চাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! এ বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। অক্ষয় কুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তির। ইনি পিতামহের বেদ লইয়া সাত বৎসর কাল তুমুল আন্দোলন করেন এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, বেদ অভ্রান্ত নহে।

ব্রহ্মা। য়্যাঁ! ইহাঁর এমন ক্ষমতা। অতএব বরুণ আমাকে সংক্ষেপে ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত বল?

বরুণ। ইনি নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ চুপী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। ইনি সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত পাঠ শেষ করেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি কলিকাতায় আসেন। বাটীতে পার্শী পড়িতেন। এজন্য কলিকাতায় আসিলে ইহাঁর পিতা এবং আত্মীয়েরা ঐ ভাষায় শিক্ষা দিতে যত্নবান হইলেন। বিবিধ কারণে ইহাঁর ইংরাজী পড়িতে ইচ্ছা হওয়াতে পিতা এবং আত্মীয়বর্গের অনভিমতে খিদিরপুরের একটী মিসনরি স্কুলে ভর্ত্তি হন। খ্রীষ্টানি স্কুলে পড়া দূষণীয়, এজন্য পরে ইহাঁর আত্মীয়েরা গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িতে দেন। তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। আড়াই বৎসর আন্দাজ ইংরাজী শিক্ষা করিলে

ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং সমস্ত সংসার ভার নিজ স্কন্ধে পড়ায় বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াও ইনি অধ্যয়নে বিরত থাকিতেন না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। ঐ সম্বন্ধের পুস্তকাদিই বেশী পড়িতেন এবং জোতিষ শাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন।

ইনি প্রথমে পদ্য লিখিতে চেষ্টা করেন। প্রভাকর পত্রে সেই সমস্ত পদ্য প্রচারিত হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালা ভাষার উত্তমরূপ লিখিতে পারা যাইবে, এই মানসে ইনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৬২ শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি এক খানি ভূগোল প্রণয়ন করেন এবং "বিদ্যাদর্শন" নামক এক খানি মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার হইলে ইনি তাহার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি মেডিকেল কলেজে রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যার উপদেশ শুনিতেন। ইনি বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; চারুপাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, ধর্ম্মনীতি, পদার্থ বিদ্যা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন, বাষ্পীয় রথারোহণবিধি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম। ১৭৭৭ শকে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে গুরুতর মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হইলে কর্ম্ম হইতে অবসর লন। এক্ষণে ইনি এই বালি গ্রামে বাস করিতেছেন। মনুষ্যের বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপাক অবস্থায় ইনি গুরুতর রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের হিত-উদ্দেশে অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই এই পীড়ার মূল কারণ।

দেবগণ দেখিতে দেখিতে ক্রমে উত্তর পাড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন, এই স্থান পূর্ব্বে বালির উত্তরপাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক্ষণে এখানে অনেক ধনী লোক হওয়ায় তাঁহারা উত্তরপাড়াকে একটী স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করেন।

ক্রমে সকলে ডাকঘরের নিকট দিয়া স্কুলের নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, উত্তরপাড়ার স্কুল দেখুন। পল্লীগ্রামে যত স্কুল আছে, তন্মধ্যে এই স্কুলটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা হইতে বৎসর বৎসর অনেক ছাত্র প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। উত্তরপাড়ার ধনাঢ্য ও বিখ্যাত জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ও সাহায্যে এই স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এই বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নিঃস্বার্থভাবে এক খানি তালুক দান করিয়াছেন। ঐ তালুকের আয় হইতে ইহার খরচ উত্তমরূপে চলিতে পারে। স্কুল বাড়ীটী দোতালা এবং চতুষ্পার্শ্বে কম্পাউণ্ড। স্কুলের মধ্যে একটী পুস্তকালয় আছে। পুস্তকালয়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মা। দেখ বরুণ! কলিতে অন্নদান ও বিদ্যাদান অপেক্ষা পুণ্য নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু এই সৎকার্য্য হেতু অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

এখান হইতে সকলে একটী দোতালা বাড়ীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "বরুণ! এ বাড়ীটী কি?"

বরুণ। দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়টীতেও জয়কৃষ্ণ বাবু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানে প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অনেক রোগীকে চিকিৎসালয়ে রাখিয়া বিনা ব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

দেখিতে দেখিতে সকলে উত্তরপাড়া সাধারণ পুস্তকালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, এই বাড়ীতে সাধারণ পুস্তকালয় আছে। বাড়ীটী কলিকাতার টাউনহলের ফ্যাসানে নির্ম্মিত। পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক এত আছে যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন যাবতীয় সাময়িক পত্রাদিও গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পুস্তকালয়টীর খরচের জন্য জয়কৃষ্ণ বাবু নিঃস্বার্থ ভাবে এক খানি তালুক দান করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান লওয়াতে উন্নতিও দিন দিন বাড়িতেছে। পুস্তকালয়ের উপরের গৃহগুলি অতি সুন্দররূপে সাজান আছে। কোন ইংরাজ কিম্বা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে বিনা ভাড়ায় ২।১ মাস পর্য্যন্ত থাকিতে পান।

এখান হইতে সকলে বঙ্গবিদ্যালয় দেখিয়া ভাগীরথী তীরে একটি বাঁধা ঘাটের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তীরে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ঘাট দেখিয়া দেবতারা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "এ দিকের এই ঘাটটি জয়কৃষ্ণ বাবুর এবং ও দিকের ঐ ঘাটটি হরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির।"

দেবতারা হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাটের নিকট যাইয়া দেখেন, একটী সুন্দর গৃহে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ঘাটের দুই পার্শ্বে দুটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছে।

নারা। বরুণ! এই স্থানে স্নান করিলে হয় না?"

"হানি কি" বলিয়া সকলে ঘাটে তলপী তালপা নামাইলেন। উপ ছুটিয়া গিয়া তৈল খরিদ করিয়া আনিল। দেবরাজ তৈল মাখিতে মাখিতে কহিলেন "বরুণ! ঘাটের উপর ঐ প্রকাণ্ড ঘরটা কি?"

বরুণ। উহা গুদাম ঘর। জনাই প্রভৃতি স্থানের মহাজনদের যে সমস্ত মালামাল আমদানী হয় তাহা বালি ষ্টেষণ হইতে আনিয়া এই গুদামে জমা করে, তৎপরে এখান হইতে অবসর মত লইয়া যায়। পূর্ব্বে ষ্টেষণে মালামাল রাখিবার অসুবিধা থাকায় মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইত। জয়কৃষ্ণ বাবু এই গুদাম ঘরটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া বস্তা প্রতি কিছু কিছু কর স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইহাতে মহাজনদিগেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে এবং তাঁহারও লাভ হইতেছে।

স্নানান্তে দেবগণ বাজারে যাইয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন, বাজারের দোকান ঘরগুলি জয়কৃষ্ণ বাবু পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পিতামহ সন্দেশ গালে দিয়া কহিলেন, বরুণ! জয়কৃষ্ণ বাবুর এত কীর্ত্তি দেখিতেছি, ইনি এমন বিপুল ঐশ্বর্য্যের কিরূপে অধিকারী হইলেন?

বরুণ। ইহাঁর পিতার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। রাজকিশোর বাবু কমিসিরিয়েটে কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট নামক ইংরাজী পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই রাজকিশোর বাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ভরতপুর আক্রমণের সময়ে রাজকিশোর বাবু কিছু টাকা পান। ঐ টাকায় দেশে আসিয়া বিষয় খরিদ করিতে থাকেন। তৎপরে পিতাপুত্রের যত্নে ঐ টাকায় এক্ষণে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকার মুনফার বিষয় হইয়াছে।

দেবগণ জলযোগ করিয়া পুনরায় নগর ভ্রমণে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একটী বাড়ী হইতে কতকগুলি ভিখারী স্ত্রীলোক ছুটিয়া পলাইয়া আসিতেছে এবং কহিতেছে "না হয় এক মুঠা ভিক্ষা না দেবে মিন্সে কি বলে কুকুর লেলিয়ে দিলে।"

দেবগণ এক পা এক পা করিয়া জয়কৃষ্ণ বাবুর বাটীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বরুণ। এই জয়কৃষ্ণ বাবুর নিজ বাটী। বাটীর পশ্চিম দিকে কাছারি বাটী। ঐ স্থানে গোপালেশ্বর নামক একটি শিব আছেন। জয়কৃষ্ণ বাবু এক্ষণে অন্ধ হইয়াছেন,কর্ম্মচারির মুখে সকল কথা শুনিয়া বিষয়কার্য্য চালাইতেছেন। বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে এমন উপযুক্ত লোক বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই। ইহাঁর স্মরণশক্তি অসাধারণ। কোন্ তালুকে কোন্ সনে কত টাকা আনা পাই আদায় হইয়াছে, পঞ্চ বৎসর বিনা কাগজ পত্র দৃষ্টে বলিতে পারেন।

দেবগণ আবার চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ পিতামহের কাণে কাণে কি বলিলেন। পিতামহ তৎশ্রবণে "বিষ্ণু! ষ্যাঁ! ব্রহ্মোস্তর!!" বলিয়া নিজ কপালে একটী চপেটাঘাত করিলেন।

তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "জয়কৃষ্ণ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা মৃত রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী দেখুন। ইহাঁর আম গাছে বড় সক ছিল। ঐ গাছের কলম প্রস্তুত করিয়া লোককে বিতরণ করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবু ওদিকে ঐ বাড়িটী করিতেছেন। এমন সুন্দর বাড়ী কলিকাতার মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। বাড়ীটী ৮। ১০ বৎসর হইতে প্রস্তুত হইতেছে, প্রায় ৮। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে এখনও শেষ হয় নাই। বাড়ীতে গির্জ্জার গম্বুজের ন্যায় ঐ একটী অংশ দেখুন, ঐ যে একটী ঘড়ী চলিতেছে দেখিতেছেন, ঐ ঘড়ীটী বাবু, হামিল্টন কোম্পানীর দোকান হইতে সাড়ে চারি হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া আনেন। অত্যুচ্চ গম্বুজের মধ্যে রাখিবার কারণ,দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইবে।

দেবগণ জয়কৃষ্ণ বাবুর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বাড়ী দেখিয়া ষ্টেশণ অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "এক্ষণে বালি ও উত্তরপাড়ায় বিস্তর জমীদার হইয়াছেন এবং ডাক্তার, উকীল, হাকিম, বি এ, এম এ প্রভৃতিরও ছড়াছড়ি হইয়াছে। আজ কাল এখানকার যে মূর্খ সেও ৫০। ৬০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এখানকার লোকে বৃথা আমোদ বা বৃথা বিষয়ের আলোচনা করে না, সর্ব্বদাই বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। এক সময় বালির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তখন

এখানে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য লোকের নাম মাত্র ছিল না। এস্থানের এত উন্নতির মূলই সুপ্রসিদ্ধ লর্ড পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়।

ইন্দ্র। পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে আবার একটা লর্ড কেন?

বরুণ। ইনি এমন পরোপকারী ও সত্যবাদী ছিলেন যে সাহেবেরা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঐ উপাধি প্রদান করেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি লর্ডের জীবন বৃত্তান্ত আমাকে শোনাও।

বরুণ। ইনি ১১৮৫ সালে (১৭৭৮ অব্দে) বালিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া জানবাজারের "ফ্রী" স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন সদাগরের বাড়ীতে সামান্য বেতনে একটী চাকরি করেন। ইহার পর রেভিনিউ আফিসে ১৫ টাকা বেতনে কেরাণী হন। সাহেবেরা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ আফিসে ১০০ এক শত টাকা বেতনের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করেন। ঐ পদ এই প্রথম সৃষ্টি হয়। পদ্মলোচন বাবু এই সময়ে বালিতে বিদ্যালয় না থাকায়, গ্রামস্থ সকলকে অসভ্য ও মূর্খ দেখিয়া নিজের ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে বিনা বেতনে পড়ান হইত। এইরূপে ছাত্রেরা অল্প অল্প লিখিতে ও পড়িতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া গিয়া নিজের আফিসে চাকরী করিয়া দিতেন। সাহেবেরা ইহাঁর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে কহিতেন "আমি যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এক প্রকার চলিতেছে, অতএব আমার অধীনস্থ অল্প বেতনের কেরাণীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে ভাল হয়। সাহেবেরা তাঁহার সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া লর্ড উপাধি প্রদান করেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এবং শেষ বয়সে পেন্সন লইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১২৪৭ সালে (১৮৪০ অব্দে) ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নারা। বালিতে আর আছে কি?

বরুণ। উত্তরপাড়ায় "হিতকরী সভা" নামে একটী সভা আছে। সভাটী ১০। ১৫ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভাটীর উদ্দেশ্য বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে ভরণপোষণ করা এবং

দরিদ্র বালকদিগকে বিনা ব্যয়ে বিদ্যা দান করা। এই সভার দ্বারা দেশের যথেষ্ট হিতসাধন করা হইয়াছে। বালিতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস এবং এখানে অনেকগুলি সংস্কৃত টোল আছে।

সখের দোলযাত্রা।

ফাল্গুন মাসের প্রাতঃকাল; কিন্তু এখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে, নারায়ণ নিজ শয়নকক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি লক্ষ্মীসহ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার শয়নকক্ষের সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। বসন্তকালে পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভা হইয়াছে। কোন বৃক্ষ নব পল্লবে সুশোভিত, কোন বৃক্ষ মুকুলভারে অবনত, এবং কোন কোন বৃক্ষে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। উষাকালে কোকিল সেই পুষ্প গন্ধে মাতোয়ারা হইয়াছিল; এক্ষণে অল্প অল্প বসন্ত-বায়ু গাত্রে লাগাতে সে আনন্দে বিভোর হইয়া "কুহু" "কুহু" শব্দে ডাকিয়া উঠিল। তাহার গলার শব্দ শুনিয়া পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষিসকলও চীৎকার করিতে লাগিল।

পক্ষীর রবে নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি গাত্রের লেপ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। নারায়ণ গাত্র হইতে লেপ খুলিলে লক্ষ্মীর হিম হিম বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহারও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখেন নারায়ণ গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন; তখন তিনিও চক্ষু মুচতে মুচিতে উঠিয়া বসিলেন এবং নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নাথ! এক মনে, এক ধ্যানে গভীর ভাবে এত কি ভাব্‌চো?"

নারা। প্রিয়ে, ফাল্গুন মাস উপস্থিত। এই সময় মর্ত্ত্যে আমার দোলযাত্রা হয়। আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে দোলে গিয়ে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছি। ইদানীন্তন লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকাতে যাওয়াটা একপ্রকার ত্যাগ করেচি বটে, কিন্তু এই সময় মনটা বড় কেঁদে উঠে, সেই জন্যই ভাব্‌চি এবার এক বার গেলে হয়।

ল। দোল আবার পর্ব্ব! তাই তার জন্যে তোমার মনটা বড় কেঁদে উঠে! দেখ নাথ! পৃথিবীতে যত পর্ব্ব আছে তন্মধ্যে এই দোল পর্ব্বটা সকল পর্ব্বের ওঁচা। এই পর্ব্বের উৎসবের মধ্যে, কতকগুলো লোক তোমাকে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে একটা খড় জড়ান মেড়াগাছ পুড়িয়ে

আসে। কেহ কেহ মেয়েদের সন্তোষের জন্য বাই খেমটা দেয়। তার পর কাঁচা ঘুম ভাংতে না ভাংতে আমাদের দুটোকে এনে দোলে চাপয়ে ঘণ্টা নাড়ে, তার নাম দেবদোল। পর দিন কতকগুলো আবির ছড়ায়ে সন্ধ্যার পর কুটকড়াই মুড়কী, চিনির ছাঁচ ও কতকগুলো শশা কলার শেতল খাওয়াইয়া নামুয়ে ফেলে। এই ত পর্ব্ব, এর জন্য তোমার মন কাঁদচে? এস না কেন আমরা ঘরে দোল করি?

না। ঘরে দোল করতে বলচো বটে; কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? প্রিয়ে, চল একবার যাই।

ল। যাবে যাবে বলচো; কিন্তু যাবে কোথায়? আর কি মর্ত্ত্যে আমাদের আদর আছে না মান আছে? আর ত কেউ দেবতা বলে মানে না। বিশেষ ব্রাহ্মেরা আমাদের প্রতি বড় বিমুখ, তাঁরা ঠাকুর শব্দ পর্য্যন্ত বলতে দিচ্চেন না।

না। এটা তোমার অন্যায় কথা। ব্রাহ্মেরা এক সময়ে আমাদের প্রতি বিমুখ ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে অনেকে সদয় হয়েচে। আমি ভাল লোকের মুখে শুনেচি, তাঁহাদের প্রধান প্রচারক আজকাল হরিসংকীর্ত্তন করেন, ব্রাহ্মমন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা নেড়ে আরতি ও হোম করেন। বোধ হয় ২।১ বৎসরের মধ্যে সমাজঘরে আমাদের দোলও করবেন। তবে আর মন্দ বলা যায় কিসে? দেখ প্রিয়ে, চিরদিন সমান যায় না। তুমি দেখতে পাবে ২।৪ বৎসরের মধ্যে পৈতা ফেলা ব্রাহ্মেরাও আবার গোময় খেয়ে পৈতা গলায় পরে আমাদের চরণে ঢিপ ঢিপয়ে প্রণাম করবে। দেখ, এরা বৃন্দাবনের অনেকটা ভাব এনেচে! শুন্তে পাচ্চি কেশব বাবু আমাকে সখিত্বে বরণ করিয়া চসমা চক্ষে বালা হাতে দিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য আবার একটী গান উঠেছেঃ—

> "দেখিলাম অপরূপ নব বিধানে।
> চশমা চক্ষে হাতে বালা নাচে কেশব সেনে॥
> ইত্যাদি"

ল। তবে বল তোমার ষোড়শ সখীর মধ্যে আর একটী সখী বেড়েছে।

নারা। এখন আমার যাবার বিষয় কি আজ্ঞা হয়?

ল। দেখ নাথ! আমার নাম লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মীবন্ত লোকের গৃহেই বিরাজ করি। ঐ লক্ষ্মীবন্ত লোকেরাই দোল ও দুর্গোৎসব করিয়া থাকে।

সুতরাং এক একটা ঘরে একটা একটা পর্ব্ব উপলক্ষে এমন সব ঘটনা হয় যে শুন্‌লে আর যাইতে ইচ্ছা করে না। গত বৎসর গোকুল নগরের রামধন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁহার মেয়ের সখের দোলযাত্রায় যে কাণ্ড হয় শুন্‌লে অবাক হবে।

না। সে কিরূপ?

ল। ঐ রামধন মুখুর্য্যের পদ্মিনী নামে একটী সুন্দরী অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা আছে। পদ্মিনী বাল্যকালে বিধবা হওয়াতে স্বামিসুখ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। মেয়েটী বাপের অত্যন্ত আদুরে। বাপ সেকেলে, লোক, এজন্য মেয়ের মন ভাল থাকিবে ভাবিয়া পাঁচালী,নাটক,বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কুৎসিত কুৎসিত বৈ আনিয়া পড়িতে দেন। ইহার ফল এই হইল, যুবতীর নানারূপ কুপ্রবৃত্তি মনে আসিয়া জুটিতে লাগিল। পল্লিগ্রামের মেয়েরা স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেক পায়। এ জন্য পদ্মিনী বাগানে কাপড় কাচিতে যাইত, সরোবরে গিয়ে স্নান করে আসিত। ঐ পল্লিগ্রামে দামোদর নামে এক লম্পট বাস করে। ক্রমে ক্রমে পদ্মিনীর তাহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মিল। এই কথা গ্রামে রাষ্ট্র; ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় কেবল দামোদর ও পদ্মিনীর নাম। কথাটা বুড়ো রামধন মুখুর্য্যের কাণে উঠিল। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তবে মেয়ের বাটীর বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মেয়ে দুষ্ট সরস্বতীর প্রসাদে দামোদরের সহিত পত্র লিখিয়া পরামর্শ করিল, বাবাকে বলিয়া আমি সখের দোল করি। উৎসব বাড়ীর অবারিত দ্বার। অতএব উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে।

পদ্মিনী নিজ পিতাকে দোল করিবার সখ হয়েছে জানাইলে রামধন স্নেহময়ী কন্যার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পূর্ণিমায় দোল করিবেন স্থির করিলেন এবং ৪। ৫ জনকে বাটীর ঘাস ছুলিতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কোদালে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দে ঘাস ছুলিতেছে। কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ঐ দিক্‌টে ছোল, এ দিকটে ছোল ফরমাজ করিতেছেন। মেয়েও পিতার নিকট দাঁড়াইয়া এ দিকটে ছোল, ও দিক্‌টে ছোল, হুকুম করিতেছে। এই সময় দামোদর হাস্‌তে হাস্‌তে এসে পদ্মিনীর কাছঘেঁসে দাঁড়াইয়া কহিল “জেঠা মহাশয়! আপনার দোল,না পদ্মদিদির দোল?”

রা। (সক্রোধে) যাও যাও বিরক্ত করো না। পদ্মদিদি, পদ্ম যে তোর মা হয়!

প। হ্যাঁ ভাই, দামোদর আমারই দোল।

রা। দেখ্ পদ্ম, তুই যদি ওর সঙ্গে কথা কস, দোল করা বন্ধ করে দেব।

প। কেন, ও প্রতিবেশী সম্বন্ধে ভাই, কথা কব না কেন?

দা। জেঠিমা বলেছেন—ঘরে লোকজন নেই, এক দিন আমাকে এবাড়ীতে থেকে কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে, নিমন্ত্রণ কর্‌তে। জেঠা মহাশয়! জেঠিমা ত ভাল, আপনি অমন নিদয় কেন?

রা। বেটা তুমি কি আমার জামাই? তুই দূর হ। পদ্ম ওর দিকে চাস্‌নে বলচি! তুই বাড়ীর ভিতর যা।

প। কেন? ওকে আমার লজ্জা কি, আমি থাকবো।

দা। জেঠা মহাশয়! আপ্নি আমার উপর এত বাম হলেন কেন?

"তুমি দূর হও।—গেলে না, দাঁড়া শালা, তোকে লাঠিবাজীতে তাড়াতে হবে, বলিয়া রামধন ছুটে যষ্টি আনিতে গেলেন।

প। তুম্মি এখন পলাও,সন্ধ্যার সময়ে চাঁচোড় দেখতে যখন লোক জন আসবে, সেই গোলেতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে চেস্কেলে যে বিচালীর গাদা আছে, তাহাতে লুকায়ে থেকো।

দামোদর এই কথায় পলায়ন করিল, এদিকে রামধনও যষ্টি হস্তে ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে কহিল "তুই ওকে ফুস্ ফুস্ করে কি বলি বল, নইলে এই যষ্টির আঘাতে মেরে ফেল্‌বো।

পদ্মিনী কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। রামধন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিল "পদ্মিনী অধঃপাতে গিয়াছে" লোকের কথা মিথ্যা নহে।

কর্ত্তা দোল করিবেন কি, শয়ন ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে গৃহিণী গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কর্ত্তা এমন করে শুয়ে যে? বেলা আর নাই, পূজাবাটীতে লোক জন আসচে, বাদ্য বাজচে তোমার আর শুয়ে থাকাতো ভাল দেখায় না।

রাম। গিন্নি! পদ্মিনীর চরিত্রের বিষয়ে লোকে যা বলে তাহা সত্য; আজ আমি স্বচক্ষে দেখলাম, দামোদরের সহিত হেসে হেসে গোপনে কি পরামর্শ কল্লে?

গিন্নি গালে হাত দিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বল্লেন "যখন পদ্মীর সাধের

দোলে সম্মত হয়েছ হেসে খেলে কাজ সমাপ্ত কর। দোল শেষ হলে চল আমরা কাশী গিয়ে কাশীবাসী হই।

এই কথায় কর্ত্তা বহির্বাটীতে যাইয়া উৎসবে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার পর যখন চাঁচোড় দেখিতে লোক জন আসিতে লাগিল, দামোদর সেই গোলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঢেকীশালায় বিচালীর গাদাতে আশ্রয় লইল।

পদ্মিনী বাটীর মধ্যে একটী গৃহে নৈবেদ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহার চক্ষু সতত ঢেঙ্কেলের দিকে ছিল। এক্ষণে দামোদরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল এবং কি উপায়ে জল খাওয়াইবে চিন্তা করিতে লাগিল। সে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে দেখে একটা বিড়াল গিয়ে ঢেঙ্কেলে বসিল। তখন দামোদরের জন্য কতকগুলো সন্দেশ, লাড়ু, ক্ষীর অঞ্চলে লইয়া একটা সন্দেশ হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে ঢেঙ্কেলের নিকট গিয়া "খা পুষি খা" বলিয়া হস্তের সন্দেশটী বিড়ালকে দিয়া, ক্ষীর প্রভৃতি দামোদরের মস্তকে ঢালিয়া দিয়া আসিল।

দামোদর বিচালীর গাদায় শুয়ে জল খাচ্চেন, এমন সময়ে রামধন কার্য্যগতিকে ঢেঙ্কেলের নিকট যাইয়া দেখেন, বিড়ালে সন্দেশ খাচ্চে। তিনি উচ্চ স্বরে "পদ্মিনী তোরা কি দেখতে পাচ্চিস নে বেরালে ঘরে গিয়ে সন্দেশ মুখে করে আনচে" বলিয়া এক খানা ইট বিড়ালকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে বিড়াল নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল, ইট খানা ঠিকরাইয়া গিয়া দামোদরের মস্তকে লাগিল। আঘাতে ২। ৪ বিন্দু শোণিতপাতও হইল। কিন্তু কোকরাইবার যো নাই, যে হেতু দামোদর আজ চোর, অতএব সে কিল খেয়ে কিল চুরী করিয়া মনে মনে কহিল "চোরা প্রেমের মুখে ছাই, যাহারা এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের মত জঘন্য প্রবৃত্তির লোক জগতে আর দ্বিতীয় নাই।"

সন্ধ্যার পর বাজনা বাদ্য সকলে করিয়া চাঁচোর করিতে বাহির হইবে, এমন সময়ে রামধন কহিলেন "ঐ যা! দিবসে শরীরটে অসুস্থ হওয়াতে মেড়াগাছ বাঁধা হয় নাই, তোরা বাবা ঐ বাঁশ খান নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢেঙ্কেলে বিচালী আছে, শীঘ্র শীঘ্র একটা মেড়াগাছ বেঁধে আন।

বলতে না বলতে উৎসাহে ২০।২৫ জন লোক সেই বাঁশ হাতে

করিয়া বাটীর ভিতর ছুটে চলিল। পদ্মিনী সুন্দরী দেখিলেন সর্ব্বনাশ! ঢেকিশালায় তাঁহার বন্ধু লুকায়িত আছেন। ইহারা যদি অণুশে টের পায় কীচক বধ করিবে। অতএব তিনি সকলের সম্মুখে যাইয়া কহিলেন "না না সে বিচালী নিয়ে কাজ নেই গঙ্গাজলে ধোয়া নয়। আমি ২।১ আটী ধুয়ে এনে দিচ্চি, ছোট খাট একটী মেড়াগাছ বেঁধে লও। ও সব দিনের কাজ এখন কি হয়?"

তাঁর কথা কেবা শুনে সকলেই উৎসাহে মেতেছিল; অতএব ছুটে গিয়ে বিচালী টানিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহার হস্তে বংশখণ্ড ছিল, গ্রহদোষে দামোদরের গাত্রে তাহার কর স্পর্শ হওয়াতে "ওরে ঐ একটা মানুষ রে" বলিয়া হস্তস্থিত বংশখণ্ড দ্বারা ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। দামোদর কি করে প্রত্যুৎপন্নমতি-বলে ২।৪ ঘা আঘাত খেয়ে মুখে কাপড় ঢেকে চোঁচা দে দৌড়। সেই সমস্ত লোক "বো" "বো" শব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু পল্লি-গ্রামে বন জঙ্গলের অসদ্ভাব না থাকায় সেযাত্রা রক্ষা পাইল।

শব্দ শুনে কর্ত্তা বাটীর ভিতর আসিয়া কহিলেন "পদ্ম কি মা?" পদ্ম কহিল "বাবা! বিচালীর গাদায় একটা চোর লুকয়ে ছিল, পালয়ে গেল।"

রা। তোদের বল্লে ত শুনবি নে,হুশোদিন বলেছি,খিড়কির দ্বারটা যেন সর্ব্বদা বন্ধ থাকে।

"ধর্‌তে পাল্লাম না, পালয়ে বাঁচলো" বলিতে বলিতে সকলে প্রত্যা-গমন করিলে কর্ত্তা কহিলেন "ধরতে পাল্লে না! উঃ! চোরটা আজ কর্ম্ম বাড়ী দেখে সর্ব্বনাশ করবার পন্থায় ছিল।"

মেড়াগাছ বাঁধা হইলে সকলে আলো জালিয়া মেড়াগাছ ঘাড়ে করে, খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যেমন বাহির হইবে, পদ্মিনী সর্ব্বাগ্রে সদর দরজার নিকট গিয়া করযোড়ে গলায় বস্ত্র দিয়া দাঁড়া-ইল। সে ত মেয়ে নয় রামধনের পুরোহিত! সর্ব্বদা আদর করিয়া বলা হইত "পদ্মিনী সুন্দরী আমার রামধনের সাত বেটা। পদ্মিনী দাঁড়া-ইয়া কেবল তাহার বন্ধু দামোদরের কি হইল ভাবিতেছিল, এমন সময়ে দামোদর ধীরে ধীরে পদ্মিনীর নিকট আসিয়া মৃদু স্বরে কহিল "পদ্ম খুব হয়েচে আর না, আমি পীরিতে ইস্তফা দিলাম।"

প। তোমার দোষ কি ভাই! সকলই আমার কপাল! নইলে কি জন্য সক করে দোল করলাম সকলই ত জান?

দা। জানি কিন্তু আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে! বিড়াল মারা ইট খানা মাথায় লাগায় মাথাটা যেন আবের মত ফুলেছে। আর বংশখণ্ডের আঘাতে পিঠের ৪।৫ স্থান কেটে গেছে, অসংখ্য চোঁচ ফুটে আছে। কত কাল যে আরোগ্য হতে যাবে জানি না।

প। আ মরি! মরি! সকলই আমার কপাল, পোড়া কপালে সুখ হবে কেন? যা হোক নিরাশ্বাস হও না, দুঃখ বিনে কখন সুখ হয় না। এক্ষণে আমার পরামর্শ শোন—যেমন সকলে মেড়াগাছ ঘাড়ে করে বাহির হবে। তুমি ঐ ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকো, ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে আর আমিই ভাড়ারী; সুতরাং ঐ ঘরেতেই দুঃখ দূর করবো।"

দা। ভাড়ার ঘরে যদি কেউ যায় লুকাবার স্থান আছে?

প। আমি তোমাকে হাঁড়ি কলসীর মধ্যে এমন করে লুকয়ে রাখবো যে কেউ দেখতে পাবে না।

এদিকে সকলে যেমন বাহির হইয়া গেল, দামোদরও পদ্মিনীর উপদেশ মত ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পদ্মিনী তাহাকে একটা বৃহৎ জালার মধ্যে স্থান দান করিয়া গল্প ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল।

এদিকে সকলে মেড়া পোড়াইয়া প্রত্যাগমন করিলে পদ্ম কিছু সময়ের জন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহিরে যাইল। বাহিরে যাইয়া দেখে কেহ লণ্ঠন টাঙ্গাইতেছে; কেহ বসিয়া গান করিতেছে; রামধনের গুরু সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন। এই সময় কেষ্ট বেপে লোক জন সঙ্গে আবির ঘাড়ে করে এসে কহিল "মহাশয়! আবিরের কথা বলেছিলেন এনেছি।" রামধন "দাঁড়াও একেবারে ভাড়ার ঘরে ঢেলো" পদ্মিনীকে কহিলেন "পদ্ম মা চাবিটে দেও।"

"বাবা চল আমি খুলে দিচ্চি" বলিয়া পদ্ম অগ্রে যাইয়া দ্বার মুক্ত করিল। রামধন কহিলেন "কেষ্ট ঐ ছালটার মধ্যে আবির রাখ।" কৃষ্ণ তৎশ্রবণে ছালার মধ্যে আবির রাখিয়া কহিল "মহাশয় সব যে ধরে না।" কর্ত্তা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন "যা আছে ঐ বড় জালাটায় রাখ।"

পদ্ম দেখিল সর্ব্বনাশ! এইবার তাহার বন্ধুকে বুঝি আবিরে অঙ্গ ঢালিতে হয়; অতএব কহিল "না বাবা, ওতে কাজ নাই, ওটা চাল ডাল রাখার জালা।"

"তাতে দোষ কি? আবির ত আঁস নয় যে জালাটা নষ্ট হবে।" বলিয়া, কৃষ্ণ বেগে হুড় হুড় করে আবির ঢালিতে লাগিল।

রাম। এই আবিরেই হবে কেমন কৃষ্ণ? জালাটায় হাত দিয়ে দেখ দেখি কতটা পর্য্যন্ত আবির হয়েছে।

বলবামাত্র পদ্মিনী হাত দিয়া "আধ জালার কিছু কম হয়েচে, এতেই হবে, এতেই হবে।" বলিয়া কৃষ্ণ বেগেকে হাত দিয়া দেখা হতে ক্ষান্ত করিল।

সুখের বিষয় অল্প আবির ঢালায় দামোদর চাপা পড়িলেন না এবং পদ্মিনীর বুদ্ধির গুণে কৃষ্ণ বেগেও হাত দিয়ে দেখিল না। কর্ত্তা ও কৃষ্ণ বেগে বাহিরে যাইলে পদ্মিনী জালার নিকট দাঁড়াইয়া কহিল "আহা! মরে যাই, কত লুকুয়ে লুকুয়ে ছানা ক্ষীর খাইয়েছি এমন বিপদ, এত ব্যাঘাত ত কখন ঘটে নাই। জালা থেকে বাহির হও,—আছ কেমন?"

দা। চক্ষু দুটী আবিরে অন্ধ হয়েচে। আর কাণের মধ্যে মুখের মধ্যে আধ মোণ আবির গিয়েছে।

প। মুখের মধ্যে গেল কেমন করে?

দা। উপস্থিত বিপদে কি হবে হা করে ভাবছিলাম এমন সময় বেগে বেটা ঢেলে দিয়েচে।

পদ্মিনী হাত ধরিয়া দামোদরকে বাহির করিলে দামোদর কহিল "ঢের হয়েচে পথ দেও পলাই।"

প। ছিঃ! হয়েচে কি? তুমি এত ভীতু কেন, তাই পলাবে? গায়ে দুটো আবির লেগেচে, তা দোলের দিন সকলেরই লেগে থাকে; বিশেষ এ দোল ত তোমারই দোল, তবে পলাতে চাচ্চো কেন? দেখ ভাই, আজকের মত সুবিধা আর হবে না। যখন ২। ৪ টা ফাঁড়া কেটে গেছে এই বার ত সুখের আগমন। আহা! আজ তোমায় আবির মাথায় বড় সুন্দর দেখাচ্চে, বলতে কি যেন পাকা সিন্দুরে আমটী হয়েচ। এস তোমাকে এই কোণের ছেঁড়া দপ গুলোর মধ্যে লুকয়ে রাখি।

দামোদর সপের মধ্যে আশ্রয় লইয়া কহিল "প্রাতে পালাব কেমন করে?"

পদ্ম। রাত্রে সকলে যাত্রা শুন্‌বে বাড়ীর ভিতর কেউ থাকবে না, ভোর ভোর থাকতে আমি তোমাকে খিড়কী দিয়ে পার করবো।

দা। তুমি যাত্রা শুনবে না?

প। এক এক বার গিয়ে শুনে আবার পান সাজবার, বাদাম ভাংবার ছল করে চলে আসবো।

দা। দেখ ভাই, স্ত্রীস্বাধীনতায় কেমন সুখ। তুমি যাই স্বাধীনতা প্রভাবে বাগানে কাপোড় কাচতে, নদীতে গাধুতে যেতে, তাই না এমন অসম্ভব বন্ধুত্ব জন্মাল। যাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাহারা অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক। ভাল, পদ্মসতী আমাদের দুজনে দেশান্তরে পালালে হয় না?

প। পলাব কেন? বুড়ো বাপ মা যে কয় দিন, তার পর আমি পুরাণ সিদ্ধেশ্বরী হয়ে এই ভিটাতে বসে রাম রাজত্ব ভোগ করবো।

এই সময় পদ্মিনীর মাতা ও কতিপয় প্রতিবেশিনী আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। এক রমণী কহিল "হ্যাঁ, পদ্ম একা বসে কি বকছিলি?" মাতা কহিলেন "মা! ওর কি রোগ হয়েচে রাত্রে আমাদের পাশের ঘরে একা শুয়ে সমস্ত রাত্রি কি বকে, এবং আপোন মনে হাসে।" সেই ভয়েতেই দোল করলাম, এখন দোলের প্রসাদে সেরে গেলে ১২ বৎসর দোল করবো।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন একটী ৫। ৭ বৎসরের ছেলে কোলে করে আসিয়াছিল। ছেলেটা মার কোল থেকে নেমে আস্তে আস্তে প্রদীপের নিকট গিয়া কি একটা ধরাইতে লাগিল দেখিয়া মাতা কহিলেন "হ্যাঁরে, কি করচিস?" ছেলেটা আহ্লাদে স্বরে কহিল "ছুঁচো বাজীতে আগুন দিচ্চি, দাদা কিনেছিল চুরী করে এনেছি।" মাতা ব্যগ্রতার সহিত "ফেলে দে" "ফেলে দে" শব্দ করায় বালক থতমত খাইয়া ফেলিয়া দিল। বাজীর পলিতায় তখন আগুন ধরিয়াছিল সেটা "শোঁৎ" "শোঁৎ" শব্দ করে সেই দামোদরের লুকায়িত স্থান ছিন্ন সপের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন জন্য কলসী কলসী গঙ্গা জল ছিল, পদ্মিনী "সর্ব্বনাশ হলো! ও সপ

ধরলে লঙ্কা দগ্ধ হবে।" বলিয়া কলসী কলসী জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন।

আগুন নিবিলে স্ত্রীলোকেরা বাহির হইয়া যাইল। পদ্মিনী কহিল "সখে! কেমন আছে?"

দা। তা বেস। কাপড় খান অর্দ্ধেক পুড়েছে। আর—

প। আহা! মরে যাই আমারই কপাল!

দা। পদ্ম, তোমার পায় পড়ি পথ দেও, পলাই বেশ শিক্ষা পেইচি।

প। আজ আর সুখ হলো না। যা হোক একটু অপেক্ষা কর, বাড়ীর ভিতর সকলে জল খাচ্চে, জল খেয়ে বাহিরে এলে রেখে আস্‌চি। ছিঃ! ছিঃ! আমার মত হতভাগিনী জগতে আর নাই; নচেৎ গোপনে প্রেম কর্‌তে গিয়ে বিফল হবে কেন? এত যোগাযোগ, এত আয়োজন কপাল ক্রমে সকলই বিফল হবে কেন?

এই সময় যাত্রা বসায় বাটী লোকে লোকারণ্য হইল। কর্ত্তা কতিপয় আত্মীয়ের সহিত ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন " ঐ যে কোণে ছেঁড়া সপগুলো গাদা করা আছে, নিয়ে গিয়ে ছোট লোকদের পেতে দেও নচেৎ হিমে ওদের বড় কষ্ট হবে।"

প। বাবা, ওগুলো নিও না। ছিঃ! ও ছেঁড়া সপে কি মানুষে বস্‌তে পারে? লাভের মধ্যে পেতে দিয়ে তোমার এই হবে কুচো কাটী কুড়াতে ৪।৫ টা জোন লাগবে।

আত্মীয়েরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সপ ধরিয়া টানিয়াই কহিল ওরে, একটা মানুষ!! কর্ত্তা য়্যাঁ মানুষ! বলিয়া সবিস্ময়ে এক দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন।

সকলে গোপনে পরামর্শ করিল এ সেই কৃষ্ণ দেমো বেটা। এ অনেক মেয়ের মাথা খেয়েছে। অদ্য আবিরে অভিষেক করা হয়েছে; চল মাঠে নিয়ে গিয়ে কোন গাছে দোল চাপয়ে আসি। ও মলে গ্রাম নিষ্কণ্টক হবে।

সকলে এই পরামর্শ স্থির করিয়া দামোদরের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে, টানাটানি করিতে করিতে অন্দর বাটী দিয়া প্রস্থান করিল। পদ্মিনী একাকিনী গৃহে দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিল " হায়! আজ আমার জন্যে নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণ গেল। আমি আজ

ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হলাম। লোকে পুরুষ জাতির নিন্দা করে বটে; কিন্তু স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষেরা এত অধঃপাতে যায় না। আহা! ওরা ওকে ছেড়ে দিয়ে আমার কেন প্রাণ দণ্ড কর্‌লে না? এখন করি কি?—থানায় গিয়ে খবর দিই।—না, তা হলে আমার পিতারই বিপদ ঘটবে। পিতা আমার কত গুণের পিতা, পদ্ম বল্‌তে অজ্ঞান হন। নিজে না খেয়ে আমাকে ঘটী ঘটী দুধ, বাটী বাটী ক্ষীর খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। এখন করি কি? (চিন্তা) ঐ দা খান হাতে লয়ে বাহির হই। বন্ধু দামোদরের প্রাণ রক্ষা হয় ভাল; নচেৎ ঐ দা নিজের গলায় মেরে তাহার পশ্চাদগামিনী হব।

এইরূপ স্থির করিয়া পদ্মিনী একাকিনী দাত্র হস্তে বাটীর বাহির হইল। এবং সেই সমস্ত লোক মাঠের কোন্ দিকে যাইতেছে, জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করিয়া বনের মধ্য দিয়া সেই দিকে চলিল এবং সন্নিকটস্থ বন হইতে দেখিল সকলে দামোদরের গলায় রজ্জু দিয়া একটা ছাতিম গাছে টাঙ্গাইয়া দিল। উহাদের মধ্যে এক জন কহিল "দুরাত্মা পূর্ব্বে আবিরাভিষিক্ত ছিল, এক্ষণে দোলে উঠিল। চাটি ফুট কড়াই মুড়কী ও ছাঁচ খেতে দিলেই সব দুঃখ নিবারণ হইত।"

সকলে প্রত্যাগমন করিলে পদ্মিনী ধীরে ধীরে যাইয়া হস্তস্থিত দাএর আঘাতে দামোদরের গলরজ্জু ছেদন করিয়া দেখে সে অচৈতন্য। তখন পদ্মিনী ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অঞ্চলের বাতাস দিতে লাগিল! এবং কহিল, প্রাণাধিক দামু! উঠ ভাই! দেখ তোমার অধীনী দাসী পদ্মিনী, সাবিত্রী সতীর ন্যায় তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে। এই বিজন প্রান্তরে আমার বড় ভয় কর্‌চে, তুমি কি বলে নিশ্চিন্ত আছ? উঠ, ভাই।

দামোদরের গল দেশে ফাঁস তাদৃশ না লাগায় এক্ষণে চৈতন্য হইল, সে চাহিয়া দেখে পদ্মিনীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তৎপরে দাঁড়াইয়া এক দিকে চলিল। পদ্মিনী হাত ধরিয়া কহিল, কোথায় যাও?

দা। হাত ছাড়, আমি তোমার নিকট হতে বিদায় লইলাম। এ কাজ আর না, এই দোল যাত্রায় আমার দিব্য জ্ঞান জন্মেছে, যথেষ্ট উপদেশ পেইছি। ভরসা করি, আমায় দেখে আমার ন্যায় লোকেরা শিক্ষা লাভ

করুক। পদ্মিনি! আমার সহিত তোমার এই পর্য্যন্ত। আর মন্দ দৃষ্টিতে চেও না। আমি বিদায় হলাম, আর না।

প। আমিও আজ হতে ক্ষান্ত হলাম; কিন্তু দেশের লোককে বলি—এ সব দোষে প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত করতে পারে। কিন্তু যাহাতে প্রাণ দণ্ড করতে না হয়, যাহাতে বিধবারা নয়নাশ্রু না ফেলে, তার কি কোন উপায় করতে পারে না। বলিয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করিল।

পদ্মিনী দামোদরের নিকট চির বিদায় লইয়া সজল নয়নে ম্লান মুখে ধীরে ধীরে পিতৃভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া দেখে তাহার পিতার আত্মীয়গণ তাহার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। পদ্মিনীকে দেখিয়া একজন দ্রুত আসিয়া হস্ত ধরিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পদ্মিনী ভগ্ন কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে কহিল "তোমরা কলঙ্কিনীকে হত্যা করে সকল যন্ত্রণা দূর কর। আমার আর পৃথিবীতে থাকবার আবশ্যকতা নাই।"

সকলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। পদ্মিনী একটী গৃহে যাইয়া দেখিল, তাহার পিতা বিবর্ণ ও ম্লানমুখে অবনত মস্তকে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। পিতার সন্নিকটে কুশাসনোপরি তাঁহার গুরুদেব উপবিষ্ট। তাঁহারও মুখ বিবর্ণ ও অবনত।

একজন কহিল "কলঙ্কিনীকে আনিয়াছি। এক্ষণে কি ইহার প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হইবে?" "উহু" বলিয়া, গুরুদেব কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে একখানি সাদা ধুতি অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন "ঐ খানি পরাইয়া গাত্রাভরণগুলি খুলিয়া লও। রামধন নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই বিধবা কন্যাকে কামোদ্দীপক অলঙ্কারাদি পরিতে দিয়াছেন।"

সাদা ধুতি পরাইয়া গাত্রাভরণ মোচন করিয়া লইয়া একজন কহিল "ইহার কি মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিকৃত করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়?"

"উহু" বলিয়া পুনরায় গুরুদেব মৌনাবলম্বন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পদ্মিনীর প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া আবার অবনত মস্তকে বলিতে লাগিলেন "অহো! পদ্মিনি" আমি তোমাকে বড় ভাল বাসিতাম, আমি তোমাকে নিজের পুত্র কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করিতাম, আমি তোমাকে কখন পদ্ম ভিন্ন পদ্মিনী বলিয়া ডাকি নাই; কিন্তু পদ্মিনি! আজ কি না তোমার প্রতি আমার চাহিতে ঘৃণা হইতেছে,

তোমার সহিত আমার কথা কহিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। দেখ, তোমার জন্য তোমার পিতার কি অবস্থা! তোমার জন্যে আমার ও ঐ আত্মীয়বর্গের কি অবস্থা! পদ্মিনি! অহো! পদ্মিনি! তুমি কি না এত দিনের পর কলঙ্কিনী হইলে? তুমি কি না এত দিনের পর সোণার সতীত্ব-নিধি বিসর্জ্জন দিলে? যে সতীত্ব বলে সীতা সতী পতিকর্ত্তৃক বারম্বার পরিত্যক্ত হইলেও নিজ মনকে কখন পতিভক্তি হইতে বিচলিত করেন নাই; যে সতীত্ব বলে দময়ন্তী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও পতিভক্তি অচল রাখিয়া সতীত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; যে সতীত্ব বলে সাবিত্রী সতী মৃত পতির প্রাণ দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; পদ্মিনি! তুমি কি না সেই সোণার সতীত্বনিধি বিসর্জ্জন দিয়া আজ লোকের নিকট অসতী নামে পরিচিতা হইলে? তুমি কি না মৃত পতিসহ ভবিষ্যতে মিলিবার আশা ভরসা খোয়াইলে? পদ্মিনি! তুমি জান না, আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার বিনাশ নাই, তবে সময়ে সময়ে অজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন মাত্র। তোমার স্বামী মরেন নাই, তাঁহার পবিত্র আত্মা অজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কতক্ষণে তোমার আত্মা যাইয়া সেই আত্মার সহিত মিলিত হইবে, এই বাঞ্ছায় পথ প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু পদ্মিনি! আর ত তোমার আত্মা, তোমার কলুষিত ও কলঙ্কিত আত্মা সেই পবিত্র আত্মার সহিত মিশিতে পারিবে না? হায়! হায়! তুমি তোমার বুদ্ধি দোষে এক বার স্বামী হারা হইয়াছ, আবার হারাইলে? সতী স্ত্রী স্বামি বিয়োগ হইলে, স্বামী বিয়োগ হইয়াছে মনে করেন না; তিনি ভাবেন স্বামী স্বর্গে আছেন, পুণ্য সঞ্চয় করিলে যাইয়া আবার মিলিতে পারিব। এক্ষণে কেবল পাপে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। সতী এই ভাবিয়া জগদীশ্বরের উপাসনায় মন প্রাণ অর্পণ করিয়া থাকেন। হায়! পদ্মিনী, তুমি নিজ কুবুদ্ধি দোষে কি করিলে?"

পদ্মিনী দাঁড়াইয়াছিল, বসিল। নিস্তব্ধ ছিল, চীৎকার করিয়া কাঁদিল, তাহার ভুনয়নে দর দর ধারা বহিতে লাগিল, করযোড়ে কহিল "গুরুদেব, আমার কি হবে? ঠাকুর আমি ত সুশিক্ষিত নহি, আমি ত কখন সদুপদেশ প্রাপ্ত হই নাই, তাই এমন গর্হিত কাজ করেছি, আমার কি হবে? পিতা আমাকে বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্য যে, আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে হিতাহিত ন্যায় অন্যায়

বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। বরং সেই শিক্ষাই আমার এই অনর্থের মূল হইয়াছে। এখন ভাবচি এ অপেক্ষা আমার অশিক্ষিতা থাকাই ছিল ভাল। ঠাকুর! আমি ত উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হই নাই, কিম্বা আপনার ন্যায় কেউ ত আমাকে এমন সদুপদেশ দেয় নাই, তা'হলে আজ এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।" বলিয়া পদ্মিনী গুরুর পা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং কহিল "গুরুদেব আপনি বল্লেন স্বামী মরেন নাই, তাঁহার আত্মা স্বর্গরাজ্য পরিভ্রমণ করিতেছে এবং কতক্ষণে আমার আত্মা যাইয়া সেই আত্মার সহিত মিলিত হইবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু গুরো! আর ত আমি তাঁকে প্রাপ্ত হইব না? আমার উপায় কি হবে? যখন আপনি আমাকে এত উপদেশ দিলেন, কৃপা করে বলে দিন,—তুষানল প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর কি তাঁকে পাইতে পারিব না? যদি না পাই, আমার দশা কি হবে?

গুরু। তুমি জগদীশ্বরের নিকটে এই বিষয়ের জন্য অনুতাপ কর এবং এক মনে এক ধ্যানে সেই ভগবানের আরাধনায় মন ও প্রাণ অর্পণ কর, তাহা হইলেই তুমি তোমার স্বামীর সহিত মিলিতে পারিবে।

গবাক্ষের দিকে চাহিয়া ঐ যা! বেলা হয়েছে, দেবদোল করা হয় নাই বলিয়া সকলে বাহিরে গেলেন।

লক্ষ্মী নারায়ণকে এই গল্প শুনাইয়া কহিলেন "দেখ নাথ! যদি এমন সব স্থানে গিয়ে পড়, কষ্ট করে যাওয়াই সার হবে ফিরে আসবার পথ পাবে না। যখন তোমার দোলে উঠিবার নিতান্ত সখ হয়েছে, এস আমরা বৈকুণ্ঠেই সখের দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করি। দোল কবে?

না। ২১ এ ফাল্গুন শনিবার।

ল। সর্ব্বনাশ! শনিবারে যেতে আছে! তার পর দিন রবিবার মাতালেরা মদ খেয়ে দোল বাড়ী রসাতল করবে।

নারায়ণ লক্ষ্মীর কথায় সম্মত হইয়া বৈকুণ্ঠেই সখের দোলযাত্রা সম্পন্ন করিলেন এবং দেবগণকে লইয়া তেল নুণ মেখে লঙ্কা দিয়ে ফুট কড়াই মুড়কী ও ছাঁচ গালে দিয়ে জল পান করিলেন। ঐ দিন বৈকুণ্ঠের রাস্তা ঘাট লালে লাল হইয়া গেল!

শ্রীদুর্গাচরণ রায়—জামালপুর।

মনুসংহিতা।

সপ্তম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে দুর্গনির্ম্মাণের উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং॥ ৭০॥

রাজা নিম্নলিখিত কয় প্রকার দুর্গের অন্যতর আশ্রয় করিয়া নগরে বাস করিবেন। (১) ধন্বদুর্গ—চতুর্দ্দিকে পাঁচ যোজন জলহীন মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। (২) মহীদুর্গ—চতুর্দ্দিকে পাষাণ ইষ্টকাদিময় প্রাচীরে বেষ্টিত। ঐ প্রাচীর বার হাত বা ততোধিক উচ্চ হইবে। ঐ প্রাচীরের মস্তক এরূপ প্রশস্ত হইবে যে সেনাগণ অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। আর, ঐ প্রাচীরে আবরণ ও গবাক্ষাদি থাকিবে। (৩) জলদুর্গ—চতুর্দ্দিকে অগাধ জল দ্বারা বেষ্টিত। (৪) বৃক্ষনির্ম্মিত দুর্গ—চতুর্দ্দিকে এক যোজন স্থান ব্যাপিয়া বৃক্ষ কণ্টকময় গুল্ম লতাদি দ্বারা বেষ্টিত। (৫) নৃদুর্গ—চতুর্দ্দিকে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি দ্বারা রক্ষিত। (৬) গিরিদুর্গ—অতি দুরারোহ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। একটী মাত্র পথ থাকিবে। অভ্যন্তরে নানা জাতীয় শস্য ও নদী প্রস্রবণাদি থাকিবে।

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বহুগুণ্যেন গিরিদুর্গো বিশিষ্যতে॥ ৭১॥

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গেই দুর্গোচিত বহু গুণ আছে। উহা সকল দুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পর্ব্বত দুর্গের বহু গুণ এই, বিপক্ষগণকে বহু কষ্টে উহাতে আরোহণ করিতে হয় এবং শৈলস্থ সেনাগণ অল্প প্রয়াসে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বহু বিপক্ষ বিনাশ করিতে পারে।

ত্রীণ্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্ত্বেষাং মৃগগর্ত্তাশ্রয়াপ্চরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামরাঃ॥ ৭২॥

মৃগ মূষিক নক্রাদি প্রথম তিনটী দুর্গ এবং বানর মনুষ্য ও দেবতা শেষ তিনটী দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকে। মরুদুর্গে মৃগের, মহীদুর্গে মূষিকের, জলদুর্গে জলচর নক্রাদির, বৃক্ষদুর্গে বানরের, নৃদুর্গে মনুষ্যের এবং গিরিদুর্গে দেবতার আশ্রয়।

যথা দুর্গাশ্রিতানেতান্নোপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথারয়োন হিংসন্তি নৃপং দুর্গসমাশ্রিতং॥ ৭৩॥

যেমন ব্যাধাদি দুর্গাশ্রিত মৃগাদির হিংসা করিতে পারে না, তেমনি বিপক্ষ রাজগণ দুর্গাশ্রিত রাজার অনিষ্ট সধনে সমর্থ হয় না।

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থোধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশ সহস্রাণি তস্মাৎ দুর্গং বিধীয়তে॥ ৭৪॥

যেহেতু প্রাকারস্থ এক জন ধনুর্দ্ধর নিম্নস্থ শতসংখ্য শত্রুর সহিত এবং প্রাকারস্থ এক শত ধনুর্ধর দশ হাজার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে শক্ত হয়, অতএব দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করা একান্ত আবশ্যক।

তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈ র্যবসেনোদকেন চ॥ ৭৫॥

দুর্গমধ্যে নানা প্রকার অস্ত্র, ধন ধান্য হস্তী অশ্বাদি, ব্রাহ্মণ, শিল্পী, যন্ত্র এবং তৃণাদি ও জল প্রচুর পরিমাণে রাখিবে।

তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েৎ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥ ৭৬॥

রাজা সেই দুর্গ মধ্যে নিজের থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করাইবেন। সেই বাটী আবার প্রাকার পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত ও সুধাধবলিত হইবে। সেই বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীগণের বাসগৃহ, অস্ত্রাদিগৃহ ও দেবগৃহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ম্মিত হইবে। তথায় সকল ঋতুতে সুলভ এমন ফলপুষ্পাদির সমাবেশ, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষাদি থাকিবে।

তদধ্যাস্যোদ্বহেৎ ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাং॥ ৭৭॥

রাজা সেই স্থানে বাস করিয়া সজাতীয় শুভলক্ষণসম্পন্ন মহৎ কুলে উৎপন্ন রূপগুণযুক্ত মনোহারিণী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজং।
তেহস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈতানিকানি চ॥ ৭৮॥

রাজা পুরোহিত ও ঋত্বিক নিয়োজিত করিবেন। তাঁহারা তাঁহার গৃহ্যকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

যজেত রাজা ক্রতুভির্ব্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্ম্মার্থ ঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ ভোগান্ ধনানি চ॥ ৭৯॥

রাজা প্রচুর দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধাদি নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ধর্ম্মোদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকার গৃহশয্যাদি ভোগ্য দ্রব্য ও হিরণ্য রজতাদি ধন দান করিবেন।

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েৎ বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরোলোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥ ৮০ ॥

রাজা করস্বরূপ বর্ষে বর্ষে যে ধান্যাদি পান, তাহা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা আনাইবেন। শাস্ত্রে করগ্রহণের যে উপদেশ আছে, তদনুসারে কর গ্রহণ করিবেন এবং প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবেন।

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাং ॥ ৮১ ॥

রাজা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দর্শনার্থ নানাপ্রকার অধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন। তাঁহারা কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন।

আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকোভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়োহোষ নিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে ॥ ৮২ ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ গার্হস্থধর্ম্মাবলম্বী হইবার মানসে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হন, রাজা ধন ধান্যাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিবেন। যে হেতু শাস্ত্রকারেরা এই ধন ধান্যাদি দানকে অক্ষয়নিধি বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

ন তং স্তেনানচামিত্রাহরন্তি নচ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞানিধাতব্যোব্রাহ্মণেষক্ষয়োনিধিঃ ॥ ৮৩ ॥

ব্রাহ্মণে যে ধন ধন্যাদি নিহিত হয়, তাহা চোরে ও শত্রুতে অপহরণ করিতে পারে না এবং নিধান স্থান জানিতে না পারিলেও বিনষ্ট হয় না। অতএব ব্রাহ্মণে ধনরূপ অক্ষয় নিধি নিহিত করিবে।

ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যোব্রাহ্মণস্য মুখে হুতং ॥ ৮৪ ॥

অগ্নিতে যে হোম করা হয়, সেই হব্য দ্রব্য কখন নিম্নে পতিত হয়, কখন শুষ্ক হয়, কখন বা বিনষ্ট হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলে ঐ সকল দোষ ঘটে না। অতএব ব্রাহ্মণের মুখে হোম করা অগ্নিহোত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের হস্তই মুখস্বরূপ। ব্রাহ্মণের মুখে হোম, ইহার

অর্থ এই ব্রাহ্মণহস্তে দান করা। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই ব্রাহ্মণ হস্তে দান করা অগ্নি হোত্রাদি কার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥ ৮৫॥

ব্রাহ্মণভিন্ন ক্ষত্রিয়াদিকে দান করিলে তাহার ফলের ইতর বিশেষ হয় না, অর্থাৎ যে দ্রব্যের দানে যে ফল শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার অধিক বা ন্যূন হয় না। যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে দান করিলে ক্ষত্রিয়াদিকে দান করা অপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়। আর যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্রাহ্মণ বেদপরাগ অর্থাৎ বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়।

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্ধধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলং॥ ৮৬॥

পাত্রবিশেষে দান করিলে এবং তদনুরূপ শ্রদ্ধা থাকিলে পর লোকে দানের অল্প বা বহু ফল লাভ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, অধিকবিদ্য ব্যক্তিকে দান করিলে অধিক ফল এবং অল্পবিদ্য ব্যক্তিকে দান করিলে অল্প ফল লাভ হইয়া থাকে।

সমোত্তমাধমৈর্রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সাংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ৮৭॥

যে রাজা প্রজা পালন করিতেছেন, সমবল হউক অধিকবল হউক অথবা হীনবল হউক বিপক্ষ রাজা যদি তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তিনি ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম এই, অন্যে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে।

সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরং॥ ৮৮॥

আহূত হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত না হওয়, প্রজা পালনকরা এবং ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা, এই তিনটী রাজার শ্রেয়স্কর। এই তিনটী কার্য্য দ্বারা রাজার স্বর্গাদি শ্রেয়োলাভ হয়।

আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ ৮৯॥

যাঁহারা যুদ্ধেতে পরস্পর স্পর্দ্ধমান ও হননেচ্ছু হইয়া যদি শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন, এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হন, তাহা হইলে স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥ ৯০॥

কূট অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আঘাত করিবে না। যে শরের ফলা কর্ণের আকার বিশিষ্ট কিম্বা বিষাক্ত কিম্বা অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত, তাহা লইয়া যুদ্ধ করিবে না। টীকাকার বলেন, কূট অস্ত্র শব্দের অর্থ এই, যে অস্ত্র বাহিরে দেখিতে কাষ্ঠময়, অথচ যাহার ভিতরে শাণিত লৌহাস্ত্র থাকে, তাহাকে কূট অস্ত্র বলে।

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনং॥ ৯১॥

রথস্থ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠকে হনন করিবে না। নপুংসক, বদ্ধাঞ্জলি, মুক্তকেশ ও উপবিষ্ট ব্যক্তিরাও বধযোগ্য নহে। আর, যে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমারই, তাহাকেও হনন করা কর্ত্তব্য নয়।

ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং, ন নিরায়ুধং।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতং॥ ৯২॥

সুপ্ত, পরিত্যক্তবর্ম্ম, বিবস্ত্র এবং নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হনন করিবে না। আর, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে না, যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ দর্শন করিতেছে এবং যে ব্যক্তি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকেও হনন করিবে না।

নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতং।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ৯৩॥

রাজা সাধু ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ভগ্নাস্ত্র, পুত্রাদিশোকে কাতর, বহু প্রহারে জর্জ্জর, ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে হনন করিবেন না।

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যৎ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥ ৯৪॥

যে যোদ্ধা ভয়হেতু সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহার ভরণ-পোষণ-কর্ত্তা প্রভুর যে কিছু পাপ থাকে, সেই ব্যক্তি সে সমস্ত পাপের ভাগী হইয়া থাকে।

যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিৎ অমুত্রার্থমুপার্জ্জিতং।
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥ ৯৫॥

যে ব্যক্তি সংগ্রামবিমুখ হইয়া নিহত হয়, তাহার পরলোকে সদ্গতি লাভের উপায়ভূত যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জিত থাকে, তাহার প্রভু সে সমুদায় প্রাপ্ত হন।

রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ॥ ৯৬॥

রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, বস্ত্রাদি, ধন, ধান্য, গবাদিপশু, দাসী, গুড়লবণাদি আর আর দ্রব্য, স্বর্ণ রজত ভিন্ন তাম্রাদি, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে যে দ্রব্য জয় করে, তাহা তাহারই হয়। স্বর্ণ ও রজত রাজার লভ্য।

রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্ব্বযোধেভ্যোদাতব্যমপৃথক্ জিতং॥ ৯৭॥

শ্রুতি আছে, রাজাকে যুদ্ধলব্ধ ধন হইতে উদ্ধার দিতে হইবে; রাজাও যোদ্ধৃগণের সহিত মিলিত হইয়া যখন যুদ্ধ করিবেন, তখন যুদ্ধে যে যে দ্রব্য লব্ধ হইবে, তাহা তাঁহাকে যোধগণের পৌরুষ অনুসারে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। টীকাকার বলেন, যুদ্ধলব্ধ ধনের মধ্যে স্বর্ণ রজত ভূম্যাদি যেগুলি উৎকৃষ্ট, উদ্ধার শব্দে সেই গুলি বুঝাইবে।

এষোঽনুপস্কৃতঃ প্রোক্তোযোধধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মাৎ ধর্ম্মাৎ ন চ্যবেত ক্ষত্রিয়োঘ্নন্ রণে রিপূন্॥ ৯৮॥

যোদ্ধাদিগের এই অনিন্দিত নিত্য ধর্ম্ম বলা হইল, ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধ স্থলে শত্রু বধ করিবেন, তখন তিনি এ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না।

পত্র দ্বারা রস শোষণ।

শোষণ ও সমুৎসর্গই প্রাণবান্ পদার্থের দেহ ধারণের প্রধান সাধন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জন্তুদিগের প্রাণ এবং উদ্ভিজ্জাদির জীবন দুটী বিভিন্ন পদার্থ, তাহাদের জীবনধারণের উপায়ও বিভিন্ন। কিন্তু অন্তশ্চক্ষে দৃষ্টি করিলে অনেক স্থলে বহিশ্চক্ষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখানে উদ্ভিজ্জ তত্ত্বের অন্যান্য বিষয় উল্লিখিত হইতেছে না, বৃক্ষাদির পত্র দ্বারা রস শোষিত হইতে পারে কি না, তাহাই এই প্রস্তাবের আলোচ্য। বৃক্ষ-পত্রে জলবিন্দু এবং শিশির-কণা আশোষিত হয়, তৎসম্বন্ধে এতদ্দেশীয় কৃষক এবং উদ্যানের মালিদিগের কাহার কোন আপত্তি নাই। তাহারা গ্রীষ্মের আতিশয্যে পত্রে এবং ফলগর্ভ আম্রের মুকুলে জলাভিষেক

করে, তদ্দ্বারা পত্র সরস এবং নীলোজ্জ্বলকান্তিসংযুক্ত হইয়া উঠে এবং ফলের বৃন্ত দৃঢ় হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই সর্ব্বপ্রকার নবাবিষ্কারে অগ্রসর; তাহারা সূত্র বুঝে না; কারণতত্ত্বে তাহাদের অধিকার নাই; অভিজ্ঞতা তাহাদের বুদ্ধির নিয়ন্ত্রী, অভিজ্ঞতাবলে তাহারা কোথাও কার্য্য কোথাও তাহার ফল বুঝিতে পারে। গোষ্ঠের গোপালেরাই প্রথমে গ্রহ নক্ষত্রের গতি স্থির করিয়াছে, নাবিকেরাই অগ্রে সামুদ্রিক জলের অবস্থা বুঝিয়াছে, কৃষকেরাই সর্ব্বাদৌ মেঘ ও বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ নির্ণয় করিয়াছে। পত্রে রস শোষিত হয় কি না, তাহাও উদ্যানের মালীরা স্থির করিয়াছে। তাহারা উদ্ভিজ্জতত্ত্বে পণ্ডিত নহে, তবু সহজ বুদ্ধিবলে উদ্ভিজ্জতত্ত্বের অনেক বিষয় তাহারা জ্ঞাত আছে।

ইউরোপীয় কৃষক এবং মালীরা পত্রের রস-শোষিকা শক্তি স্বীকার করিয়া থাকে। তথায় কৃষকেরা শস্যাদিকে সরসাবস্থায় গৃহে আনিবার নিমিত্ত তাহাতে জলসেক করে। মালিরাও পিচকারী দ্বারা পত্রে জল সিঞ্চন করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা পত্রের ধূলি ধৌত হইয়া রসে তেজস্বান্ এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ১৭২৭ খৃঃ অব্দে হেল্স সাহেব বিস্তর গবেষণা এবং পরীক্ষা দ্বারা মালী এবং কৃষকদিগের মত বলবৎ জ্ঞান করেন; অতঃপর ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে বন্নেটনামক জনৈক উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনেক পরীক্ষার পর হেল্স সাহেবের যুক্তি অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া যান। কিন্তু ১৮৪৭ সালে ডসার্টার নামক এক ব্যক্তি স্থির করেন যে, পত্রের কিছুমাত্র রস শোষিকা শক্তি নাই, তৎপরে অনেকেই সেই মতের পক্ষপাতী হন। ডি ক্যাণ্ডোল এবং সাস সাহেব বলেন যে, অনেকগুলি বৃক্ষের এবং লতার পত্র রৌদ্রের সন্তাপে ম্লান হইয়া যায়, পুনর্ব্বার সায়ংকালে উহা প্রফুল্ল ও সতেজ হইয়া উঠে। তদ্দ্বারা পত্রের রস শোষিকা শক্তি স্বীকার করা যায় না। দিবাভাগে সূর্য্যতাপে মূলের রসস্বল্পতা জন্মে, পরে রাত্রিকালে আবার আর্দ্র-বায়ুসংযোগে মৃত্তিকা রসযুক্ত হইলে বৃক্ষের ও লতার মূলদেশ দিয়া রসরাশি পত্রে পত্রে সঞ্চরণ করে; তন্নিবন্ধন যাবতীয় পত্র পুনর্ব্বার উন্নমিত হইয়া উঠে। ম্যাক সাহেব নিশ্চিত করিয়াছেন যে, আলোকে রাখিলে বৃক্ষের রস পত্র দিয়া নির্গত হইয়া যায়। বাস্তবিক এই যুক্তি অপ্রামাণিক নহে; পত্রবৃন্ত শোষক কাগজে কিম্বা ফ্লানাল বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষুদ্র তরুর মূল সমীপস্থ পত্রগুলি শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। তাহার কারণ এই,

মূল দিয়া যতটুকু রস বৃক্ষে নীত হয় শোষক কাগজ কিম্বা ফ্লানেল কাগজ পত্ররন্ধ্রে জড়িত থাকায় তদপেক্ষা অধিক রস সমুৎসৃষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং বৃক্ষের যথোপযুক্ত পরিশোষণ হইতে পায় না।

যাহারা পত্রের রস-শোষিকা শক্তি অমান্য করেন, তাঁহাদের মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। লাউ, শিম প্রভৃতি লতার পত্রগুলি রৌদ্রের উত্তাপে ম্লান হইয়া পড়ে, পরে সায়ন্তন শিশির লাগিলে আবার স্ফূর্ত্তিমান্ হয়। লতার মূলে মৃত্তিকা রাত্রিকালে রসার্দ্র হয় বলিয়া যে নিস্তেজ পত্র সতেজ হয়, তাহা কিছুতে যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাতঃকালে তার মূল দেশ উত্তমরূপে জলাবসিক্ত রাখিলে পত্রগুলি আউতিয়া পড়ে। এমনস্থলে মূলে রসের অসদ্ভাব নাই তবু পত্র কেন ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া যায়? অবশ্যই তবে অন্য কোন কারণ আছে? কিন্তু সে কারণ আর কিছুই নয়, পত্রের রস নির্গত হইয়া যাওয়াই উহার এক মাত্র কারণ। পরে সায়ংকালীন শিশির বিন্দু আশোষিত হইলে পত্রগুলি পুনর্ব্বার নবজীবন লাভ করিয়া তেজে ঢল ঢল করিতে থাকে।

কোন বৃক্ষের পত্র ছিঁড়িয়া একটী পত্র শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দাও এবং আর একটী পত্র জলে রাখ। শুষ্ক স্থানের পত্র সত্বর নীরস হইয়া যাইবে, কিন্তু জলস্থিত পত্রটী শীঘ্র নষ্ট হইবে না। তাহার স্বাভাবিক হারিতবর্ণ অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। আবার আর একটী কৌতুক দেখ, একটী পত্রের কিয়দংশ জলে এবং কিয়দংশ স্থলে রাখ। শুষ্ক স্থানের পত্রাপেক্ষা এই স্থলের অংশও অনেক দিন জীবিত থাকিবে, এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, পত্রের এক স্থান হইতে অন্যত্র রস চালিত হয়। শুষ্ক মৃত্তিকায় একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া অনবরত তাহার পত্রে জলাভিষেক করিলে সেই বৃক্ষটী অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে, কারণ পত্র দিয়া মূলেও রস সঞ্চরণ করে। ফলতঃ বৃক্ষের এক স্থান হইতে কি অধঃ কি উর্দ্ধ সকলদিকেই রস সঞ্চালন হয়। কেবল নিম্নভাগ হইতে বৃক্ষের শিখাভিমুখে রসের গতি থাকিলে পত্রে জল সিঞ্চন করিলে কখনই বৃক্ষ জীবিত থাকিত না।

পুষ্পগুচ্ছের বৃন্তগুলি জলমগ্ন রাখিলে সাত আট দিন পর্য্যন্ত তাহা মলিন হয় না। বৃন্তমূল দিয়া রস পুষ্পের তাবৎ দলে এবং কেশরে সঞ্চরণ করে, তজ্জন্য তাহার শোভারও ব্যতিক্রম ঘটে না। কোন কোন পুষ্পের কুঁড়ি তুলিয়া জলে রাখিলে যথাকালে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পের বৃন্তে এবং দলে

রস শোষিত না হইলে এরূপে বিকসিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অপরাহ্লে বৃক্ষের সতেজ পত্র চয়ন করিয়া তিন চারি ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহার গুরুত্বের হ্রাস হয়, কিন্তু সমস্ত রাত্রি নীহারে রাখিলে পত্রগুলি পুনর্ব্বার তেজস্বান্ হয়, তখন শিশির মুছিয়া ওজন করিলে পূর্ব্ব দিনের রৌদ্রে শুষ্কাবস্থাপেক্ষা গুরুত্বের আধিক্য উপলিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আরও দেখা যায়, শুষ্ক মৃত্তিকার বৃক্ষের দুই তিনটী শাখা নম্র করিয়া জলে মগ্ন রাখিলে বৃক্ষটী কিয়ৎকাল জীবিত থাকে; কিন্তু এই প্রক্রিয়া না করিলে শীঘ্র ম্লান হইয়া যায়।

এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বৃক্ষের পত্রাদি দ্বারা রস শোষিত হয়। বায়ু সহযোগে যাবক্ষারিক জান্তব পদার্থ বিমিশ্রিত হইয়া আছে; জীবমাত্রে যেমন অম্লজান বায়ু খাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, ঐ যাবক্ষারিক জান্তব পদার্থও তদ্রূপ উদ্ভিজ্জ জীবনের পক্ষে পরম হিতকর। বৃক্ষ লতাদি পত্র দ্বারা উহাকে শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। জীবেরও প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য দ্রব্যে যবক্ষার একটী প্রধান উপাদান। খাদ্য সামগ্রীতে এই ক্ষারাংশ না থাকিলে জীবের দেহ শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বায়ুতেও সেই ক্ষারাংশ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ জগতে একটী মহাপ্রলয় ঘটিত।

যে সমস্ত দ্রব্যের রসশোষিকা শক্তি আছে, তাহাদের সংস্পর্শে কোন রসাক্ত দ্রব্য রাখিলে তাহার রস শোষণ করিয়া লয়। ফ্লানাল বস্ত্রের রসশোষিকা শক্তি আছে, তন্নিমিত্ত গাত্রের উপর উহা পরিধান করিলে রক্তের রসভাগ অনেকাংশে আকর্ষণ করিয়া লয়; সুতরাং শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পত্র কিঞ্চিৎ রসশূন্য হইলে তাহার উপর মশকাদি কোমলাঙ্গ জীব অধিক ক্ষণ একভাবে উপবিষ্ট থাকিলে পত্রমধ্যে উহার রস চালিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন পত্রজালকও অন্তর্ব্বাহ এবং বহির্ব্বাহ ক্রিয়া দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে কীটাদির রস আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিচ জান্তব ঝিল্লিতে এই ক্রিয়ার আধিক্য দেখা যায়; কিন্তু ঔদ্ভিজ্জ জালকেও এ ক্রিয়ার অভাব নাই। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, পত্রের বহিশ্চর্ম্ম বিশ্লিষ্ট হইলে সচ্ছিদ্র জালক ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; তবে রসাদির অন্তঃপ্রবেশের সম্ভাবনা কই? আমরা বলি, পত্র শুষ্ক হইলে যথেষ্ট হইল, তখন উহার দ্বারা অনায়াসে রস

আকৃষ্ট হইতে পারে। ডারুইন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বৃক্ষের পত্র জান্তব দ্রব্য শোষণ ও পরিপাক করিতে পারে। যেরূপ প্রতিপাদিত হইল, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহাদের যুক্তি অপ্রামাণিক নহে। শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অবিদ্যা পুরুষের বন্ধের কারণ নয়, এক্ষণে সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া সূত্রকার বিশদরূপে বিপক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন।

নাবিদ্যাশক্তিযোগোনিঃসঙ্গস্য ॥ ১৩ ॥ সূ ॥

পরে প্রাহুঃ প্রধানং নাস্তি কিন্তু জ্ঞাননাশ্যাবিদ্যাখ্যা শক্তিশ্চেতনে তিষ্ঠতি অতএব চেতনস্য বন্ধস্তন্নাশে চ মোক্ষ ইতি। তত্রেদমুচ্যতে। নিঃসঙ্গতয়া চেতনস্যাবিদ্যাশক্তিযোগঃ সাক্ষান্ন সম্ভবতীতি। অবিদ্যাহ্যস্মিংস্তদাকারতা সা চ বিকারবিশেষোঽধিকারে হেতুসংযোগরূপং সঙ্গং বিনা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

বিপক্ষ পক্ষ বলেন, প্রধান নামে কোন পদার্থ নাই, জ্ঞাননাশ্য অবিদ্যা নামে এক শক্তি আছে। পুরুষে তাহার যোগ হইলে পুরুষের বন্ধন হয়, আর বিয়োগে মোক্ষ হয়। ইহাতে সূত্রকার কহিতেছেন, এ কথা সঙ্গত নয়। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ। তাহাতে অবিদ্যা শক্তিযোগ হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে তাহার নিঃসঙ্গতা থাকে না।

তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোঽন্যাশ্রয়ত্বং ॥ ১৪ ॥ সূ ॥

অবিদ্যাযোগাদবিদ্যাসিদ্ধৌ চান্যোঽন্যাশ্রয়ত্বমাত্মাশ্রয়ত্বং অনবস্থা বেতি শেষঃ ॥ ভা ॥

উপরে যেরূপ বলা হইল, তাহাতে পুরুষের অবিদ্যা সম্পর্কসিদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু যদি বল অবিদ্যাবশে অবিদ্যাসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ও অনবস্থা দোষ ঘটিয়া উঠে।

ভাল এই কথা বলিব, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনবস্থা দোষে হানি হয় না। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥ সূ ॥

বীজাঙ্কুরবদনবস্থা ন সম্ভবতি পুরুষাণাং সংসারস্যাবিদ্যাদ্যখিলানর্থ-রূপস্যাদিমত্ত্বশ্রুতেঃ। প্রলয়সুষুপ্ত্যাদাবভাবশ্রবণাদিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানঘন এবৈ-তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতীত্যাদিশ্রুতিভির্হি প্রলয়াদৌ বুদ্ধিবৃত্ত্যভাবেন তদৌপাধিকাবিদ্যাবিদ্যাদ্যখিলসংসারশূন্যচিন্মাত্রত্বং পুরু-ষাণাং সিদ্ধমিতি। তস্মাদবিদ্যাপ্যাবিদ্যকীতি বাঙমাত্রং॥ ভা॥

বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, আবার অঙ্কুর হইতে বীজ জন্মিয়া বৃক্ষ হয়, এখানে যেরূপ অনবস্থা আছে, অর্থাৎ বীজাঙ্কুরের আদিকাল নির্দ্দিষ্ট নাই। পুরুষের সংসার সিদ্ধির স্থলে সেরূপ অনবস্থা ঘটে না। কারণ, পুরুষের অখিল অনর্থের মূল যে সংসার, তদাশ্রয়ের একটী আদিকাল শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভাল এই কথা বলিব, বিদ্যা ভিন্নই অবিদ্যা।

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ॥ ১৬॥ সূ॥

যদি বিদ্যান্যত্বমেবাবিদ্যাশব্দার্থস্তর্হি তস্য জ্ঞাননাশ্যতয়া ব্রহ্মণ আত্ম-নোঽপি বাধো নাশঃ প্রসজ্যতে বিদ্যাভিন্নত্বাদিত্যর্থঃ॥ ভা॥

বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা, অবিদ্যা শব্দের এরূপ অর্থ করিলে আত্মার বিনাশ ঘটিয়া উঠে। কারণ, অবিদ্যা জ্ঞাননাশ্য, আত্মা যখন অবিদ্যা শব্দের অন্ত-র্গত হইতেছেন, তখন জ্ঞানদ্বারা তাঁহারও বিনাশ প্রসক্তি হয়।

অবাধে নৈষ্ফল্যং॥ ১৭॥ সূ॥

যদি ত্ববিদ্যারূপমপি বিদ্যয়া ন বাধ্যেত তর্হি বিদ্যাবৈফল্যং। অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ভা॥

আত্মবিনাশ হয় না, এ কথা বলিলে বিদ্যার বৈফল্য ঘটিয়া উঠে। কারণ, বিদ্যার গুণ এই, তিনি অবিদ্যাকে বিনষ্ট করেন। স্বংকৃত অর্থবলে আত্মা যখন অবিদ্যা শব্দের অন্তর্গত হইতেছেন, তখন তিনি অবশ্যই বিদ্যা দ্বারা বিনষ্ট হইবেন। যদি তিনি বিনষ্ট না হন, তাহা হইলে বিদ্যা এই পদার্থের সত্তা বিফল হয়। কেন না, অবিদ্যাকে বিনাশ করাই বিদ্যার কার্য্য। বিদ্যা যদি সে কার্য্য করিতে না পারিলেন, তাঁহার থাকিয়া ফল কি?

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবং॥ ১৮॥ সূ॥

যদি পুনর্ব্বিদ্যয়া চেতনে বাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বমুচ্যতে তথা সতি জগতঃ প্রকৃতিমহদাদ্যখিলপ্রপঞ্চস্যাপ্যেবমবিদ্যাত্বং স্যাৎ। অথাতআদেশো নেতি নেত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদিশ্রুতিভির্মিথ্যাজ্ঞানস্যেব প্রকৃত্যাদেরপ্যাত্মনি বাধি-

তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চাখিলপ্রপঞ্চস্যাবিদ্যাত্বে সত্যেকস্য জ্ঞানেনাবিদ্যানাশাদন্যৈরপি প্রপঞ্চোন দৃশ্যেতেতি ভাবঃ। বিদ্যানাশ্যত্বং চাবিদ্যাত্বং বক্তুং ন শক্যতে বিদ্যানাশ্যগ্রহাসম্ভবাদাত্মাশ্রয়াদিতি॥ ভা॥

বিদ্যাভিন্ন অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা বিদ্যা দ্বারা বিনাশ্য হয়, যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে জগৎও বিদ্যানাশ্য হইয়া উঠে। কারণ, এক ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিল, তদ্দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেল, যাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই, তাহারাও আর জগৎ দেখিতে পাইল না।

তদ্রূপে সাদিত্বং॥ ১৮॥ সূ॥

ভবতু বা যথা কথঞ্চিদ্বিদ্যাবাধ্যত্বমেবাবিদ্যাত্বং তথাপি তাদৃশবস্তুনঃ সাদিত্বমেব পুরুষেষু নত্বনাদিত্বং সম্ভবতি। বিজ্ঞানঘন এবেত্যাদ্যুক্তশ্রুতিভিঃ প্রলয়াদৌ পুরুষস্য চিন্মাত্রত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। অস্মন্মতে চ প্রলয়ে পুরুষস্যাসংসারিত্বেঽপি স্বতন্ত্রনিত্যপ্রধানসংযোগাৎ পুনর্বন্ধউপপাদিতস্তথা প্রধান সংযোগেঽপি প্রাগ্‌ভবীয়াবিবেকএব বাসনাদৃষ্টাদিদ্বারা নিমিত্তমিত্যপ্যুক্তং। তস্মাৎ যোগদর্শনোক্তাদন্যা নাস্ত্যবিদ্যা। সা চ বুদ্ধিধর্ম্মএব ন পুরুষধর্ম্ম ইতি সিদ্ধং।

বিদ্যা ভিন্ন যে কিছু আছে, সেই অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা বিদ্যা দ্বারা বিনাশ্য হয়, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে পুরুষের অনাদিত্ব ব্যাঘাত জন্মে। শ্রুতিতে আছে, প্রলয়কালে পুরুষ চিন্মাত্রাবসায়ী থাকেন। কিন্তু তুমি অবিদ্যা ও বিদ্যার যে লক্ষণ করিতেছ, তাহাতে পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ দোষ ঘটিল, তাহা হইলে পুরুষের যে আদি আছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু শ্রুতিতে পুরুষের আদি আছে, এ কথা বলে না। ফলতঃ সিদ্ধান্ত কথা এই, অবিদ্যা বুদ্ধির ধর্ম্ম; পুরুষধর্ম্ম নয়।

নিরাশ-হৃদয়।

কি সুন্দর শোভা যমুনার তীর!
বহিছে পবন ধীরে ধীরে ধীরে,
উঠিছে তরঙ্গ যাইছে মিশিয়ে,
আবার উঠিছে,—যাইছে ভাসিয়ে।
ভাসিতে ভাসিতে, নাচিতে নাচিতে
লাগিছে পুলিনে। কেমন পীরিতে,

কেমন সোহাগে, কিবা কুতূহলে
করিছে চুম্বন ;—মিশিছে সলিলে
সলিলের কোটা জনমতরে !
বিশেষ্ব তরঙ্গ !—কি ভয় তোমার ?
সকলেরি ভবে হবে মিশিবার !
কে পায় জগতে এমন প্রণয় ।
এমন গভীর, মধুরতা-ময় !
সতত অটল, (কিবা মনোহর !)
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা নিরন্তর !
বড় সাধ মনে হাসিতে হাসিতে
বারেক চুম্বিয়া প্রাণ তেয়াগিতে
তোমার মতন প্রণয়-ভাবে !
কি সুন্দর শোভা যমুনার তীরে !
দেখ দেখ চেয়ে অনন্ত-অম্বরে
কত শত তারা (কেমন সুন্দর !)
কেমন পুলকে লয়ে সুধাকর
হাসিছে মুচকি প্রণয়ের হাসি !
ও হাসি দেখিতে বড় ভালবাসি ।
হেসে হেসে প্রিয়ে ! এস একবার,
উছলি উঠুক্ প্রেম পারাবার
দেখুক সকলে অবাক হয়ে ।
দেখুক তারকা দেখুক চন্দ্রমা,
অপূর্ব্ব এ হাসি, নাইকো উপমা ! !
এ হাসি যেনরে কেমন সরল,
কেমন মধুর, কেমন কোমল ! !
হাস-হাস মুখে পীরিতের হাসি,
আমি প্রিয়তমে ! বড় ভালবাসি ।
দেখুক শশাঙ্ক হাস একবার,
ও মুখে ও হাসি কিবা চমৎকার !
দেখুক তারকা দেখুক চেয়ে ।

কি সুন্দর শোভা যমুনার তীরে!
অপূর্ব্ব কানন,—কানন ভিতরে
কত শত শত খদ্যোতিকাগণ
খুঁজিছে যেনরে রাধিকা-রমণ!!
(দেখা দিয়ে শ্যাম গিয়েছে চলিয়ে,
বিরহিণী রাধা কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
আলু থালু বেশে মলিন বদনে
চাতকিনী প্রায় সদা পথ পানে
  রয়েছে চকিত-নয়নে চেয়ে!)
কিবা সুমধুর প্রকৃত প্রণয়!
গাঁথা নিরন্তর হৃদয়ে হৃদয়!
নাহি কিছু চায় সেই মুখ পেলে,
সেই মুখ দেখি থাকে প্রেমে ভুলে!
ঢেক না ঢেক না ও মুখ প্রেয়সি!
ওই মুখখানি বড় ভালবাসি;
না চাই চুম্বিতে না চাই ছুঁইতে,
দেখিবার সাধ শুধু হৃদয়েতে,
  জুড়াও নয়ন দেখিতে দিয়ে।
কি সুন্দর শোভা যমুনার তীরে!
কোথাও কাননে কোথাও প্রান্তরে
কিবা সুশোভিত, কিবা মনোহর!
উপরে অনন্ত সুনীল অম্বর,
নিম্নে বেগবতী অনন্ত-যৌবনা
নাচিয়া নাচিয়া যাইছে যমুনা!
কত শত তারা চারু শশধর,
খেলিছে পুলকে বুকের উপর,
  প্রণয়-তরঙ্গে হৃদয় ভরা!
কত শত মাস এই রূপে যায়।
আকাশের চাঁদ আকাশে মিশায়।
আবার হাসিয়ে প্রফুল্ল বদনে,

দেখা দেয় শশী　সুনীল গগনে।
পড়ে প্রতিবিম্ব　যমুনার জলে,
ধরিয়ে যমুনা　ধায় ঢলে ঢলে;
এ হৃদয় মাঝে　ভাসে দিবানিশি,
এক খানি ছবি,　বড় ভালবাসি,
লুকাতে না পারে, রয়েছে ধরা।

কি সুন্দর শোভা　যমুনার তীরে!
কত শত পাখী　ধীরে ধীরে ধীরে,
এ গাছ হইতে　ও গাছ উপর,
যাইছে নাচিয়ে;—কিবা মনোহর!
কোথাও দুজন　প্রণয়ে মাতিয়ে
অধরে অধর　রেখেছে মিশায়ে!
কোথাও সকলে　ধরি এক তান,
গাইছে পুলকে　প্রণয়ের গান,
রয়েছে সবাই প্রণয়ে মাতি।

যদি কেহ চাও　প্রকৃত প্রণয়,
চল গিয়ে দেখি　বিহঙ্গ হৃদয়।
কেমন সুন্দর,　কেমন কোমল,
কেমন প্রফুল্ল,　কেমন সরল!
নাহি চাই ধন,　নাহি অভিমান,
সংসারের সুখ　করি তৃণ জ্ঞান,
যদি দেও বিধি　জনমের তরে
থাকিতে মিশায়ে　অধরে অধরে
বিহঙ্গের মত দিবস রাতি!!

কি সুন্দর শোভা　যমুনার তীরে!
শান্তি পারাবার　বহিছে ধীরে।
প্রেমের ঝরনা　ঝরে নিরন্তর।
সকলি সুন্দর,　সব মনোহর!
চল যাই প্রিয়ে!　বারেকের তরে,
মিশায়ে দুজন　অধরে অধরে,

বসে থাকি ওই যমুনা-পুলিনে;
হাসিব, খেলিব কখন (ও) যতনে
ধরিব হৃদয়ে,—জুড়াবে হিয়ে।

অসম্পূর্ণ—

রাজধানী ভুবনহাটি। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সান্যাল।

বৈজ্ঞানিক কৌতুক।

কৃত্রিম আলেয়া।

একটী কাচ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তন্মধ্যে চারি পাঁচ খণ্ড ফস্ফেট অব্ লাইম নিক্ষেপ করিবে। অত্যল্প পরেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় আলোকরেখা উদ্গত হইবে, পরিশেষে নিবিড় ধূমাকার কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের তুল্য বাষ্পরাশি স্তবকে স্তবকে উত্থিত হইতে থাকিবে। রাত্রিকালে এই কৌতুক দেখাইলে দর্শকের অপরিসীম আনন্দ জন্মে।

—:০:—

পাদপূরণ।

কবিভূষণ! পূরণ কর,—ডেঙ্গর নয় চুলের ভিতর রুই কাতলা নড়ে।
উত্তর।—জটাতে বিষম আটা, কি করে কিল্ বিল্।
হাল্ হাল্ চুল্কাইয়া হাতে লাগে খিল॥
মাথা পেতে ষড়াননে কহেন শঙ্কর।
বাছ রে বাছুনি! চুলে হয়েছে ডেঙ্গর॥
জটা তুলে চুল খুলে দেখেন কার্ত্তিক।
কল কল গঙ্গাজল ছুটিছে চৌদিক॥
নানাজাতি মীন তাতে দিতেছে সাঁতার।
কার্ত্তিক বলেন,— বাবা! এ কি চমৎকার?
কপ্ কপ্ খাবি খেয়ে ল্যাজ ঝেড়ে ঝেড়ে,
ডেঙ্গর নয়,—চুলের ভিতর রুই কাতলা নড়ে।

কল্পদ্রুম।

সমুদ্রমন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি।

(ভৌতিক তত্ত্ব।)

মহাভারতে, রামায়ণে এবং পুরাণাদিতে সাগরমন্থনের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মথ্যমান-জলধিগর্ভ হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্নরাজি উপলব্ধ হয়। আজ গগনের ললাটপটে যে-মারকত-মরীচি মালী সুধাংশু জগতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, (১) সিন্ধুমন্থনে তাঁহারও উৎপত্তি। পাঠক! শীত স্বচ্ছ স্নিগ্ধকান্তি বলিয়া চাঁদখানি নবনীত না কি? তাই দেবদানবে ক্ষীর-সমুদ্র মথিয়া কুন্দকল্পমূর্ত্তি চন্দ্রমা লাভ করিলেন? কথাটী আপনাদের কেমন কেমন লাগে না? ইহা কি কবিদিগের উদ্ভাবনী-প্রতিভা-প্রসূত কল্পনা-কুসুম?—না, ইহার অন্তর্নিবিষ্ট কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে?—কিছু বলিতে পারেন? শাস্ত্রকথায় গূঢ়ত্বানুসন্ধান করা কি?—ঋষিবাক্যকে এত দিন ত প্রলাপের একপ্রকার পুরাতন রীতি বলিয়া জানিতাম। ত্রিদোষস্থ রোগীরা, ও ভূতোপহত ব্যক্তিরা প্রলাপ কহিতে থাকে, সে প্রলাপের এক ধারা; নিদ্রিতেরা স্বপ্নাবস্থায় প্রলাপ কহে, সে প্রলাপের একধারা; ঋষিরা জাগ্রদবস্থায় শাস্ত্রবাক্যে প্রলাপ কহিতেন, মনে করিতাম, ইহা বুঝি প্রলাপের আর এক ধারা। আর্ষগ্রন্থ খুলিতাম, মর্ম্মার্থ বুঝিতে যত্ন করিতাম কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বৈয়র্থ্য ঘটাইতাম,—ছত্রে ছত্রে ভগদত্তের হাতীর ছায়া পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখিতে পাইতাম। ঋষি-

---

(১) সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রোৎপত্তি বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রকৃত ভৌতিক তত্ত্বের বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পাঠক! আদ্যোপান্ত প্রস্তাবটী পাঠ করিলে ঋষিবাক্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

মহাভারতে, রামায়ণে, ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, পদ্মপুরাণে, স্কন্দপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণে সিন্ধুমন্থনের আখ্যান নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সাগরমন্থনে চন্দ্রোৎপত্তির কথা রামায়ণে লিখিত হয় নাই।

দিগের পুস্তকে কেবল বর্ণনাবাহুল্য, সকলিই কল্পনা; কিন্তু ভস্মে আচ্ছন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে, কে জানিত? মনে করিতাম অরণ্যে কেবল কণ্টক জন্মে, সুরভিপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা ত কেহ দেখায় নাই?

বুদ্ধির পক্কতা না জন্মিলে চিত্ত অতিশয় নমনীয় হইয়া থাকে; মনকে যে দিকে ঘুরাইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে নম্র হইয়া পড়িবে; কেবল মন কেন, তরুণাবস্থায় সকল পদার্থেরই এ প্রকার নমনীয়ত্ব থাকে। বৃক্ষের নবীন শাখাকে যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকেই অবনত হইয়া পড়িবে। অপরিণত বয়ঃক্রমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট ভৌতিক-তত্ত্বের উপদেশ শুনিতাম, গুরুর বাক্য—তাও কি ভ্রমাত্মক হইতে পারে? সতৃষ্ণ নয়নে আচার্য্যের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। বিদ্যায় বৃহস্পতি, হিন্দুশাস্ত্রের নিন্দা করিতেন, কতই ভ্রম ধরিয়া দিতেন, তাঁহার সকল বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতাম। করিব না কেন?—যে জাতি বিজ্ঞানবলে নভশ্চর জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেছেন, বল দেখি সে জাতির বাক্য কি অশ্রদ্ধেয়? কেন না আদর করিব?—স্বর্ণসৌত্রী সৌদামনী যে জাতির দূতী, চকিতাবসরে বার্ত্তা আনিয়া দিতেছে, দেখাও—সে জাতির বাক্য অনাদরণীয় কিসে? মানিব ত?—দেখ দেখি. ক্ষিপ্রগামী বাষ্পপোত উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া কেমন যোজনপথ অতিক্রম করিতেছে, ঈদৃশ শিল্পকুশল জাতির বাক্য মাননীয় নয়? আচার্য্য উপদেশ দিতেন, তদ্বাক্যে কিছুই অপসিদ্ধান্ত দেখিতাম না, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সকলি প্রামাণিক বলিয়া মানিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ঋষিবাক্য উপেক্ষণীয় নহে,—সে রত্নগর্ভ মহোদধি, তন্মধ্যে নিগূঢ়তত্ত্বরাশি নিহিত আছে। আমরা যত ভৌতিক তত্ত্বানুশীলন করিতেছি, ততই ঋষিবাক্যের সারবত্তা পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যুত, আর্য্যগণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, আমরা তাঁহাদের সকল কথার গূঢ়ত্ব বুঝিতে সমর্থ হই না, তাঁহাদের অগাধ বুদ্ধি-সাগরে নিমগ্ন হইতে পারি না,কেবল অনবগাঢ় চিত্তে উপরে ভাসিতে থাকি; রত্ন তুলিব কি?—কেবল লঘু তৃণগুচ্ছই আহরণ করি, মুক্তাকলাপ অতল-কুক্ষিতে পড়িয়া থাকে,—আমরা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসি।

ভীষণ বাত্যাতাড়িত তরঙ্গ দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিতে থাকে, আর ডুবিতে পারি না, মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু অর্থলালসা ছাড়িবার নয়,—অর্থলোভে মনুষ্য হৃষ্টমনে প্রাণত্যাগ করিতেও কাতর হয় না; অনেক

দেখিয়া শুনিয়া নিরস্ত হই, আবার অর্থস্পৃহা হৃদয়ে ধিকি ধিকি জলিয়া উঠে, আবার হস্ত ধরিয়া অগাধ জলধিজলে নামাইয়া দেয়। যাহা না হয় বিক্রমে, ধনবলে, জ্ঞানবলে ও বুদ্ধিবলে, যত্নে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ ছুপ্রবহ মজ্জন ক্লেশ ব্যর্থ হইতেছে না; এখন ডুবিতে ডুবিতে দেখিলাম, মুক্তাবলী হাতে ঠেকিতেছে। বুঝিলাম, তবে কেবল লবণরাশি নয়, যত্নপূর্ব্বক তুলিতে পারিলে এ জলে দুর্ল্ভ মণিমুক্তাও মিলিবে।

সিন্ধুমন্থনে চন্দ্রোৎপত্তি হইয়াছে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? পাঠক! আসুন, তবে সৃষ্টিপ্রকরণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখি। "অদ্ভুত ভৌতিকতত্ব শীর্ষক পূর্ব্ব প্রস্তাবে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস বিবৃত হইয়াছে; আমার সেই রহস্যাখ্যায়িকা কৌতুককর ভাবিয়া কদাপি উপেক্ষণীয় জ্ঞান করিবেন না। বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারই অলৌকিক, অদ্ভুত এবং কৌতুককর। কিন্তু নিত্য দেখিতেছি বলিয়া আর তাহার চমৎকারিত্ব নাই, তাহা দেখিতে কি শুনিতে আর কৌতূহল জন্মে না, নচেৎ বল দেখি,—জগতের কোন্ বিষয়টী আশ্চর্য্য নয়?

আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা এবং বৈজ্ঞানিকেরা ভূতত্বের প্রাচীন মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অভিনব গবেষণা দ্বারা তাঁহাদের শাস্ত্র যত উৎকর্ষলাভ করিতেছে, ততই তাহা আর্য্যমতের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন, যদ্যপি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি সুসিদ্ধ ও প্রমাণসঙ্গত, সন্দেহ নাই। ভূবেত্তারা বলেন, সর্ব্বাদৌ পৃথিবী একার্ণব ছিল; তৎকালে ইহার কুত্রাপি স্থলজ উদ্ভিজ্জ কিম্বা স্থলচর প্রাণী কিছুই ছিল না; কিন্তু জলচর জীবজন্তু ছিল, তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। কলিকাতার জাদুঘরে একপ্রকার উপলখণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহাতে শম্বুকাদি সামুদ্রিক জীবের অস্থি দৃঢ়রূপে সংলগ্ন আছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ সমস্ত প্রস্তর সাগর হইতে উত্তোলিত হয় নাই। পাঠক! শুনিলে বিস্মিত হইবেন, শিখরীর চূড়ায় পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—তৎসমুদয় কম্বুসংসক্ত উপলগুলি চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের সানুদেশ হইতে অধিগত। জ্যোতির্ব্বেত্তারা এবং বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বে পৃথিবীর উপরিভাগে ভূধরাদি কিছুই ছিল না, জলময় ভূমণ্ডলের কোন প্রকার গতিও ছিল না।

ক্রমে পরমাণুর সংযোগে জলে স্থলে বিমিশ্রিত একটী পিণ্ড উৎপন্ন হয়, তৎপরে ভূগর্ভসঞ্চিত দাহ্যপদার্থে একবার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া যায়। সে সময় সন্তাপে ভূমণ্ডল স্ফুটিত হইয়া দ্রবীভূত হইয়া পড়িল, জলাংশ বাষ্প হইয়া গেল। অনন্তর সেই তাপের হ্রাস হইলে অল্পশঃ পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল, আবার বাষ্পরাশি ক্রমে ক্রমে জলে পরিণত হইল, তাহাই এক্ষণে সাগররূপে স্থলভাগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। বিগলিত পদার্থ শীতল হইয়া মৃত্তিকা, ধাতু এবং প্রস্তর হইয়া গিয়াছে। যেমন মৃণ্ময় ইষ্টক দগ্ধ করিলে তাহা হইতে ঝামার উৎপত্তি হয়, পর্ব্বতের উৎপত্তিও ঠিক তদ্রূপ। পার্থিব পদার্থ অন্তরুৎসেক জনিত তাপে স্ফুটিত হইয়া উচ্ছলিত ও স্ফীত হইয়া উঠিল, পরিশেষে গাঢ় হইয়া পর্ব্বতরূপ ধারণ করিয়াছে। এক দিন যাহা মৃৎপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নিহিত ছিল, আজ তাহার উচ্চতর প্রদেশ মেঘমালা অতিক্রম করিতেছে। সম্প্রতি পৃথিবীর উপরিস্থ স্তরগুলি শীতল ও গাঢ় হইয়াছে বটে ; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে এখনও দারুণ সন্তাপ, ভূগর্ভস্থ দ্রবদ্রব্য এখনও উৎসিক্ত হইতেছে। এ দিকে উপরিভাগের স্তরগুলি কঠিন হওয়ায় কোন কোন স্থান উচ্চ হইয়াছে, কোন কোন স্থানের অভ্যন্তর ফাঁকা হওয়ায় তত্তৎস্থল বসিয়া গিয়া হ্রদ, গুহা, দেবখাত, শৈলখাত এবং সমুদ্র হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, তরলাবস্থায় ভূমণ্ডলের উপাদান শিথিল ছিল, সুতরাং ইহার আকারও বহুব্যাপক থাকিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে যত গাঢ় ও কঠিন হইয়া আসিতেছে, ততই ইহার উপাদান পরস্পরা নিষ্পিষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর আকারও সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে পর্ব্বতগুলি ভূগর্ভে মগ্ন ছিল, এখন পৃথিবী বসিয়া যাইতেছে, তজ্জন্য শৈলের শিখাগ্র উন্নত হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাপক আলফন্সি ফেবার এই মতের সমর্থন করেন, এক্ষণে অনেকেই তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহার সবিস্তার বিবরণ লিখিব। এস্থলে এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করা আবশ্যক, ভূবেত্তা ফেবার সাহেবের মত আমি সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার সিদ্ধান্ত কিয়ৎপরিমাণে অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু উৎসিক্ত পার্থিব পদার্থ ফুটিতে ফুটিতে যে স্ফীত হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হয়, সে পক্ষে কোন সংশয় নাই। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো অধিত্যকায় জেরুলোশৃঙ্গের উৎপত্তি ভৌতিক জগতে একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা।

আজ যে স্থলে ৩৪০ হস্ত পরিমিত শৈলচূড়া দর্শকদিগের কৌতুকাক্রান্ত নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে, কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে তথায় কিছুই ছিল না। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ এক রজনীতে ভূগর্ভে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন হইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী জনপদ কম্পিত হইয়া উঠিল, পরিশেষে এককালীন শত সহস্র বজ্রনিপাতের ন্যায় বিকট গম্ভীর আরাবে যাবতীয় ব্যাপার স্তব্ধ হইয়া গেল। যামিনীর অবসান, পর্য্যুষিত নীহার সক্ত সমীরণে জীবের হৃদয় স্নিগ্ধ হইল, নবীভূত তেজে সত্ত্ববান্ হইয়া ভুবন জাগিল; উর্জ্জস্বল ভানুমান্ জগৎ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আজ কি তিনি প্রতিদিনের উচ্ছিষ্ট পুরাণ উপহার হেমথালায় সাজাইয়া প্রবুদ্ধ প্রাণিদিগকে ভেট দিতে আসিলেন?—তা নয়, আজ রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া প্রাচীন বিধাতার চতুর হস্তের কতকটা নির্ম্মাণ-কৌশল সকলকে দেখাইয়া দিলেন। সেই ভূমিকম্প, সেই ঘোর নিশীথ নির্ঘোষ কেন?—পর দিন প্রভাতে সকলেই দেখেন, অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ যেন চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ করিতে মস্তক তুলিয়াছে।

এটী চাক্ষুষ ঘটনা। পাঠক! দেখুন মৃত্তিকা বসিয়া গিয়া এ স্থলে পর্ব্বতোৎপত্তি হয় নাই। গলিত পদার্থ স্ফীত হইয়া পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, এতদ্দৃষ্টে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অত্যুচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গপ্রদেশে কি প্রকারে সামুদ্রিক পদার্থ সংগৃহীত হইল, এক্ষণে তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমে ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাতের সময় পর্ব্বতাদির উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হইল, তখন সকল পদার্থই জলমগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে ভূধরের শিরোদেশ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে যে সমস্ত সামুদ্রিক জীব সংলগ্ন ছিল, তাহা আর নিঃসৃষ্ট হইয়া গেল না। পর্ব্বতের চূড়ায় ও গহ্বরে আসক্ত হইয়া থাকিল। বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতগুলি জেরুলোর ন্যায় এক রাত্রিতে উৎপন্ন হয় নাই। কোটি কোটি বৎসরে হিমালয়াদি বহু বিস্তীর্ণ পর্ব্বত এ প্রকার কলেবর ধারণ করিয়াছে। এখনও যে সকল পর্ব্বত সাগরজলে মগ্ন আছে, তাহারাও নিয়তকাল ঐ প্রকার ভৌতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উত্তরোত্তর স্ফীত হইতেছে। কাল সহকারে সমুদ্র ভরাট হইতেছে। এক দিন তাহাও কঙ্করাকীর্ণ গৈরিক ক্ষেত্রের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া হিমালয়ের অনভ্য পরিসরের তুল্যতাবিধান করিবে।

অধুনাতন সামুদ্রিক ভূধরের ন্যায় হিমালয়ও এক দিন সাগরগর্ভগত

ছিল। তৎকালেই শম্বুকাদি শিলাখণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ সমুদ্রকুক্ষিগত ছিল, পরে হিমালয়ের অঙ্গধৌত গৈরিক রাশি দ্বারা ঐ সমস্ত প্রদেশ এক্ষণে ভরাট হইয়া মানুষের বাসোপযোগী হইয়াছে। এই প্রণালীতে নূতন ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতার সর্ব্বস্রষ্টৃ করপল্লব এখনও ক্লান্তিভরে আলুলিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই,—এখনও সাগরসঙ্গমে পলি পড়িয়া নূতন ভূমি উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষাকালে গঙ্গাজলে "ঢল নামে।" ঢল রক্তিমবর্ণ গৈরিক মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহা মিশ্রিত হইলে জল ঘোলা হইয়া উঠে। সমস্ত বৃহৎ নদীর সঙ্গমে গৈরিক দ্রব্য দ্বারা প্রায় দুই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল বিবর্ণ হইয়া থাকে। নদীর স্থানে স্থানে পলি রাশি সঞ্চিত হইলে চড়া পড়ে, সাগরে সঞ্চিত হইলে তথায় বৃহদাকার ভূখণ্ড হইয়া উঠে। নূতন ভূমিতে প্রথমে তৃণ উবীর এবং গোলপাতা জন্মে, তাহাদের মূল দ্বারা মৃত্তিকা দৃঢ় এবং গলিত পত্রে উর্ব্বরা হইতে থাকে, তাহার পর বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে পৌণ্ড্রাজ্যের রাজধানী তমোলুক সমুদ্রকূলে অবিস্থিত ছিল, এক্ষণে সেই নগর হইতে সমুদ্র বিংশতি ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই এই প্রকারে নূতন নূতন দেশোৎপত্তি হইতেছে, সুতরাং ক্রমশঃ জলের হ্রাস এবং স্থলের বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর পৃথিবীর আকার সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্য উপরিভাগের সমতল ভূমি মাপিলে পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনের হ্রাস হইয়াছে বলিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে গুরুত্ব ও ঘনফল অধিক হইয়াছে। সগর্ভ বর্ত্তুলার্দ্ধের পরিধি ব্যাসাপেক্ষা দীর্ঘ সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তুলটী ভরাট করিলে তাহার ভার এবং ঘনফল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পৃথিবীর উপরিভাগে বিস্তর গহ্বর ও খাতাদি ছিল, এখনও অনেক হ্রদাদি বিদ্যমান আছে। সেই সকল খাতের গর্ভ মাপিলে তাহার বর্গফল অধিক হয়; কিন্তু তাহাদের গর্ত্ত ভরাট হইলে বর্গফল অল্প হইবে, কিন্তু ভার ও ঘনফল বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। তদ্ভিন্ন গভীর ভূগর্ভ হইতে ঔদ্ভিজ্জ জান্তব এবং মনুষ্য নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য উত্তোলিত হইতেছে (২)। নূতন নূতন স্তর পড়িয়া পৃথিবী যে কত

---

(২) ইউরোপে মৃত্তিকার অতি নিম্ন স্তর হইতে মনুষ্য নির্ম্মিত পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছে।

দূর স্থূল হইয়া আসিতেছে, এই সমস্ত নিদর্শন তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। অতএব বসুন্ধরা চতুর্দ্দিকেই স্থূল হইয়া উঠিতেছে, তদ্বিষয়ে আর কোন আপত্তি নাই।

সকলেই জানেন, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক এই দ্বিবিধ গতি আছে। ভূমণ্ডল নিজ নাভিশলাকায় থাকিয়া একবার আবর্ত্তিত হইলে অহোরাত্রে আহ্নিক গতি সম্পন্ন হয় এবং অক্ষপথে মণ্ডলাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে সম্বৎসরে বার্ষিক গতি নিষ্পন্ন হয়। এক্ষণে পৃথিবীর আহ্নিক গতি সম্পন্ন হইতে ২৪ ঘণ্টা লাগে এবং কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিনে বার্ষিক গতি সমাপ্ত হয়। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এই গতির বিস্তারিত বিবরণ পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিব; আজি কেবল উহার স্থূল স্থূল কয়েকটা বৃত্তান্ত এস্থলে নিবদ্ধ হইতেছে।

বিবেচনা করুন, ভূমণ্ডল বাষ্পীয় কলের বৃহৎ চক্রের স্বরূপ। পাঠক! দেখিয়া থাকিবেন, কলের গাড়ীতে একখানি বৃহৎ চাকা আছে, বাষ্পের প্রতাড়নায় হাতা সমেত উহা ঘুরিতে থাকে। অন্যান্য ক্ষুদ্র চাকাগুলি ঐ বৃহচ্চক্র হইতে বলাকর্ষণ করিয়া তৎসঙ্গে ঘুরিয়া উঠে।

বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি পদার্থের কোন কোন নিদর্শন দেখিয়া বলেন যে, সেগুলি দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে,ছয় সহস্র বৎসর অতীত হইল, পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মহাবিপ্লব ঘটিল, সকল জাতির ধর্ম্ম পুস্তকেই ঘুণ ধরিতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাই নগরের নিকটে জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান (Prince's Dock) খনন করিতে করিতে প্রায় পঞ্চাশ হাত মৃত্তিকার নিম্নে একটি বিগলিত জঙ্গল দৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি ঊর্দ্ধ ভাবে খাড়া আছে। কাষ্ঠে আর কিছুই পদার্থ নাই, পঙ্কবৎ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও বৃক্ষ বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারা যায়। বৃক্ষের অগ্রভাগ কোমল মৃত্তিকায় রহিয়াছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে যত মূলের দিকে গিয়াছে, ছিদ্রও তত বৃহদাকার হইয়াছে। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঊর্দ্ধভাগ হইতে বৃক্ষগুলি পচিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ডকের ভিতরে ৩৮২ টী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ২২৩ টী খাড়া ছিল। সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষগুলি ২৮ হাত দীর্ঘ

বৃক্ষগুলির আকার অবয়ব দেখিয়া নিশ্চিত হইল যে, তাহাদের কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সমস্ত মূল গুঁড়ীর উপর লম্ব ভাবে পার্শ্বে বাড়িয়াছিল। এই জঙ্গলটী কত কাল মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতি গভীর স্তর পর্য্যন্ত খনন করিয়া গেলে, প্রথমে গলিত ঔদ্ভিজ্জ পদার্থ তৎপরে খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়, অতএব কত নিম্ন দেশ হইতে পৃথিবী যে জমাট হইয়া আসিতেছে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হয় না।

অতএব ক্ষুদ্র চক্রগুলি বৃহচ্চক্রের বল হরণ করিতেছে, তজ্জন্য বৃহচ্চক্রের ক্রমশঃ বলহানি হয়। কিন্তু পাছে কলের বেগ নিঃশেষিত ও নিরস্ত হইয়া পড়ে, সে কারণ জল ও অগ্নি দ্বারা নূতন বল প্রদান করা আবশ্যক। বাষ্পতেজের হ্রাস হইলে প্রথমে কল মৃদুগামী হয়, তৎপরে নিশ্চল হইয়া যায়। ভূমণ্ডল কলের ঠিক বৃহচ্চক্রের সদৃশ। কিন্তু বাষ্পীয় কলে প্রয়োজনানুসারে অভিনব তেজঃ যোজিত হয়, পৃথিবীচক্রে নূতন বল অনুপ্রবেশ করিতেছে না; সুতরাং উত্তরোত্তর ইহার বলের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শকটের ক্ষুদ্র চক্র যেমন কলের বৃহচ্চক্রের বল হরণ করিতেছে; চন্দ্রমণ্ডল ঠিক ক্ষুদ্র চক্র স্বরূপ, প্রতিনিয়তই পৃথিবীর বলাকর্ষণ করিয়া লইতেছে। চন্দ্রদেব কর্তৃক এই বেগাকর্ষণই "জোয়ার ভাঁটার" মুখ্য কারণ। এক এক বার জোয়ার হয়, পৃথিবীর বেগও কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া আইসে। সেই গতি মান্দ্যের আর সংস্কার বা উত্তেজক প্রকরণ কিছুই নাই। আমাদের দেহই এই জোয়ার ভাঁটার একটী প্রত্যক্ষ উপমেয়। প্রত্যেক হৃৎস্পন্দনে এবং শ্বাসক্রিয়ায় শারীরিক পেশীসূত্রের বলহানি হইয়া থাকে; সুতরাং আয়ুঃক্ষয় (৩) হয়। উৎপ্লুত শোণিত প্রবাহকালে হৃদাশয় প্রসারিত হয়, শ্বাসগ্রহণ কালে ফুস ফুস স্ফীত হয়, তাহাই জোয়ার। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ আয়ুর হ্রাস হইতেছে। তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, নিশ্বাসে আয়ুক্ষয় হয়। যদ্যপি আহার নিদ্রার দ্বারা শরীরের পরিপোষণ না হইত, তবে কোন প্রাণী দীর্ঘজীবী হইত না। কুম্ভক দ্বারা যে আয়ুর বৃদ্ধি হয়, শ্বাসরোধই তাহার মূলাধার।

দেহিমাত্রের দেহের যেমন পরিপোষণ চলিতেছে, পৃথ্বীবেগের তদ্রূপ পরিপোষণ নাই; চন্দ্রের আকর্ষণে যত টুকু তেজোহানি হইতেছে, কিছুতেই আর সে ক্ষতিপূরণ হয় না,—নিরবচ্ছিন্ন কেবল বলের খর্ব্বতা জন্মিতেছে; সুতরাং পূর্ব্বে ধরিত্রী যে প্রকার তীব্র বেগে ঘূর্ণিত, এক্ষণে তদপেক্ষা অল্পত্ব

(৩) নিয়ত উত্তেজক সামগ্রী সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের সাতিশয় ক্রিয়াধিক্য হয়, সুতরাং আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ডাক্তার হচিন্স (T. G. Hutchings) লিখিয়াছেন,—Besides meat in large quantities is too stimulating, and therefore in hurrying on life shortens its duration. The blood also becomes too rich, and too thick, thus producing Unnatural excitement of other argans, and producing inflamations, brings on disease.

মন্দগামিনী হইয়াছে। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। সূর্য্যকর্ত্তৃকও পৃথিবী আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে জোয়ার আমাদের বোধসুগম নহে। সৌর জোয়ার পৃথিবীর বার্ষিক গতির অনুসারী, চান্দ্র জোয়ার আহ্নিক গতির অনুসারী। চান্দ্র জোয়ার হেতুক পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং উত্তরোত্তর অহোরাত্র-মান দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। পরন্তু সেই বর্দ্ধিষ্ণু কালপরিমাণ ঈদৃশ সূক্ষ্ম যে স্বল্প দিনে তাহা অনুভূত হইতে পারে না। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বৎসরে এক সেকেণ্ড করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এদিকে পৃথিবীর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে বসুন্ধরা এত বেগবতী ছিল যে, কার সাধ্য তৎকালীন গতি নিরূপণ করে? বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বে তিন ঘণ্টায় পৃথিবীর আহ্নিক গতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অহোরাত্রের পরিমাণ এক প্রহর কাল মাত্র ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ এতদপেক্ষা কখন বেগাধিক্য হয় নাই। এক্ষণে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী এক বার আবর্ত্তিত হইতেছে, পূর্ব্বে এই আবর্ত্তন তিন ঘণ্টায় সমাপ্ত হইত। অতএব তখন পৃথিবী আট গুণ বেগবতী ছিল। তদপেক্ষা উগ্রগামিনী হইলে পৃথিবীর আত্মরক্ষা ক্ষমতা থাকিত না; বেগসংক্ষোভে খণ্ড খণ্ড হইয়া সমূলে উৎসন্ন যাইত। বিশেষতঃ তৎকালে পৃথিবী দ্রবাবস্থায় ছিল; মৃত্রাশি তখন পঙ্কবৎ কোমল টল টলে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, নমনীয় কোমল দ্রব্য বেগে ঘুরাইলে তাহার দুই পার্শ্ব সরু ও চাপা এবং মধ্যস্থল স্থূল হইয়া উঠে। স্বীয় বেগবলে ঘুরিয়া পৃথিবীর ঠিক তদ্রূপ আকার হইয়াছে। নারিকেলের ন্যায় ইহার মধ্যস্থল উন্নত এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সরু ও চাপা।

পরন্তু কোমল পদার্থ অত্যুগ্রবেগে ঘুরাইলে তাহার আত্মলার সম্বরণ করিবার শক্তি থাকে না; সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। যৎকালে ভূমণ্ডল তিন ঘণ্টায় এক বার আবর্ত্তিত হইতেছিল, তখন উহার মধ্যস্থল উন্নত হইয়া উঠে এবং তাহার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ছিন্নাংশ আমাদের এই হিমপাণ্ডুর চন্দ্রমা, আজ কুন্দসন্নিভ স্নিগ্ধ কিরণে জগতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। পাঠক! এক্ষণে দেখুন সাগরমন্থন কি এবং তাহাতে কিরূপে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্রবময়ী ধরিত্রীর

প্রবল আবর্ত্তনই সিন্ধুমন্থন এবং ঘূর্ণমান ভূমণ্ডলের ক্ষিয়দংশের বিশ্লেষই সাগরমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি। যদ্যপি ভূবেত্তাদিগের তত্বোন্নয়ন সুসিদ্ধ এবং প্রামাণিক হয়, তবে সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তিও অপসিদ্ধান্ত এবং অপ্রামাণিক নহে। কেমন এই তবে সাগরমন্থন নয়?—এই তবে ক্ষীর-সমুদ্রে চন্দ্রের জন্ম নয়? ঋষিগণ এই ভৌতিক বৃত্তান্তকে প্রচ্ছন্নরূপে বর্ণন করিয়াছেন, ইহার সর্ব্বাঙ্গ কত বেশ ভূষায় সাজাইয়াছেন। মুখের ভঙ্গী দেখিয়া চেন চেন করিতেছ, আভরণে অঙ্গ ঢাকা চিনিয়াও চিনিতে পার না। বসন ভূষণ খুলিয়া দিলাম,— কেমন এই বার ত চিনিলে?

জ্যোতির্ব্বেত্তারা অনুমান করেন যে, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ কোটি বৎসর অতীত হইল, চন্দ্রমণ্ডল বিচ্ছিন্ন হইলে পৃথিবীর বলহানি হইতে আরম্ভ হয়। শিশু যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করে, চন্দ্র তদ্রূপ পৃথিবীর বলাকর্ষণ করিতেছে। চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াই এক কালে এত দূরে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, শৈশবকালে যেন জননীর উৎসঙ্গে বসিয়াই স্তন্য পান করিত,—অনেক দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। অনন্তর বলাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বালক যেমন ক্রোড়ে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তগুলিতে দংশন করিতে করিতে স্তনপান করিলে জননী বিরক্ত হইয়া তাহাকে সরাইয়া দেন, বসুমতী যেন ঠিক তাহাই করিয়াছেন। চন্দ্র ক্রোড়ে বসিয়া নিয়ত বলশোষণ করিতেছিল, পৃথিবী বিরক্ত হইয়া যেন তাহাকে কৃত্রিম রোষভরে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে চন্দ্র এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছে। ভূমণ্ডল এবং চন্দ্র উভয়েই বর্ত্তুলাকার, উভয়েই মণ্ডলাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে। তন্মধ্যে একটী উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতের আবাস স্থান, অপরটী (৪) আগ্নেয়গিরির অক্ষয় ভাণ্ডার,—চন্দ্রে নিয়তই অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

(৪) ১৮৯১ সালে বৈশাখ মাসে মানভূমে চন্দ্রের অগ্ন্যুৎপাত জনিত একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রাত্রি ৮ আটটার সময় সহসা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল। এককালে শত শত রংমশাল প্রজ্বলিত করিলে যে প্রকার পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ আলোক উৎপন্ন হয়, সে সময় ভূতল এবং আকাশমার্গ ঠিক তদ্রূপ নির্ম্মল আলোকে প্রকাশিত হইল। পরিশেষে গম্ভীর বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইলে পৃথিবীখানা এক বার গম্ গম্ গর্জ্জনে কাঁপিয়া উঠিল। তিন চারি দিন পরে আমরা শুনিলাম, দলমা পর্ব্বতের নিকটে বৃহদাকার একটী শ্বেতবর্ণ প্রস্তর পতিত হইয়াছে।

চন্দ্র নিজে নিষ্প্রভ পদার্থ, তাহার অঙ্গের কিছুই উজ্জ্বলতা নাই। চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় উহার রূপ কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের বাক্যে অনেকটা বর্ণবৈচিত্র্য আছে এই মাত্র প্রভেদ। ঋষিরা বলেন "দেবগণ চন্দ্রের সুধা পান করিলে তিনি ক্ষীণ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার এক কলা অবশিষ্ট থাকিতে দিবাকর নিজ রশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার (৫) তাঁহাকে পরিপুষ্ট করেন।" ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, চন্দ্রের ঊর্দ্ধে দেবলোক, সুধাংশুর অংশুমান্ পৃষ্ঠ দেবলোকোন্মুখ হইলে দেবতারা তদ্দর্শনে আপ্যায়িত হন, ইহাই তাঁহাদের সোমপান। কৃষ্ণপক্ষে যথাক্রমে প্রতিপদাদিতে সুধাকরের এক এক কলা অমৃত হ্রাস হয়, পরিশেষে অমাবস্যায় তাঁহার সম্পূর্ণ উৎসাদাবস্থা উপস্থিত হইলে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদাদিতে সূর্য্যের তেজে পুনর্ব্বার তেজস্বান্ হন। ভগবান ভাস্করের প্রখর তেজ আগৃহীত হইলে চন্দ্রমার এক পৃষ্ঠ আলোকিত হয়, কিন্তু অপর পৃষ্ঠে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, এই যুক্তি এখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিশ্চিত হয় নাই। চন্দ্রের অঙ্কস্থিত মালিন্য টুকুই বা কি তাহারও স্থিরতা নাই। যে প্রকার সৌর কালিমা সুস্থির থাকে না, কখন বিকীর্ণ, কখন সংকীর্ণ হয়; বোধ করি পূর্ব্বে তদ্রূপ চন্দ্রে কালিমাও শশের ন্যায় চঞ্চল ছিল, তজ্জন্য উহার নাম শশাঙ্ক হইয়াছে। শশাঙ্ক শশশিশু ক্রোড়ে করিয়া আছেন, এটী কাল্পনিক বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, শশধর সাতাইশটী নক্ষত্রে পরিণীত হইয়াছেন। সত্য কি বিশাখাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রের ভার্য্যা? তাহা কখন হইতে পারে না; এ স্থলেও ঋষিদিগের একটু বাক্‌চাতুরী আছে। ভগবান্ সোমদেব পরিভ্রমণ কালে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে সংগত হন, তজ্জন্য তিনি তারাপতি। এদিকে চন্দ্রসঙ্গতি হেতু দ্বাদশ নক্ষত্র হইতে দ্বাদশ মাস উৎপন্ন হইয়াছে। এক একটি নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র সঙ্গত হওয়ায় তত্তৎ নক্ষত্রের

বোধ করি চন্দ্রমণ্ডলের আগ্নেয়গিরি হইতে ঐ প্রস্তর উৎসৃষ্ট হইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল। অবশেষে চন্দ্র আর তাহারে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না, সুতরাং পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল।

(৫) ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি দীপ্তিমান।
মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ২। ১২। ৯

নামানুসারে মাসের নামকরণ (৬) করা হইয়াছে। যথা বিশাখা নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী—বৈশাখ; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী—জ্যৈষ্ঠ, ইত্যাদি। আর মাসের এ প্রকার নামকরণ হইতে আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। ঋষিরা যদৃচ্ছাক্রমে যে সে পূর্ণিমার এবম্বিধ নামকরণ করেন নাই। সূর্য্য চন্দ্র এবং পৃথিবী যেরূপে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সর্ব্বকালে তাহাদের এক প্রকার গতি নাই; কাল-সহকারে বিস্তর ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যে সময়ে মাসের প্রথম দিবসে সূর্য্য এবং পঞ্চদশ দিবসে পূর্ণচন্দ্র সংক্রম করিয়াছিল; অর্থাৎ যে মাসের যে রাশি, তাহার প্রথমেই সূর্য্য সংক্রমণ করিলে এবং যে মাসের যে নক্ষত্র, তাহা সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে পূর্ণিমাযুক্ত হইলে ঐ উভয়গ্রহ সমসূত্রপাতে অবস্থিতি করে। যৎকালে এই প্রকার সংস্থান ঘটিয়াছিল, ঋষিরা সেই সময় মাসের নামকরণ করিয়াছেন (৭)। শেষ জ্যোতিষের সূত্রানুসারে গণনা করিলে নিশ্চিত হয়, অন্যূন বিংশতি সহস্র বৎসর অতীত হইল ঋষিগণ দ্বাদশ মাসের নামকরণ করিয়াছেন। অতএব আর্য্যেরা যে কত কালের প্রাচীন লোক, তাহা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

পাঠক! এক্ষণে একটী কৌতুক দেখুন, মনু লিখিয়াছেন,—কৃতযুগে মনুষ্যের আয়ুষ্কাল চারি শত বৎসর ছিল। এ প্রকার নির্দ্দেশ অপ্রামাণিক নহে। অথর্ব্ব বেদে, ভাগবত পুরাণে এবং (৮) বিষ্ণুপুরাণে ৩৬০ তিন শত

---

(৬) সাঽস্মিন পৌর্ণমাসীতি। পাণিনি ৪। ২। ২১।

(৭) বেণ্টিলি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ১১৮১ খ্রীঃ পূর্ব্বে মাসের নামকরণ করা হইয়াছে। তাঁহার গণনা ঠিক হয় নাই, চন্দ্রার্কের সংস্থানে তিনি ভ্রম করিয়াছেন।

(৮) অথর্ব্ববেদের কোন কোন পাঠে ৩৬৫ দিনে বৎসর গণিত হইয়াছে। শেষ জ্যোতিষে ৩৬৬ দিনে এক বৎসর হয়, এইরূপ লিখিত আছে।

ত্রিশত্যহ্নাংসষষ্টির্বরাঃ ষড়্‌তবোঽয়নে।
মাসা দ্বাদশ সৌরাঃ স্যারেতৎ পঞ্চগুণং যুগঃ। ২৮

৩৬৬ দিনে, ৬ ঋতুতে, দ্বাদশ মাসে এক সৌর বৎসর হয়। ইহাদের পাঁচ গুণে এক যুগ হয়।

ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের আর্য্যানুসারে গণনা করিলে ৩৬০ দিনে বৎসর হয়।

ত্রসরেণু ত্রিকং ভুংক্তে যঃ কালঃ সা ত্রুটিঃ স্মৃতা। ৫
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। ৩
নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয়আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।

ষাট দিনে বৎসর পরিগণিত হইয়াছে। এটী ঋষিদিগের গণনায় ভ্রম বলা যায় না। এক্ষণে ৩৬৫ দিনে বৎসর হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে ৩৬০ দিনে কেন বৎসর গণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যখন তিন ঘণ্টায় অহোরাত্র সম্পন্ন হইত, তৎকালে অল্প দিনে বৎসর সমাপ্ত হইত। পৃথিবী স্বীয় কেন্দ্রে থাকিয়া অতি শীঘ্র আবর্ত্তিত হইত, আবার সূর্য্যকেও মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে অধিক দিন লাগিত না। বোধ করি, যেমন চন্দ্রমণ্ডল উত্তরোত্তর পৃথিবী হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে, সূর্য্য মণ্ডলও তদ্রূপ ক্রমাগত পৃথিবী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; সুতরাং পূর্ব্বে ভগবান ভাস্কর ভূমণ্ডলের অনেক সন্নিকটে ছিলেন, অতএব কক্ষপথেরও পরিধি সংকীর্ণ ছিল। একে পৃথিবীর বেগাধিক্য,তাহাতে আবার অক্ষপথের সংকীর্ণতা, এই উভয়বিধ কারণে বার্ষিক গতি স্বল্প দিনেই নিষ্পন্ন হইত। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে রাশিচক্রে সাতটী মাত্র রাশি গৃহীত হয়, তৎপরে দশটী, এক্ষণে দ্বাদশটী রাশি গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে চব্বিশ ঘণ্টায় অহোরাত্রমান সমাপ্ত হইতেছে, পূর্ব্বে তিন ঘণ্টায় অহোরাত্রমান সম্পন্ন হইত; অতএব এক্ষণে যে সময়ের মধ্যে মনুষ্যের এক দিন পরমায়ু গণিত হইতেছে, পূর্ব্বে তৎকাল

ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘুতা দশপঞ্চ চ। ৭
লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ।
তে দ্বে মুহূর্ত্তঃ প্রহরঃ ষড়্ যামঃ সপ্ত বা নৃণাং। ৮
\+ \+ × \+
যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্ত্যানামহনী উভে।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ। ১০
তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৄণাং তদহর্নিশং।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণোত্তরং দিবি। ১১
অয়নে অহনী প্রাহুর্ব্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ।
সম্বৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতং। ১২ ভাগবত। ৩ স্ক। ১১ অ।

তিন ত্রসরেণুতে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ত্রুটি। তাহার শত ভাগে এক বেধ হয়; তিন বেধে এক লব; তিন লবে এক নিমেষ; তিন নিমেষে এক ক্ষণ; পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা; পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু, পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়িকা (দণ্ড); দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত; ছয় বা সাত দণ্ডে মানুষের এক প্রহর, অর্থাৎ রাত্রি কিম্বা দিনের চতুর্থাংশ হয়। আট প্রহরে মনুষ্যের এক দিন; পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ; পক্ষ দুই, কৃষ্ণ ও শুক্ল; দুই পক্ষে এক মাস হয়, তাহাই পিতৃগণের অহোরাত্র; দুই মাসে এক ঋতু; ছয় ঋতুতে এক অয়ন, অয়ন দুই—দক্ষিণ ও উত্তর। দুই অয়নে এক বৎসর, শত বৎসর মনুষ্যের পরমায়ুঃ নিশ্চিত হইয়াছে।

মধ্যে আট দিন আয়ুষ্কাল শেষ হইত। এক্ষণে যে সময়ের মধ্যে মনুষ্যের শত বর্ষ পরমায়ুঃ নিঃশেষিত হয়, পূর্ব্বে তত্তাবৎকাল জীবিত থাকিলে মানুষের আট শত বর্ষ বয়ঃক্রম হইত। যে সময় পৃথিবী তিন ঘণ্টায় এক বার আবর্ত্তিত হইতেছিল, তৎকালে কোন স্থলচর জীব উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিবী আরও কিছু সুস্থির হইয়া আসিলে তৃণ লতা ও প্রাণিদের জন্ম হয়; অতএব যখন ভূমণ্ডল ছয় ঘণ্টায় এক বার আবর্ত্তিত হইতেছিল, তৎকালীন চারি শত বর্ষ অধুনাতন এক শত বর্ষ কালের তুল্য। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন ঋষিরা চান্দ্রমাসে বৎসর গণনা করিতেন, তাহা সৌর বৎসরাপেক্ষা স্বল্প দিবসে সম্পন্ন হয়। অতএব সত্যযুগের মনুষ্য চারি শত বৎসর জীবিত থাকিতেন, তাহা অসম্ভব নহে।

পরিণামে এক দিকে এই পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িবে বটে, কিন্তু ইহার ভৌতিক উপাদান দাহ্য পদার্থে পরিণত হইয়া সূর্য্যসদৃশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহাই কালানল কর্ত্তৃক জগতের প্রলয়। এক্ষণে সূর্য্য স্বীয় নাভিচক্রে ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু এক পদও স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইতেছে না। পৃথিবীরও ঠিক তদবস্থা ঘটিবে। যে দিন ধরিত্রীর পরিক্ষীয়মাণ গতিবেগ রুদ্ধ হইবে, তখন ইহার প্রখর কিরণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইতে থাকিবে; তখন আর কোন পৃথিবীর বিকচ কমল কানন এই কাণ্ড দর্শনে আনন্দে হাসিতে থাকিবে। এক দিন এই বর্ষীয়সী বসু-মতী সূর্য রূপে পুরুষাকৃতি ধারণ করিবে,—তখন "স্ত্রীপুংবস্তাবঃ" পাণিনির এই সূত্রের সার্থকতা সম্পন্ন হইবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ অতি ধীরে ধীরে "ঝান ঝান ঝমাৎ" "ঝান ঝান ঝমাৎ শব্দে চলিতে লাগিল। দেবগণ চাহিয়া দেখেন, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য রেল রাস্তা। কোন রেল দিয়া এক খানি মাল বোঝাই ট্রেণ আসিয়া থামিল। কোন রেল দিয়া এক খানি ট্রেণ আরোহী লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে। কোন রেল দিয়া এক জন কলচালক বংশীধ্বনি করিতে করিতে এক খানি এঞ্জিন লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কোন রেলে

কতকগুলো গাড়ি থামিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে ভাঙ্গা গাড়ী মেরামত হইতেছে। কোন স্থানে গাড়িতে রং মাখাইতেছে। স্থানটী ধূমে অন্ধকার। বরুণ কহিলেন "এই হাবড়ায় ট্রেণ আসিল। হাবড়ার পর পারেই ইংরাজ রাজধানী কলিকাতা।

এই সময় ট্রেণ "কঁ্যা কোঁচ ঝমাৎ" শব্দে প্লাট ফরমে থামিল। উপ তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিতে যাইয়া দেখে দ্বারে চাবি বন্ধ। দেবগণ সেই রুদ্ধ কামরায় কয়েদী অবস্থায় বসিয়া ষ্টেষণ দেখিতে লাগিলেন। দেখেন ষ্টেষ-ণের ধূম ধামের সীমা পরিসীমা নাই। অসংখ্য সাহেব, মেম, বাঙ্গালী বাবু প্লাটফরমে বেড়াইতেছে। কুলিরা দুই ঠ্যাং বিশিষ্ট দুই চাকার গাড়িতে আরোহীদিগের বাক্স প্যাটরা বোঝাই করিয়া ঘড় ঘড় শব্দে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়া দুম দাম শব্দে আছড়াইয়া ফেলি-তেছে। চতুর্দ্দিক হইতে "চাই পান" "চাই জল খাবার" শব্দ হইতেছে। মেথরেরা ঝাটা বগলে ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়াছে। কুঁজা হস্তে মুসলমানেরা জল দিতে বাহির হইয়াছে। তাঁহারা গাড়ির অপর কামরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন আরোহীরা নিজ নিজ তল্পী তাল্পা গুছাইয়া কোমর বাঁধিয়া নামিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের কাহারো কাহারো ২।৩ দিন স্নান আহার না হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শ্রী বাহির হইয়াছে, তাহার উপর আবার পাথুরে কয়লার ধূন লাগিয়া গাত্র বস্ত্র মলিন হইয়া যাওয়ায় লোকগুলোকে যেন প্রেতঘাটার প্রেত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সময় শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতে তদ্‌ভ্রাতা বলভদ্রের ন্যায় এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আসিয়া প্রেতগুলোকে মুক্ত করিবার জন্য খটাস খটাস শব্দে গাড়ির দ্বার খুলিয়া টিকিট চাহিতে লাগিল। তখন কারাগার হইতে উদ্ধার হইয়া অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, য়িহুদী, কাবুলে যাত্রী ট্রেণ হইতে নামিয়া গেট অভিমুখে চলিল। দেবগণ কাবুলে যাত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নারায়ণ কহিলেন "চালাক এই এক। নিজে মাসুল দিয়ে এসেছে কিন্তু পৃষ্ঠে করিয়া একটা বিরাশী মণ বোঝাই অস্থি আনিয়াছে। এই সময় ষ্টেষণে অসংখ্য বস্তা সাজান রহিয়াছে দেখিয়া পিতামহ কহিলেন "বরুণ! ইহাতে কি আছে ?"

বরুণ। চাল, ধান, তিসি ইত্যাদি।

ব্রহ্মা। তবে মুলুকের শস্যাদি কলের গাড়ি লুঠে এনেছে বল!

দেবগণ যাত্রীদিগের সহিত ষ্টেষণের বাহিরে আসিয়া দেখেন অসংখ্য গাড়ি ঘোড়া রহিয়াছে। যাত্রিগণ আর দর দরস্তুর করিতেছে না। সকলেই এক এক খানি গাড়ি মনোনীত করিয়া উঠিবামাত্র কোচম্যানেরা এক এক দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। বরুণ কহিলেন "এখানে গাড়ির মাইল প্রতি দর ঠিক থাকায় লোকের কেমন সুবিধা হইয়াছে দেখ। ঠাকুরদা! হাবড়া দেখবেন?"

ব্রহ্মা। না ভাই, হাবড়া দেখা এক্ষণে থাক, অগ্রে আমাকে গঙ্গার সহিত দেখা করায়ে দেও। দেখ বরুণ! এখানে আসিয়া আমার মনে যেন এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইতেছে, চতুর্দ্দিকে যত চাহিয়া দেখিতেছি— আমার বোধ হইতেছে এ যেন আমার সৃষ্টি নহে। আর কাহারও নূতন সৃষ্টি।

এখান হইতে যাইয়া সকলে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। পিতামহ জলের নিকট যাইয়া "গঙ্গা" "গঙ্গা" শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

বরুণ। এস আমরা সকলে পিতামহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকি; নচেৎ এ বড় কদর্য্য দেশ, দেখতে পেলে লোকে পিতামহকে ঠাট্টা করিবে, পাগল বলিয়া গাত্রে ধূলা ও জলের ছিটা দেবে।

এই সময় পিতামহ নয়ন মুদ্রিত করিয়া গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন। হে গঙ্গে! তুমি সমুদয় সংসারের জননী। মা তুমি মনোহর পুষ্পমালার ন্যায় শঙ্করের শিরে শোভা পাইয়া থাক, আজ মর্ত্ত্যে তোমার এ কিরূপ অবস্থা দেখিতেছি? লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, মল মূত্র ত্যাগ করিতেছে, শ্লেষ্মাদি জলে নিক্ষেপ করিতেছে; অতএব তুমি কি সুখে আর এখানে রহিয়াছ? দেবি! তুমি তরঙ্গিণীর অগ্রগণ্য হইয়াও কলিকাতার যে কিছুই করিতে পার নাই দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তুমি সমুদায় গুণের আধার তজ্জন্যই কি ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ? তোমার চরণ কমল সংসাররূপ মহাসমুদ্রের তরণীস্বরূপ। তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করিলে দেবলোক অপেক্ষা দুর্লভ স্থান লাভ হয় জানিয়া লোকে যখন অবমাননা করিতেছে তখন কি সুখে আর মর্ত্ত্যে আছ? মা! আমি তোমার সলিল স্পর্শ করিয়া কাঁদিতেছি, আর কাঁদাও না। আমি সমস্ত পথ তোমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছি, আর কাঁদান কি উচিত হয়? যদি দেখা না দাও, আজ তোমার জলে

জীবন দান করবো। তুমি কি জান না আমি কি জন্য এ প্রচীন বয়সে স্বর্গ ছেড়ে নরকে এসেছি? ইংরাজরাজ তোমায় এত কি সুখী করেছেন যে, এ বুড়ো বাপকে বিস্মৃত হইলে? জলে ইংরাজের শত শত জলতরী ভাসিতেছে, তীরে ইংরাজ রাজধানী কালকাতা শোভা পাইতেছে, এই সুখেই কি আমার প্রতি যে স্নেহ মমতা ছিল বিসর্জ্জন দিয়াছ? এই সুখেই কি এখানে এত স্ফীত কলেবরে বিরাজ করিতেছ?

এই সময় ভাগীরথী তরঙ্গমালাকে কহিলেন "সখি! চেয়ে দেখ তীরে দাঁড়াইয়া আমার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতেছেন। চেয়ে দেখ—দেবরাজ জলাধিপতি এবং যাঁহার চরণ হইতে আমার উৎপত্তি হয়, সেই দেব দেব নারায়ণ আমার তীরে বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উহঁাদের কষ্ট দেখে আজি বড় কষ্ট পেলাম। যে ভারতের লোক প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে যে দেবগণের নামোচ্চারণ না করিয়া কোন কাজ করেন না, আজ সেই ভারতের দেবগণের ওভাবে আগমন দেখিয়া আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। সখি! আমি দুঃখে কষ্টে যে এত অস্থির; কিন্তু আজ ইহঁাদের কষ্ট দেখিয়া আমার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। ত্বরায় তুমি সকলের পদ প্রক্ষালন করিয়া দেও।"

তরঙ্গমালা তৎশ্রবণে "ধড়াস" "ধড়াস" শব্দে সকলের পদ প্রক্ষালন করিতে যাইয়া পাছুকা দৃষ্টে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তৎপরে কল্লোলিনী কল কল শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পিতামহের চরণে প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মা। এই আমার মা! মা তোর কি দয়া নেই? আমি সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে এলাম, আমাকে কেন এত কাঁদালে? আজ তোমার শরীর এমন মলিন, কেশসকল ছিন্ন বিছিন্ন এবং শরীরে গাত্রাভরণ নাই কেন?

গঙ্গা। পিতঃ! আপনি আমাকে দেখিবার জন্য সমস্ত পথ কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন সত্য; কিন্তু চেয়ে দেখুন কি প্রকার বেঁধেছে। ও বন্ধন ছিন্ন না করিয়া কি আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য আছে?

পিতামহ তৎশ্রবণে পোলের প্রতি চাহিলেন। বন্ধন দেখিয়া তাঁহার মনে আতঙ্কের উদয় হইল, বুক দুপ দুপ করিতে লাগিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বরুণ। যখন প্রথমে এই পোল প্রস্তুত হয়, আমরা ভাঙ্গিবার জন্য

বিধিমত চেষ্টা পাইয়াছিলাম এবং সাইক্লোন (মহাঝড়) কেও পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু সে অল্প সময় মাত্র যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ পাছে ধ্বংস হয়, এই আশঙ্কায় অধিক বলপ্রয়োগ করিতে পারে নাই।

গঙ্গা। বাবা! তুমি বিধাতা। তোমার কাজ সকলের ভাগ্যে সুখ দুঃখ লেখা; কিন্তু আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে এত কি অপরাধ করেছি যে, আমার ভাগ্যে এত কষ্ট লিখেছ? তোমার কি আমার কপালে লিখিবার সময় হাতে অন্য কাজ না থাকায় যা মনে এসেছে তাই বসে বসে মক্সো করেছ? নচেৎ দেবকুলে, অসুরকুলে, নরকুলে এ হতভাগিনী এ চির দুঃখিনীর মত দুঃখ ভোগ করতে কে আছে? আমার এমনি কপাল যে রাজা লোকের দুঃখ দূর করেন, তিনিই স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এ অবলার প্রতি অযথা অত্যাচার করতেছেন। তিনি আমাকে যেখানে সেখানে বাঁধতেছেন, বাঁদীর মত আহাজ ও ষ্টীমার বয়ায়ে বয়ায়ে কোমর ভেঙ্গে দিতেছেন; এত করেও তাঁহার সাধ মেটে নাই আবার এক সপত্নী জুটায়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মা। সে কি মা! তোমার আবার সপত্নী!!

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা! কলের গাড়িই আমার সপত্নী হয়েছে। আমি সকল বর্ণ, সকল পাপী ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিকে সন্তোষের সহিত কোলে স্থান দান করতাম, এক্ষণে সে সেই কাজ করতেছে। পূর্ব্বে নৌকাদিতে আমার উপর দিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি আসিত বলিয়া মহাজনেরা সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আমার পূজাদি করিত; এক্ষণে সে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বক্ষে করে বহন করিয়া আনায় আমার সে সুখটুকুও গিয়াছে। আমার জলে জীবন ত্যাগ হইলে লোকের স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এজন্য যে একটা ভক্তি ছিল, তাহাও দিন দিন যাইতেছে। কারণ, সে জীবগুলোকে সজ্ঞানে বহন করে স্বর্গদ্বার বারাণসী প্রভৃতি স্থানে সদাই রাখিয়া আসতেছে। তাহার সুখের দশা দেখে আমার হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতিগুলো ষ্টেষণমাষ্টার প্রভৃতি রূপে গিয়া তাহারই ওখানে বিরাজ করতেছে। আমার চুনাপুটীরাও সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেরাণীরূপে বিরাজ করতেছে। ধীবরেরা তথায় যাইয়া উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়া মধ্যে মধ্যে জেপলা ফেলে সেই সমস্ত চুনাপুটীর প্রাণ লইতেছে। পিতঃ! আমার সকল সুখই গিয়াছে, দুঃখ ভোগের জন্য আর কেন এখানে রেখেছেন। আমি একে মনের দুঃখে কাতর, তাহার উপর আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা আসিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে বিস-

র্জ্জন দিয়া আমার তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে, পতি আসিয়া পত্নীকে চিতার উপরি শয়ন করাইয়া শোকে তাপে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অনন্ত চিতাতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; স্ত্রী আসিয়া জীবনাধিক ধন স্বামীকে এই স্থানে রাখিয়া কপালে করাঘাত ও ক্রন্দন করিতেছে; বাবা আমার যখন সবই গিয়াছে, এ গুলো আর দেখতে হয় কেন? আর আজ কাল দেশেরই বা এমন দশা কেন? আগে ত বুড়া মা বাপকে ফেলে উপযুক্ত ছেলে পলাত না, আগে ত পতি; পত্নীকে অসময়ে অসহায়া করিয়া চলে যেত না, আগে ত স্ত্রী পতির প্রতি বিমুখ হয়ে অসময়ে পতিকে এমন কাঁদাত না। বাবা! আজ কাল দেশের দশা কেন এমন হলো? কালের পরিবর্ত্তনে কি তোমার হাতের লেখাও ফিরে দাঁড়ায়েছে?

ব্রহ্মা। না মা! আমার লেখা ঠিকই আছে। তবে লোকে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিশেষতঃ ইংরাজী ঔষধ খেয়ে খেয়ে আমার লেখাগুলোকে মুছে ফেলচে। যাহা হউক, ভাগীরথি! তোমার কষ্ট শুনে মনে বড় কষ্ট পেলাম। সকলই অদৃষ্ট! তুমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মনের কষ্ট দূর কর।

গঙ্গা। অদৃষ্ট সত্য, কিন্তু আমার মত দুরদৃষ্ট কার? দেখ বাবা ঐ যে বেঁধেছে উহার উপর দিয়া দিন রাত কামাই নেই অনবরতই গাড়ি ঘোড়া যাচ্চে। আর হাজার হাজার লোক পারাপার হোচ্চে। সকলেরই ভাগ্যে একটু বিশ্রামের সময় আছে, আমার ভাগ্যে চক্ষের পল ফেলিবার সময় নেই। রজনীতে ব্যথিত শরীরে যদি একটু নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করি, অমনি বুকের উপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ি গিয়ে ঘুম ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্মা। আ মরি! মরি!

গঙ্গা। দুঃখে কষ্টে যদি আমার পেটে চড়া পড়ে, কেটে খণ্ড খণ্ড করে। আমি কোন দিকে যাব না বল্লে জোর করে কেটে সেই দিকে নিয়ে যায়। এখন ভাবি হায়! যে বেগ আমার শঙ্কর ভিন্ন ধারণ করিতে পারিতেন না, সেই বেগ নিয়ে ইংরাজেরা এক্ষণে কি নাচানই নাচাচ্চে! তার পর শোন—বড় বড় জাহাজ ও ষ্টীমার বয়ে বয়ে আমার কোমর ভেঙ্গে যায়, আমি পারবো না বল্লে অমনি ছাড়ে না দুই খানা কল ছুতে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়।

ব্রহ্মা। আহা! মা তোর কপালেও এত দুঃখ!

গঙ্গা। দুঃখ বলে দুঃখ। আমি যেমন নিজ গর্ব্বে ফেটে মরতাম। সপত্নী পতিবক্ষে পদ দিলেন দেখে মস্তকে উঠে বসলাম, তেমনি ছত্রিশ বর্ণ আমাকে পদ দিয়ে দলাচ্চে। বাবা! লোকে বলে যখন গঙ্গার উপর দিয়া কুক্কুর শৃগাল পার হবে, তখন তাঁর মাহাত্ম্য থাকবে না। এখন ত তা হোচ্চে, তবে ত আমার মাহাত্ম্য নাই। যদি মাহাত্ম্য নাই, তবে আমার মরণ হোচ্চে না কেন? আমার উপর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, ঐ দেখ দাঁড়ি মাজিরা দাঁড়ে বসে জলে মল মূত্র পরিত্যাগ করচে, ঐ দেখ লোকে স্নান করতে করতে শ্লেষ্মাদি নিক্ষেপ করচে, ঐ দেখ সাহেবেরা আমার পর পার কিরূপে বাঁধেছে। উঃ! মা পোলের উপর দিয়া এক সঙ্গে ৫০। ৬০ খান গাড়ি গেল। বাবা। মরণ কেন হলো না? আমি যে আর কষ্ট সহ্য করতে পারি নে।

ব্রহ্মা। গঙ্গে! মা আমি তোমাকে সত্বরেই স্বর্গে লইয়া যাইব। তোমার দুঃখ দূর হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। আমি তোমাকে কি বলে বিদায় দিয়াছিলাম তা কি তোমার স্মরণ নাই? বলেছিলাম ভাগীরথি! যখন বন নগর ও নগর বন হইবে, যখন তুমি সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কোন স্থানে স্রোতস্বতীর ও কোন স্থানে শুষ্কের আকার ধারণ করিবে, যখন লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি তোমার উপর থাকিবে না, সেই সময় তুমি স্বর্গে চলিয়া আসিবে। তা ত মা সকলই ঘটেছে তবে আর দুঃখ কেন? আর ১০। ১৫ বৎসর ধৈর্য্য ধরে থাক, আমি তোমাকে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে স্বর্গে লইয়া যাইব।

গঙ্গা। বাবা! ভুলো না! তা হলে আমি আত্মহত্যা করবো। মা কেমন আছেন?

ব্রহ্মা। ভাল আছেন।

গঙ্গা। তোমরা যাবে কোথায়?

ব্রহ্মা। তোমায় দেখতে এসেছিলাম। মনে করচি একবার কলকাতাটা দেখে যাব।

গঙ্গা। যাবে বৈকি, এমন সহর আর নাই। খুব সাবধানে থেকো, মধ্যে মধ্যে স্নান করতে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যেও।

ব্রহ্মা। তবে কি আমরা এক্ষণে বিদায় হইতে পারি?

গঙ্গা। কি করে থাকতে বলি কে আবার দেখতে পাবে; বাবা! ভুলো না, আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারচি নে।

পিতামহ গঙ্গার প্রতি চাহিতে চাহিতে সজল নেত্রে দেবগণের সহিত পোলের উপর উঠিয়া সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ করেছে কি হ্যাঁ! ইংরাজ ক্ষমতাকে বলিহারি। আচ্ছা পোলটী ত কাষ্ঠনির্ম্মিত, ভাদ্দরে জলে কাঠ কখানা ভাসায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?

বরুণ। সাধ্য কি! এই সেতু এমনি কৌশলে নির্ম্মাণ করেছে,যতই কেন জলবৃদ্ধি হউক না উপরে ভাসিতে থাকিবে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা! চেয়ে দেখ কত কলের জাহাজ জলে ভাসচে। এক এক খানার মাস্তুল আকাশে ঠেকেছে। সেই মাস্তুলের উপর উঠে ইংরাজ নাবিকেরা রসারসি বাঁধছে। মিন্সেগুলোকে এখান হতে যেন এক একটী বানরের মত দেখাচ্চে। আচ্ছা কর্ত্তা জেঠা! ওরা যদি হাত-ফসকে পড়ে মরে হাড় পাঁজরা গুলোকে কি আস্ত পাওয়া যাবে?

নারা। আচ্ছা বরুণ! এই সমস্ত বৃহদাকার জাহাজসকল কি উপায়ে পোলের নিম্ন দিয়া যাতায়াত করে?

বরুণ। সপ্তাহের মধ্যে নির্দ্ধারিত দিন আছে। ঐ দিন পোলের স্থান বিশেষ কৌশলে খুলিয়া জাহাজসকলকে বাহির করিয়া দিয়া আবার পথ বন্ধ করে।

দেবগণ দেখেন জলে নানা আকারের জল যান সকল ভাসিয়া যাইতেছে, আসিতেছে এবং কোন কোন খানি তীরে লাগিতেছে। কোন খানিতে মাল বোঝাই, কোন খানিতে আরোহী বোঝাই, কোন কোন খানি কলিকাতায় মালামাল নামাইয়া দিয়া শূন্য দেহেই প্রস্থান করিতেছে। পিতামহ কহিলেন, সার্থক ইংরাজের বুদ্ধিবল, সার্থক ইংরাজের ক্ষমতা; নচেৎ স্রোতস্বতীকে এমন স্থির ভাবে রাখিয়া জলোপরি সেতু ভাসাতে এই দেখলাম কলিকালে, আর সেই দেখেছিলাম ত্রেতাযুগে।

কলিকাতা।

ক্রমে সকলে পর পারে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, পিতামহ আসুন আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া লই। এ সহরে বড় চোরের ভয়, দ্রব্যাদি সাবধান করিয়া তবে স্নান করিতে হইবে।

ইন্দ্র। বরুণ! বল কি, এ সহরে চোরের ভয়? যে রাজা সমগ্র সুশাসনে রেখেছেন, যাঁহার শাসনগুণে গ্রাম নগর ও বন জঙ্গলসকল দস্যুশূন্য হইয়াছে, তাঁহার রাজধানীতে চোরের ভয়! এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা!!

ব্রহ্মা। বরুণ! মা আমার চঞ্চল, এজন্য পাছে কলিকাতা মহানগরী উৎসন্নসাৎ করেন, এই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বেঁধেছে দেখ?

বরুণ। আজ্ঞে, পোর্ট কমিশনরেরা জাহাজের মালামাল নামাইবার ও উঠাইবার সুবিধার জন্য এইরূপ করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে। ঐ পোর্ট কমিশনরের ভাগীরথীতীরে এক হইতে সাত নম্বর পর্য্যন্ত জেঠী আছে। জেঠীতে বিস্তর ইংরাজ ও বাঙ্গালী চাকর খাটিতেছে। ঐ দেখুন এক খানি জাহাজ জেঠিতে লাগাইয়া আছে এবং তাহার মাল নামাইয়া ওজন করা হইতেছে।

ইহার পর বরুণ দ্রব্যাদি আগলাইতে লাগিলেন এবং দেবগণ জলে নামিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। সকলে স্নান সমাপন করিয়া যেমন তীরে উঠিয়াছেন, এই সময় একখানি আফিসের কেরাণী বোঝাই নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল: কেরাণীর দল আফিসের সাজ পোষাক করিয়া যেমন পাদুকা পরিতেছেন এমন সময় এক দল চাচা পাঁউরুটী ও বিস্কুটের চাঙ্গারি মাথায় করিয়া ছুটিয়া যাইল। বাবুর দল স্ব স্ব অবস্থা মত ২।১ পয়সার কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে বসিলেন।

নারদ। বরুণ! উহারা কারা?

বরুণ। উহারা আফিসের কেরাণী। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সকলে উহাদের বাস। ঐ দলের প্রায় অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। উহারা কলিকাতার আফিসে কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এজন্য প্রাতে বাটী হইতে আহার করিয়া ১০।১৫ জনে ভাগে এক খানি নৌকা ভাড়া করিয়া এখানে আইসে এবং দিবাবসানে কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে বাটী যায়। প্রাতে আহার করায় এক্ষণে জঠরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠাতে ঐ রুটী বিস্কুটগুলি তাহাতে আহুতি দিতেছে। বিশেষতঃ আফিসে যাইবার পূর্ব্বে একটু একটু খেয়ে না নিলে সমস্ত দিনই বা গাধা খাটুনি খাটিতে পারবে কেন?

ব্রহ্মা। শ্রীবিষ্ণু! য়্যাঁ! ব্রাহ্মণের ছেলে! বরুণ! পলাই চল, ওসব দেখলেও আমাদের পাপ আছে।

উপ। কর্ত্তা জ্যাঠা! কলকাতায় যদি আমার একটু কাজ কর্ম্ম হয়, ওদের মত পেট পুরে টিপিন্ করবো।

ব্রহ্মা। তুমি উৎসন্ন যাও কুলাঙ্গার! ওরা কি খাচ্চে দেখচো না? বরুণ! ওদের পাপের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে?

বরুণ। উহাদের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিদিনই হইয়া থাকে। আফিসে যতক্ষণ থাকেন, দেশী কি বিলাতী সাহেব সমস্ত সময় কটু বলে তিরস্কার করেন। যাহার ভাগ্যবল অধিক, তাহার সপাদুক চরণাঘাতও লাভ হয়।

ইন্দ্র। সাহেব কি আবার দেশী বিলাতী দু রকম আছে?

বরুণ। আছে বৈ কি। কতকগুলি সাহেব যথার্থ বিলাতজাত, তাঁহারাই বিলাতী; আর কতকগুলি সাহেব এ দেশজাত তাহারাই দেশী বা ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গিরা যে আফিষের কর্ত্তা, তথাকার কেরাণীদিগের কষ্টের এক শেষ। ঐ হতভাগারা প্রায়ই প্রভুর নিকট মিষ্ট কথা শুনিতে পায় না। বিলাতীগুলি অনেক ভাল, তাঁহারা কখন কখন কামড়ান বটে; কিন্তু দেশীগুলোর ন্যায় দিন রাত খেঁউ খেঁউ শব্দে চীৎকার করেন না। দেখুন পিতামহ! আমরা অতঃপর কলিকাতায় এলাম। এখানে বাসা ইত্যাদি স্থির করিতে অনেক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। আপনার প্রাচীন শরীর অসময়ে আহার করিলে বড় কষ্ট হইবে। অতএব ঐ নিকটস্থ দোকান হতে লেবু, আক, কলা, আতা, পেঁপে জলযোগ করলে হয় না?

পিতামহ সম্মতি প্রকাশ করিলে দেবগণ জলযোগ করিতে বসিলেন। নারায়ণ আকের টিকলি মুখে দিয়া কহিলেন "বরুণ! এ সহরের নাম কলিকাতা হইল কেন?"

উপ। ঠাকুর কাকা! আমি জানি, বল্‌বো? ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি—কলিকাতায় প্রথমে অত্যন্ত জঙ্গল ছিল। সাহেবেরা সেই জঙ্গল কেটে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই বন কাটানোর সদ্দার সাহেব জঙ্গলের মধ্যে একটি সুন্দর গাছ দেখে লাঠি করবার জন্য রাখতে বলেন, কিন্তু কুলিরা তাহা কাটিয়া ফেলে, ইহাতে সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কহিলেন "কব্ কটা?" একজন কুলি কহিল "কল্ কাটা।" সেই কল্‌কাটা হইতে বর্ত্তমান কলিকাতা নাম হইয়াছে।

ইন্দ্র। সত্যি বরুণ?

বরুণ তা কেন হবে? তবে পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলপূর্ণ ছিল বটে; ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলির কুঠির এজেণ্ট জব চার্ণক সাহেব ১৬৯০ অব্দের ২৪ আগষ্ট এই নগর নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতা সংস্থাপনের পূর্ব্বে জঙ্গল মধ্যে কালীর মন্দির থাকায় বর্ত্তমান কলিকাতা নাম হইয়াছে।

জলযোগ শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব পোটলা পুটলি হস্তে লইয়া নিকট দিয়া বড় বাজারের অভিমুখে চলিলেন। বরুণ পিতামহের হস্ত ধরিয়া অতি সাবধানে ফুটপথের উপর দিয়া চলিলেন এবং দেবগণকে কহিলেন " তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রদর্শিত পথ দিয়া আইস। নচেৎ সদর রাস্তা দিয়া গেলে যেরূপ গাড়ি ঘোড়ার ভিড় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সকলে বরুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলেন। তাঁহারা যে দিকে চাহেন, দেখেন অসংখ্য অট্টালিকা শ্রেণী, অসংখ্য বিপণি-শ্রেণী শোভা পাইতেছে। রাস্তা দিয়া ইংরাজ, বাঙ্গালী, ইহুদী, মুসলমান, কাফ্রি, মগ, চীনে, কাবুলে প্রভৃতি নানা দেশের লোক চলিতেছে। কোন দিক হইতে পোঁইস পোঁইস শব্দে একখান বগী ছুটিয়া যাইতেছে। রাস্তার পার্শ্ব দিয়া ক্যাঁ কোঁচ শব্দে গোরুর গাড়ি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথ দিয়া অনবরত লোক চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে " চাই জল খাবার " রিপু সেলাই " শব্দ হইতেছে। ভিস্তিওয়ালা রাজমার্গে জল ছিটাইতেছে, মেথরেরা ঝেটা বগলে ছুটিয়াছে। ময়লা ফেলার খালি গাড়িগুলো ঘড় ঘড় শব্দে ছুটিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এমন সহর ত কখন চক্ষে দেখি নাই!

নারা। এখানকার সকল লোককেই যেন ব্যগ্রতার সহিত রাস্তায় চলিতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

বরুণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই পয়সার অনুসন্ধানে চলিয়াছে। এই কলিকাতা সহরে লক্ষ্মী নানা রূপে বিরাজ করিতেছেন। যে সুচতুর, সে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ধন উপার্জ্জন করিতে পারে। আর যে আমাদের উপোর মত, তাহার ভাগ্যে এখানে অন্ন মিলে না।

ক্রমে সকলে গল্প করিতে করিতে বড় বাজারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সবিস্ময়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। যেদিকে চাহেন দেখেন বড় বড় দোকান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি, বৃহদাকার অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে। খরিদারের ভিড়, গাড়ি ঘোড়ার ভিড়, মাল আমদানী রপ্তানীর ভিড় দেখিয়া দেবগণ অবাক হইলেন।

বরুণ বড় বাজারের মধ্যে একটী দোতালা বাসা স্থির করিয়া দেবগণের সহিত উপরে উঠিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া উপোকে সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে চলিলেন। দেবগণ ছাদে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সহরের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বরুণ ও উপো একজন মুটের সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। দেবগণ মুটের মাথা হইতে দ্রব্যাদি নামাইয়া লইয়া অগ্রেই ঘসী দেখে হাস্য করিতে লাগিলেন। এবং ফু দিয়া উড়াইবার জন্য নারায়ণ অনেক চেষ্টা করিলেন।

বাসায় একটী জলের পাইপ ছিল। বরুণ কহিলেন, তোমরা সকলে ঐ কলের জলে মুখ হাত ধুয়ে লও। জলের কলের নাম শুনিয়া দেবগণ সেই দিকে ছুটিয়া যাইলেন, কিন্তু জল বাহির করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে বরুণ হাসতে হাসতে যাইয়া দেখাইয়া দিলে দেবগণের আনন্দ দেখে কে, ইনি একবার জল বাহির করেন, উনি একবার জল বাহির করেন। এই প্রকার অনবরত জল নষ্ট করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া কহিলেন "বরুণ! এ করেচে কি? য়াঁ।! মাটীর মধ্য দিয়া কল টেনে এনে দোতালার উপর জল দিয়ে যাচ্চে? সার্থক এদের বুদ্ধিবল!!

বরুণ স্বয়ং আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অপরাপর দেবগণ আহারের কথা ভুলিয়া কেবল জলের কলই দেখিতেছেন। উপো কখন কখন হাঁ করিয়া পাইপের নিকট মুখ দিয়া জল পান করিতেছে।

আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকলে আহার করিলেন এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সকলে সহর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বরুণ কহিলেন সকলে খুব সাবধানে চল, বড় বাজারের ভিড়ে হরাইলে আর খুঁজে পাওয়া যইবে না।

সকলে অতি সাবধানে হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছেন। একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন কয়েকজন মাতাল মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া "যুদ্ধং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" শব্দে চীৎকার করিতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া একজন গুলিখোর শঙ্কিত ভাবে এক দৃষ্টে চাহিতেছে এবং অপর পথিকদিগকে সেই পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিতেছে। সে কহিতেছে, নচ্ছার

মেটারা মদ খেয়ে মরে কেন? এর চেয়ে যদি গুলি ধরে, পথের মাঝে এমন লোক হাসাহাসি করতে হয় না।

ব্রহ্মা। বরুণ! রাস্তায় গোল করিতেছে এরা কারা? আর পথিকদিগকে সবধান করিয়া দিতেছে, ঐ ভদ্র লোকটাই বা কে?

বরুণ। গোল করিতেছে ইহারা মাতাল। আর সাবধান করিয়া দিতেছে গুলিখোর। গুলিখোরেরা মাতালদিগকে বড় ভয় করে।

ইন্দ্র। রাস্তায় মতালেরা গোল করিতেছে, রাজা যে কিছু বলেন না?

বরুণ। এখুনি পাহারওয়ালারা দেখ্‌তে পেলে ধরে নিয়ে যাবে, তোমরা চলে এস।

এখান হইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ দেখেন একটী বাড়ীতে অসংখ্য গোরা রহিয়াছে। তাহাদিগকে আবার পাহারাওয়ালারা রক্ষা করিতেছে।

নারা। বরুণ! ঐ স্থানটী কি? দেখলে বোধ হয় যেন শ্বেত নরক।

বরুণ। উহার নাম সেলরহোম অর্থাৎ জাহাজের নাবিকদিগের থাকিবার ঘর। বিলাত হইতে কোন জাহাজ এখানে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র এই স্থানে আনিয়া সেলরদিগকে অবরুদ্ধ করে। এবং পাছে তাহারা মাতাল হইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের প্লীহা ফাটায়, এই আশঙ্কায় পাহারা দিয়া রক্ষা করাইয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিকে ৫। ৭ টা গোরাকে কতকগুলি পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে যাচ্চে কেন?

বরুণ। উহারা এই সেলর হোমের সেলর। মদ্যপানে মাতাল হওয়ায় পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্চে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি বল্লে প্লীহা ফাটায়। প্লীহা ফাটানর অর্থ কি?

বরুণ। আজ্ঞে! আপনার সৃষ্ট মনুষ্যমাত্রেরই পেটে প্লীহা আছে। বিলাতী ডাক্তরেরা বলেন ঐ প্লীহায় মধ্যে মধ্যে রং ধরে, ডাঁসায় ও পাকে। তাঁহারা আরও বলেন "মনুষ্যমাত্রেরই প্লীহার সহিত নাসারন্ধ্রের একটী অপূর্ব্ব সংযোগ আছে। এজন্য কেহ কাহারও উপর সোহাগ করিয়া নাকে যদি ঘুষি মারে আর সেই সময় যদি প্লীহাটী পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া গিয়া মনুষ্যটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মা! বরুণ! আমি সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু কখন প্লীহা ফাটার কথা শুনি

নাই। আজ কাল মর্ত্ত্যে আসিয়া সকলই নূতন শুনিতেছি ও নূতন দেখিতেছি। তবে প্লীহা যে পাকে, ইহা আমি স্বীকার করি। রুগ্ন অবস্থায় কুপথ্য করিলে কিম্বা সুস্থাবস্থায় মদ্যাদি পান করিলে সময়ে সময়ে প্লীহা পাকিয়া থাকে এবং সেই পাকা প্লীহা সেই হতভাগ্যকে গ্রাস করে বটে কিন্তু ফাটে না। যাহা হউক, এস্থান হইতে পলাই চল, কি জানি পাছে প্লীহা ফাটায়ে দেয়!!

দেবগণ দ্রুতপদে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটী বাড়ীর সন্নিকটে অসংখ্য ঘোড়ার গাড়ী রহিয়াছে। কতকগুলি গাড়ী বাবু বোঝাই করিয়া আনিতেছে ও প্রস্থান করিতেছে এবং অসংখ্য লোক ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমন করিতেছে।

উপ। বরুণ কাকা! এ বাড়ীতে কি অতিথি সৎকার হোচ্চে।

নারা। সত্য বরুণ! এ বাড়ীতে এত লোক জন যাতায়াত করচে কেন?

বরুণ। ইহার নাম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। এই স্থানে নোটের জন্ম হয় এবং লোকে নোটের বিনিময়ে টাকা ও টাকার বিনিময়ে নোট খরিদ করিয়া থাকে।

ইন্দ্র। একবার ভিতরে চল না, দেখে আসি। কারণ, স্বর্গে যাইয়া টাকার বিনিময়ে কাগজ চালাইবার ইচ্ছাটা আমার অনেক দিন হইতে হইয়াছে। অতএব বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ধরণ ধারণগুলো দেখে লওয়া আবশ্যক হইতেছে।

বরুণ এ কথায় সম্মত হইলেন এবং দেবগণকে ভিতরে লইয়া গিয়া তৎপরে উপরে উঠিলেন এবং কয়েকটী বাবুকে স্ব স্ব অভিলাষ জানাইয়া এক এক খানি পাশ লইয়া সকলে ব্যাঙ্ক দেখিতে চলিলেন।

তাঁহারা দেখিয়া অবাক। দেখেন বাক্সিকের মধ্যে স্তরে স্তরে টাকার তোড়া সাজান রহিয়াছে। সঙ্গিন চড়ান সেপাইগণ পাহারা দিতেছে। উপ টাকার তোড়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—উহার মধ্য হইতে ২। ৩ তোড়া যদি দেয়,তাহা হইলে আর চাকরী করি নে,ব্যবসা করে কাটাই। দেবগণ দেখেন ব্যাঙ্কে লোক জনের ভয়ানক জনতা। কেহ নোট ভাঙ্গাইতেছে, কেহ নোট খরিদ করিতেছে, কেহ কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতেছে, কেহ সেই কাগজ কিনিতেছে। কাহারও হাতে এক তোড়া নোট, কাহারও

হাতে কতক গুলো কোম্পানীর কাগজ এবং কাহার কাহার হাতে কতক গুলি করিয়া চেক রহিয়াছে। কোন ঘরে পাল্লা করিয়া টাকা ওজন করিয়া দিতেছে। কোন ঘরে ব'সয়া কতকগুলি কেরাণী লেখা পড়া করিতেছে। এবং কোন কোন ঘরে ঝন্ ঝন শব্দে টাকা ঢালিতেছে। দেবরাজ নোটবুকে কোম্পানীর কাগজের আকার ও দীর্ঘে প্রস্থে কত লিখিয়া লইলেন।

উপ। বরুণ কাকা! এখান থেকে পলাই চল; টাকার শব্দে কাণে তালা লাগিবার জোগাড় হয়েচে।

বরুণ। ও যে পরের টাকা! ভাল উপো, ঐরূপ শব্দ করে যদি তোরে কেউ টাকা দেয়?

উপ। আহা! তাহা হলে কাণে যেন সুধা বৃষ্টি হয়।

দেবগণ ব্যাঙ্ক দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় দুটী বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অনু-সন্ধানে জানিলেন, তাঁহাদের কতকগুলি নোট হারাইয়াছে পাছে কেহ খোয়া নোট পাইয়া ভাঙ্গাইয়া টাকা লয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা ব্যাঙ্কে নোটের নম্বর জমা দিতে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! উহাদের কি হয়েচে আমি ত ভাল বুঝিতে পারিলাম না?

বরুণ। প্রত্যেক নোটে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী নম্বর থাকে। অর্থাৎ এক নম্বরের নোট দুই কেতা প্রস্তুত হয় না। এ জন্য যদ্যপি কাহার কোন নোট খোয়া যায়, অগ্রে ব্যাঙ্কে জানাইলে খোয়া নোট ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নম্বর থাকায় জাল নোটও সহজে ধরা পড়িয়া থাকে।

ব্রহ্মা। উঃ! ইংরাজের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি!!

এই সময় পূর্ব্বোক্ত বাবু দুটী প্রত্যাগমন করায় বরুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, খোয়া নোট ইত্যগ্রে ভাঙ্গান হইয়া গিয়াছে।

আবার সকলে রাস্তার ধারে ধারে চলিলেন। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন "উঃ! বাবা! দক্ষিণ দিকে একটা গলি গিয়াছে দেখ? দেবগণ চাহিয়া দেখেন গলির মধ্যে একটা ত্রিতল বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে নরদা-মার ধারে একটী লোক বসিয়া আছে। শীতপ্রযুক্ত তাহার গাত্রে একখানা মোটা বস্ত্র, মস্তকে পাতলা চাদরের পাগড়ী বাঁধা। দেবগণ ঐ ব্যক্তি প্রস্রাব করিতেছে ভাবিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন; কিন্তু সে আর

উঠে না। তখন নারায়ণ দ্রুতপদে সেই দিকে যাইলে লোকটা উঠিয়া এক দিকে পলাইল। নারায়ণ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে দেখেন সেই ত্রিতল বাড়ীর উপর হইতে পৈত্যার সুতায় বাঁধা একটা শাল-পাতার ঠোঙ্গা নামিতেছে। নারায়ণ তদ্দৃষ্টে সেই লোকটার ন্যায় নরদামার নিকট বসিয়া ঠোঙ্গার প্রতি পিট পিট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঠোঙ্গাটী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে সুতা হইতে পট করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া দেবগণের নিকট দে দৌড়।

দেবগণ ঠোঙ্গা খুলিয়া আর হাসিয়া বাঁচেন না। দেখেন ঠোঙ্গাটী লুচি কচুরিতে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন ঠোঙ্গাটীতে কয়েকটা পানের খিলি ও একখানি পত্র ছিল। পত্রখানি স্ত্রীলোকের হস্তলিখিত। পত্রে লেখা রহিয়াছে ;—

"ভাই! আজি অবশ্য অবশ্য আসিবে। এবার আসিলে বিফল হইবে না। আমি বাটীর ঝিকে কিছু খাওয়াইয়া সম্মত করিয়াছি। সে তোমাকে অতি গোপনে বাটীর মধ্যে আনিবে। আমার অনেক দিনের সাধ আছে তোমাকে নিকটে বসাইয়া জলখাওয়াইব ; কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটে না। আজি নূতন উপায়ে তোমার হস্তে পত্র ও জলখাবার দিতেছি, আমার মাথার দিব্য এগুলি খেও।"

তোমার একান্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী—
শ্রীমতী—

দেবগণ পত্র পাঠ করেন আর হাস্য করেন। পিতামহ তদ্দৃষ্টে কহিলেন "তোরা এত হাসছিস্ কেন, বল না?"

বরুণ। আপনার আর শুনে কাজ নাই।

"ঠাকুর কাকা! চিঠি খানা দেওনা, পড়ে দেখে আমিও একটু হাসি" বলিয়া, উপ যেমন নারায়ণের হস্ত হইতে পত্র লইতে গিয়াছে নারায়ণ অমনি ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাস্তা দিয়া একটী লোক যাইতেছিল কহিল "মহাশয়, ওরূপ করে মার্‌বেন না, পশুর প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা দেখতে পেলে বিরক্ত হবেন।"

"উপ, খা" বলিয়া, দেবরাজ সেই মিষ্টান্নপূর্ণ ঠোঙ্গাটী উপোর হস্তে প্রদান করিলেন। উপ সেই গুলো খাইয়া ছুটে গিয়া একটা পাইপ হইতে জল খাইয়া আসিল।

সপ্তম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ৯৯ ॥

রাজা অলব্ধ লাভের ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যে ভূহিরণ্যাদি জয় করা হয় নাই, তাহা জয় করিবেন। লব্ধ পদার্থ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। রক্ষিত বস্তু বাণিজ্যাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করিবেন এবং বর্দ্ধিত দ্রব্য সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন।

এতচ্চতুর্ব্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থপ্রয়োজনং।
অস্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ১০০ ॥

উপরে যে-চারিটী বিষয়ের কথা বলা হইল, উহা পুরুষার্থ যে স্বর্গাদি তল্লাভের উপায়। অতএব অনলস হইয়া নিত্য ইহার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে।

অলব্ধমিচ্ছেৎ দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১০১ ॥

যে দেশ বা যে দ্রব্য জয়লব্ধ হয় নাই, রাজা হস্তী অশ্ব রথ পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্য দ্বারা তাহা জয় করিবেন। জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রত্যবেক্ষণাদি দ্বারা রক্ষা করিবেন, রক্ষিত দ্রব্যের স্থলজলপথাদি বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত দ্রব্য শাস্ত্রানুসারে দান করিবেন।

নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ।
নিত্যং সংবৃতসংবার্য্যো নিত্যং ছিদ্রানুসার্য্যরেঃ ॥ ১০২ ॥

এস্থলে দণ্ডশব্দে হস্ত্যশ্বাদির যুদ্ধাদি শিক্ষা বুঝাইবে। রাজা নিত্য উদ্যতদণ্ড হইবেন, অর্থাৎ রাজা হস্তী অশ্ব ও রথ পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যকে নিত্য যুদ্ধাদি শিক্ষা করাইবেন, শস্ত্রবিদ্যাদি দ্বারা নিত্য নিজ পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, আপনার মন্ত্রণা ও কার্য্যাদি নিত্য সংবরণ করিবেন এবং শত্রুর কোন্ অংশে কি দোষ বা ত্রুটি আছে, নিত্য তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য কৃৎস্নমুদ্বিজতে জগৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ॥ ১০৩॥

যে রাজা নিত্য উদ্যতদণ্ড অর্থাৎ হস্ত্যশ্বাদির যুদ্ধাদি শিক্ষায় নিত্য ব্যাপৃত হন, জগতের যাবতীয় লোক তাঁহাকে ভয় করে। অতএব দণ্ড দ্বারা সকলকে স্ববশে রাখিবেন।

অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ॥ ১০৪॥

রাজা অমাত্যাদির প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন, তাহাদিগকে কখন চাতুরী বঞ্চনাদি করিবেন না। তাহা করিলে তিনি সকলের অবিশ্বাসপাত্র হইয়া উঠিবেন। অমাত্যাদির অবিশ্বাস জন্মিলে রাজারক্ষা হওয়া ভার। পক্ষান্তরে, শত্রুর অমাত্যাদির সহিত কোন প্রকার বিচ্ছেদ আছে কিনা চর প্রেরণ দ্বারা তাহা জানিবেন।

নাস্য ছিদ্রং পরোবিদ্যাৎ বিদ্যাৎ ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেৎ বিবরমাত্মনঃ॥ ১০৫॥

শত্রু যাহাতে প্রকৃতিভেদাদি জানিতে না পারে তাহা করিবেন, কিন্তু চর প্রেরণ দ্বারা শত্রুর প্রকৃতিভেদাদি জানিয়া লইবেন। কূর্ম্ম যেমন নিজ কর চরণাদি গোপন করে, তেমনি আত্মদোষ গোপন করিবেন, অর্থাৎ দান সম্মানাদি দ্বারা অমাত্যাদিকে বশীভূত করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদিগের সহিত কোন প্রকার বিচ্ছেদ করিবেন না। যদি কদাচিৎ বিচ্ছেদ হয়, তাহার প্রতীকার করিবেন।

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥ ১০৬॥

বক যেমন একতান মনে জলস্থ মৎস্য গ্রহণের উপায় চিন্তা করে, রাজা তেমনি স্থির মনে বিপক্ষ রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হইলেও তদ্‌গ্রহণের উপায় দর্শন করিবেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্রকায় হইয়াও প্রবল হস্তিকে আক্রমণ করে, তেমনি রাজা পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রবল রাজাকেও হনন করিবার চেষ্টা করিবেন। পালস্থ পশুগণ সুরক্ষিত হইলেও ব্যাঘ্র যেমন রক্ষকের অনবধানতারূপ সুযোগ পাইয়া রক্ষিত পশু নাশ করে, জিগীষু রাজা তেমনি দুর্গস্থিত বিপক্ষ রাজার অনবধানতা দেখিতে পাইলে তাহাকে আক্রমণ করিবেন। শশ যেমন ধনুর্দ্ধারাদি পরিবেষ্টিত হইলে উল্লম্ফন প্রলম্ফনাদি দ্বারা ধনুর্দ্ধর

ব্যাধদিগকে বিমোহিত করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক গর্ত্তাদি আশ্রয় করে, রাজাও তেমনি প্রবল বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নানা প্রকার কৌশলে তাহাকে বিমোহিত করিয়া অপর কোন পরাক্রমশালী রাজাকে আশ্রয় করিবেন।

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েৎ বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ॥ ১০৭॥

উক্ত প্রকারে বিজয়প্রবৃত্ত রাজার যাহারা বিপক্ষ হইবে, তাহাদিগকে সাম দান দণ্ড ভেদ এই চারি উপায় দ্বারা স্ববশে আনয়ন করিবেন।

যদি তে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতান্ শনকৈর্ব্বশমানয়েৎ॥ ১০৮॥

যদি জিগীষু রাজা সাম দান ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা বিপক্ষ রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিতে না পারেন, যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন।

সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে॥ ১০৯

পণ্ডিতেরা উল্লিখিত চারি উপায়ের মধ্যে সাম ও দণ্ড এই দুটির প্রশংসা করিয়া থাকেন। সাম উপায় দ্বারা যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে অর্থ ও সৈন্যাদি বিনষ্ট হয় না। যুদ্ধপক্ষে অর্থ ও সৈন্যাদি বিনষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইলে আর কোন উপদ্রব শঙ্কা থাকে না। ইহাই ঐ উভয় উপায়ের প্রশংসার কারণ।

যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ ১১০॥

যেমন ধান্যবপনকর্ত্তা ধান্য সহজাত তৃণাদির উন্মূলন করিয়া ধান্য রক্ষা করে, সেইরূপ রাজা দুষ্টের দমন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যেমন ধান্যের মধ্যে তৃণ থাকিলে ধান্যের উন্নতি হয় না, তেমনি রাজ্য মধ্যে দুষ্ট লোক থাকিলে রাজ্যের উন্নতি হয় না। নিজ ভ্রাতা যদি দুষ্ট হয়, তাহারও উন্মূলন করিবেন।

মোহাৎ রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাৎ ভ্রশ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥ ১১১॥

যে রাজা মোহপ্রযুক্ত দুষ্ট শিষ্ট পরিদর্শন না করিয়া সাধারণে অশাস্ত্রীয় ধন গ্রহণ ও প্রাণবধাদি দ্বারা রাজ্যের পীড়া উৎপাদন করেন, তিনি

অচিরকাল মধ্যে রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হন এবং তাঁহার নিজের ও সন্তান সন্ততিরও জীবন বিনষ্ট হয়।

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥ ১১২॥

যেমন শরীরপীড়নে অর্থাৎ আহারাদি দোষে প্রাণির প্রাণ রক্ষা হয় না, তেমনি রাষ্ট্রপীড়নে প্রকৃতিকোপ জন্মিয়া রাজা বিনষ্ট করে। অতএব রাজার স্বশরীরের ন্যায় অতি যত্নে রাজ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের মত ও বিশ্বাস।

এই বিশ্বসংসার কোন্ নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য,—আজ আমাকে সে নিগূঢ় সন্ধান কে বলিয়া দিবে? আজ তুমি বলিতে পারিবে না আমিও তোমাকে বলিতে পারিব না। কোন্ চক্রে ঘুরিয়া কেমন অলৌকিক ছাঁচে জগৎছবি উঠিয়াছে, সে নির্ম্মাণকালে কেহ ত ছিল না; বল দেখি,—তবে সৃষ্টিপ্রকরণের অদ্ভুত কৌশল কিরূপে জানিব? ভাবুক! ভাবেতে ডুবিয়া, কল্পনায় ছুলিয়া, রসেতে ফুলিয়া নূতন নূতন উদ্ভাবনায় বিভোর হইতেছ; কই— দেখাইয়া দাও, এ বিচিত্র জগচ্চিত্র কোথা হইতে আসিল? এই তরুলতার ফলপুষ্প সম্পত্তি, এই কোলাহলময়ী কুটিলা কল্লোলিনী, এই তরঙ্গময় সাগরের প্রতি তুঙ্গশৃঙ্গশালির সরাঙ্গ ইঙ্গিত; জানি না ত,—এ সমস্ত রূপবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্যভার তোমার সম্মুখে কে আনিয়া দিল? ভাল,—চাহি না, অনন্বিত আকাশ-অঙ্কে স্নিগ্ধ নীলিমপটল কে আঁকিল? উন্মদ-ইরম্মদ-রেখা কে টানিল? এই গগনের ফুল,—তারকামঞ্জরী কে ফুটাইল? চাহি না,—আমি তোমার নিকট তারাপতির তত্ত্ব শুনিতে চাহি না। আমাকে তুমি নিজ তত্ত্ব শুনাও; বল দেখি, কোন্ নেপথ্যে বসন ভূষণ পরিয়া কবে তুমি নাট্য-মন্দিরে আসিয়াছ? মনের কৌতূহল তৃপ্ত হউক,বল দেখি শুনি,—এ সংসারে তুমি কোথা হইতে কি রূপে আসিলে?

সভ্য জাতির পুরাতন ইতিবৃত্ত এখন কৃত্রিম চিত্রচমৎকারিতে অনুরঞ্জিত হইয়াছে, আর সে স্বাভাবিক সরল বর্ণটুকু নাই। এই বিশ্বব্যাপার দর্শনে মনুষ্য সহজবুদ্ধিতে কি ভাবিত, আদিম মনুষ্যের সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কি

প্রকার মত ছিল, এক্ষণে তাহার তত্ত্বোদ্ভেদ করা দুষ্কর ও দুরপরাহত। মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধির প্রকর্ষের সঙ্গে ইতিহাসেও বহুবিধ কল্পনারাশি নিবদ্ধ হইয়াছে। বহুকাল অতীত হইল, জগৎসৃষ্টিসমাধান হইয়াছে, বহুকালাবধি মানুষ জগৎরঙ্গভূমিতে আসিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে; আমরা সূত্রধরদিগের প্রয়োগ সূচনা দেখি নাই,—আর এখন আমাদের সম্মুখে আদিম মনুষ্য দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, আদিম মনুষ্যের প্রকৃত আচরণ অদ্যাপি কোন কোন সমাজে দৃষ্ট হয়। এখনও অনেক গ্রাম্য ব্যক্তি প্রাকৃত মত ও বিশ্বাসকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। আইস, তবে আমরা সেই প্রাকৃত লোকদিগের ঔদার্য্যানুমোদিত মতের অনুসরণ করি, দেখি—পুরাতন আর্য্যমতের সঙ্গে তাহার সংস্রব আছে কি না?

এতদ্দেশে সাঁওতাল, কুকি, কোল, ধাঙ্গড়, প্রভৃতি প্রাকৃত সম্প্রদায় এখনও প্রকৃতিজননীর ক্রোড়ে বসিয়া দন্তহীন শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে, সভ্যতা সুন্দরীর সম্মোহন অপাঙ্গভঙ্গী এখনও তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহারা অকৃত্রিম সহজ বুদ্ধিতে জগতের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন করিতেছে। অতএব তাদৃশ লোক, সংসারের আদিমাবস্থার ইতিহাসস্থানীয় সন্দেহ নাই। অদ্য আমরা এস্থলে সাঁওতালদিগের মত সন্নিবেশিত করিয়া আর্য্য মতের সঙ্গে যথাসম্ভব তাহার সমন্বয় করিতে যত্নবান হইতেছি। সাঁওতালেরা বলে,—

পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ একার্ণব ছিল; তন্মধ্যে কেবল একটী হংস ও হংসী বাস করিত। মারাংবুরু জিজ্ঞাসিলেন,—এই বিহগমিথুনকে আমি কোথায় অবস্থিতি করিতে দিব? ঈশ্বর বলিলেন,—এই মহার্ণব মধ্যে একটী পদ্ম আছে, তন্মধ্যে পক্ষীদুটী স্থাপন কর। পুনর্ব্বার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এক্ষণে পৃথিবীকে কে উদ্ধার করিবে?—এ স্থলে একটী কর্কট আছে, তাহাকেই অনুমতি কর। অনন্তর, তাহারা কর্কটকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। কর্কট মারাংবুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল,—আপনি আমাকে কেন আকর্ষণ করিয়াছেন? মারাংবুরু বলিলেন,—অন্য কোন প্রয়োজন নাই, কেমন তুমি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া দিতে পার?—হাঁ, প্রভুর আদেশ হইলে আমি এখনি ধরিত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি? এই বলিয়া কর্কট জলমগ্ন হইল; কিন্তু তাহার নখাগ্রে কিঞ্চিন্মাত্র মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাও আবার জলে ধৌত হইয়া গেল। এতদ্দর্শনে মারাংবুরু রুষ্ট হইয়া বলি-

লেন,— যাও, পৃথিবীর উদ্ধার করা তোমার কর্ম্ম নয়। কেমন, অন্য কেহ নাই?—না প্রভু! জনৈক কীটরাজ ভিন্ন আর কেহই নাই?—যাও তবে সেই কীটরাজকেই লইয়া আইস! তৎপরে কীটরাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভু মারাংবুরু! কি আজ্ঞা করিতেছেন, বলুন?—তোমার প্রতি অন্য কোন আদেশ নাই, কেমন তুমি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার— হাঁ, একাকী পারি না বটে, কিন্তু আমার কর্ত্তৃক পৃথিবী উদ্ধৃত হইবে; এতৎ-শ্রবণে মারাংবুরু জিজ্ঞাসিলেন,—তবে আমার অন্য কে আছে?—আর অন্য কেহ নয়, কেবল একটী কূর্ম্ম আছে। সে আমাকে মস্তকোপরি তুলিয়া ধরিলে আমি পৃথিবীকে উদ্ধার করিব। যাও, তবে সেই কচ্ছপকে ডাকিয়া আন।

কূর্ম্ম উপস্থিত হইয়া বলিল,—প্রভু মারাংবুরু! আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন?—আর অন্য কোন কার্য্য নাই, কেমন তুমি মস্তকে করিয়া এই বসুমতীকে উত্তোলন করিতে পার?—হাঁ, আপনার অনুমতি হইলে আমি ধরণীকে উত্তোলন করিতে পারিব। কিন্তু আপনি চারি কোণে আমার চারিটী পা বাঁধিয়া রাখুন। কচ্ছপের পদচতুষ্টয় বন্ধন করা হইলে কীটরাজ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া পদ্মপত্রে রাখিলেন।

অতঃপর ঈশ্বর মারাংবুরুকে কহিলেন,—যাও দেখ কি হইল একবার দেখিয়া আইস। মারাংবুরু অবতীর্ণ হইয়া পদভরে চাপিয়া দেখিলেন পৃথিবী টল টল করিতেছে। তিনি ঈশ্বরের সমীপে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন,— প্রভু! পৃথিবী ত কই কঠিন হয় নাই? ঈশ্বর আদেশ করিলেন,—যাও তবে উবীরবীজ (১) বপন কর, তাহার মূল জড়িত হইলে মৃত্তিকা দৃঢ় হইবে।

সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে ঋজুমতি প্রাকৃত লোকদিগের এই মত ও বিশ্বাস। এই মতটী আর্য্যদিগেরও অনাদৃত নহে। পূর্ব্বে জগৎ একার্ণব ছিল, পুরাতন ঋষিগণও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। ১।৮।

---

(১) এ স্থলে সাঁওতালদিগের মত যথাবৎ বর্ণিত হইয়াছে; একটীও অতিরিক্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই।

পরব্রহ্ম সর্ব্বাদৌ জলের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে শক্তিরূপ বীজ আরোপিত করিয়াছিলেন।

বেদে এবং পুরাণাদিতেও সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়াছে। আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র অতীব প্রাচীন এবং বহুবিস্তীর্ণ গবেষণাপূর্ণ। সভ্যজাতিদিগের সূক্ষ্মতর অনুসন্ধান দ্বারা আজ কাল যে সমস্ত জটিল প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, ধ্যানপরায়ণ মহর্ষিগণ আটচল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যে দিন বেদমন্ত্রের সঙ্কলন হইয়াছে, সেই দিন ঋষিগণ নিশ্চিত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল। আজ নবীন পুস্তকের নবীন সিদ্ধান্তে পুরাতন আর্য্য মতের তীব্র রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে,—আধুনিক ভূতত্ত্ববেত্তারাও একমত হইয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি স্বীকার করিতেছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিদ্যাবিমূঢ় নিরক্ষর লোকদিগেরও মত বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের তিরস্কৃত নহে। এটী কি তবে কল্পনার ফল? অশিক্ষিত ব্যক্তি ভূতত্ত্বের কি জানে?—তবে কল্পনা-দেবী হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উপদেশ দিয়াছেন? জগতের অঙ্গ-পটে যে চিত্রাঙ্ক নাই, তাহা ভাবুক কবির হৃদয়ে আছে; বিজ্ঞান যাহা জানে না কবির হৃদয় তাহাতে দক্ষ। চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শ্রবণ করে নাই, কবির হৃদয়মুকুরে নিরন্তর তাহার প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে, প্রকৃতির যথা তথা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি কবির হৃদয়ে উদ্গমন করিতেছে। বল দেখি, কিন্নরীর কণ্ঠস্বর কবে শুনিয়াছ? বেণীবিভূষিত অপ্সরার নৃত্য কোথায় দেখিয়াছ? বিদ্যাধরীরাজিত অমরোদ্যান কোথায় জান কি? দেখাইব? কোথায় জগতে ঘুরিবে? ত্রিদশালয় কোথায় খুজিয়া বেড়াইবে? আইস, মন্দারমারুতাহত নন্দনবন এই কবির হৃদয়ে দেখাইব; অপ্সরার নৃত্য—কবির হৃদয়ে; যদি শুনিতে চাও,—আইস, কবির হৃদয়ে তোমাকে কিন্নরীর গান শুনাইব। কবির হৃদয় অদ্ভুত সৌন্দর্য্যপুঞ্জের নিকেতন, কবিকল্পনাই উদ্ভাবনীশক্তির প্রসূতি। কবি যাহা মনন করেন, কই—হৃদয়দ্বার মুক্ত কর, অন্য কাহারও চিত্তে তেমন ভাব প্রস্ফুটিত হয় কি—দেখ? না, কবিকল্পনাই চিত্রকার্য্যে নিপুণা; প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত, প্রকৃতির ললিতাঙ্গ শিশুসন্তানেরাই প্রকৃত কবি,—তাহারাই প্রকৃত ভাবুক। সাঁওতালদের সৃষ্টি প্রকরণ পদ্ধতি কি কবিকল্পনা? আমরা দেখিতেছি, ইহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রক্ষেপ রহিয়াছে, ইহাকে কবির

বলিতে পারি না—এটী নিগূঢ় ভৌতিক তত্ত্ব। মানবজাতির অসভ্যাবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন হইতে পারে না, কি প্রকারে তবে সাঁওতালেরা ভূবিজ্ঞান অবগত হইল? বনবাসী বিষয়বুদ্ধিবিহীন বিবস্ত্র প্রাকৃত লোকের উদরচিন্তাই সর্ব্বস্ব; অবস্থার সচ্ছলতা ভিন্ন গবেষণা বিকসিত হইতে অবকাশ পায় না। ধনুর্ব্বাণধারী অসভ্য জাতিরা (২) গিরিগুহায় বাস করিত; মৃগয়া করিয়া ফল মূল ও অকৃষ্টপচ্য শস্য আহরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিত; এখনও যাহাদিগকে বনবাসী পশু বিশেষ বলিলে অসম্মান করা হয় না, তেমন অকিঞ্চিৎকর প্রাকৃত লোকের মত আর্য্যজাতির অনুমোদিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে লোকপরম্পরা একটী কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে, এমন বিবেচনা করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাণিজগতের প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে অনুশীলন করিলে অনেকাংশে আমাদিগকে ডারউইনের মতের পক্ষপাতী হইতে হয় এবং পৌরাণিকেরাও স্থির করিয়াছেন যে, লক্ষ যোনির পর মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রমাত্মক বোধ হয় না। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজগতের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রমোন্নতি-পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়; নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবসমুদায় ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছে। বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। যদি চ ক্ষৌম কীটের ন্যায় সমস্ত জীবিত পদার্থের জীবদ্দশায় বিবিধ রূপভেদ ঘটে না, কিন্তু যাবতীয় উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীর আকার অবয়ব ও প্রকৃতি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যেন একটীর পর আর একটী বিশিষ্ট ক্রমানুসারে উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। উদ্ভিজ্জজগতের সঙ্গে প্রাণিজগতের ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, তন্মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধের নিদর্শন স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যের জ্ঞানগোচর হয় না। প্রথমতঃ জীবনহীন মৃত্তিকা, পার্থিব ও ধাতব পদার্থ, তৎপরে সামান্যজাতীয় শৈবালাদি; তৎপরে তৃণ, লতা, গুল্ম ও বৃহদ্বনস্পতি; তৎপরে প্রাণবান্ শৈবাল এবং উদ্ভিজ্জ কীট, ক্রমে ক্ষুদ্র কীটাণু, সরীসৃপ, পক্ষী এবং বৃহজ্জাতীয় জন্তুগণ, এতন্মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির

---

(২) অদ্যাবধি ছোটনাগপুর সম্বলপুর এবং অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন পার্ব্বতীয় জাতি আদৌ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করে নাই। ফল মূল মধু প্রভৃতি দ্রব্য তাহাদের প্রধান উপজীব্য। বৃক্ষের পত্র ও বল্কল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র। অদ্যাবধি তাহারা স্বহস্তার্জ্জিত কোন দ্রব্য ব্যবহার করে নাই। এই সমস্ত প্রাকৃত লোক সাতিশয় নিরীহ, কিন্তু তাহাদের বিবসা বনিতাগুলিকে দেখিলে সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে।

প্রক্রম দেখা যায়। মৃত্তিকা এবং সামান্য শৈবালে অধিক পার্থক্য নাই, এ দিকে আবার ঈদৃশ কতকগুলি প্রাণবান উদ্ভিজ্জ কীটাণু আছে, সহসা তাহাদিগকে জীবিত পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয় না (৩)। বস্তুতঃ তাহারা উদ্ভিজ্জ নহে—উচ্চলিঙ্গ সজীব প্রাণী। এ দিকে আবার উষ্ট্রপক্ষী দেখ, পশু হইতে কি পার্থক্য দেখাইবে?—পৃষ্ঠে কতকগুলি পক্ষগুচ্ছ! সে সামান্য বৈসাদৃশ্য। ফলতঃ মৃদাদি যে সমস্তকে আমরা জড়পদার্থ জ্ঞান করি, তাহাদের অন্তিম দশা এবং উদ্ভিজ্জের আদিম দশা এতদুভয়ের সন্ধিস্থল। কতকগুলি শৈবালজাতি মৃৎপদার্থও নহে, উদ্ভিদও নহে,—তাহারা উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত, তাহাদিগকে অনায়াসে বিভেদ করা যায় না। তদ্রূপ পশুর ও মনুষ্যেরও মধ্যবর্ত্তী উভয়ধর্ম্মোপচিত কোন প্রকার জন্তু থাকিতে পারে। মানুষের উৎপত্তি তাদৃশ কোন প্রকার জন্তু হইতে হইয়াছে কি না, এক্ষণে তাহাই বিবেচনাধীন। পাঠক! তবে আসুন, এই দুর্বোধ জটিল বিষয়ের মর্ম্মোদ্ভেদে আমরা প্রবৃত্ত হই।

সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, পশু পক্ষী এবং মনুষ্যের শিশুসন্তানকে কিয়ৎকাল লালন পালন না করিলে তাহারা আপনার যত্ন আপনি করিতে পারে না। যদ্যপি আমরা এমন অনুমান করি যে, যাবতীয় বিভিন্নজাতীয় জীব এক কালে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে মানুষের অনন্যসহায় শৈশবাবস্থা কল্পনা করিতে হইবে! কারণ, কি চেতন কি অচেতন, কোন পদার্থের এক কালে পরিণত দশা কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। উপ্ত বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর জন্মে, অঙ্কুর হইতে একটী ক্ষুদ্র কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তৎপরে পত্র শাখা প্রশাখা পুষ্প ও ফল ধরে। জীবের পক্ষেও তদ্রূপ নিয়ম। অগ্রে গর্ভ মধ্যে শোণিতশুক্রসমন্বিত অণ্ডালু পদার্থ জন্মে, তৎপরে শিশু পরিপুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; অতঃপর শৈশবাবস্থা হইতে বাল্যাবস্থা, বাল্যাবস্থা হইতে

---

(৩) বৃন্তোৎপল (Stalked Crinoid) এই সামুদ্রিক জীব দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু ইহার আকারাবয়ব ঠিক উদ্ভিদের অনুরূপ। কাটাহীন একটি ক্ষুদ্র খেজুর গাছ মৃত্তিকা হইতে মূল সমেত উত্তোলন করিলে যে প্রকার দেখিতে হয়, এই শৈবালজাতীয় মৎস্যের আকৃতি ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু পত্রগুলি আরও সুচিত্রিত এবং সর্পের পেটের ন্যায় খাঁচকাটা। ইহার উৎপল সদৃশ মস্তক ভাগ সাড়ে তিন ইঞ্চি দীর্ঘ এবং বৃন্তভাগ আরও কিছু দীর্ঘ হইবে বাস্ মাইকেল দ্বীপের সন্নিকটে ১৩০০ হস্ত নিম্নে সমুদ্র গর্ভ হইতে ইহা উত্তোলিত হইয়াছিল। এই প্রকার অনেক জীব উদ্ভিজ্জের সদৃশ।

যৌবনাবস্থা এই প্রকার পর্য্যায়ানুসারে দশার পরিবর্ত্তন হয়। অতএব প্রথমে মনুষ্যের শৈশবাবস্থা কল্পনা না করিলে আমরা নৈসর্গিক নিয়মের বহিশ্চর হইয়া পড়িব। এ পক্ষে আবার শৈশবাবস্থা কল্পনা করিলে মাতৃ-পিতৃবিহীন দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণধারণের উপায় নাই,—কে তাহাকে প্রতি-পালন করিল? এই সমস্ত দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের সংশয়রাশি উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মার মানসপুত্রের কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু মানস-পুত্র কল্পনা করিবার দিন অতীত হইয়াছে; এক্ষণে মনুষ্য আর চর্ম্মচক্ষে বিশ্ব-ব্যাপার দেখিতেছেন না, মনশ্চক্ষুতেও দূরবীক্ষণ সংযোগ করিয়াছেন। এখন অবিস্ফুট প্রকৃতিসূত্র বিশদ অধ্যাহারে সকলের হৃদ্গত করিয়া দিতে হইবে। অতএব, পাঠক! এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের ক্রমোন্নতি ব্যতীত আমরা এক কালে মনুষ্য সৃষ্টি স্বীকার করিতে পারি না। ক্ষুদ্রজাতীয় তরু অবস্থান্তরিত হইয়া বৃহত্তরুতে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য পশুর পরিবর্ত্তনে মনুষ্যজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, এ প্রকার অনু-মান অসঙ্গত ও বিবেচনাবিরুদ্ধ নহে।

কোন স্থানে আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে তথায় মশক ও মক্ষিকাদি উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর এ প্রকার অসংখ্য কীটাদি জন্মগ্রহণ করে। অতএব পৃথিবীস্থ যাবতীয় একজাতি মক্ষিকা মূলে এক মাত্র মক্ষিকামিথুনের অনু-জাত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। যে যৌগিক কারণ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে মক্ষিকা জন্মে, সিংহলেও তদ্রূপ কারণের সমবায়ে সেইজাতীয় মক্ষিকা জন্মিবে। মনুষ্যের পক্ষেও এই প্রকৃতিনিয়ম তুল্যানুতুল্যরূপে খাটিয়েছে। যে কারণে পৃথিবীর এক স্থানে মানবজাতি জন্মিয়াছে, অন্যত্র যে তাদৃশ কারণের সমাবেশ কোন কালে হয় নাই, এরূপ অনুমান সহজ বুদ্ধিতে আইসে না। অবশ্যই পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময়ে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মনুষ্যের আকৃতি ও দৈহিক গঠন বিভিন্ন প্রকার।

বর্ণ ও অঙ্গগঠন ভেদে মানবজাতি সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—হাফসী, পাপুয়ী, এবং অষ্ট্রেলীয়। ইহারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। মহাদ্বীপ আর্য্যজাতি এবং সামুদ্রিক জাতি; ইহারা সকলেই গৌরবর্ণ। মোঙ্গলী মহাদ্বীপ বংশ এবং মঙ্গলী সামুদ্রিক বংশ ইহারা কাঞ্চন ও তাম্রমূর্ত্তি। খাদ্য দ্রব্য এবং জলবায়ুর উষ্ণাগমে বর্ণের ও কেশের রূপান্তর ঘটে, কিন্তু অঙ্গগঠনের পরিব-

র্ত্তন হয় না। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব।

পাঠক! এক্ষণে দেখুন, সম্ভবতঃ সৃষ্টির প্রাক্‌কালেই মনুষ্যের উৎপত্তি হয় নাই। প্রথমে জল, জলের পর স্থল, তৎপরে তৃণ, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ, পরিশেষে জীব জন্তু সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর কি প্রকার অবস্থা ছিল, কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই। এখন ভৌতিক নিয়মের অনুশীলন ভিন্ন সেই প্রাচীন তত্ত্বোদ্ভেদের আর উপায় কি? যিনি বিচক্ষণ চক্ষে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়ম পাঠ করিবেন, সেই প্রচীন অধ্যেতাই তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টির পুরাবৃত্ত আর কোন্ উপায়ে নিশ্চিত হইতে পারে? কত অবস্থান্তরের পর মানুষের বর্ত্তমান দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কে জানে? এককালে ভূতলে মনুষ্য ছিল না, আবার যখন মানবজাতির উৎপত্তি হইল সে সময় তাহার ঈদৃশ হীনাবস্থা গিয়াছে যে, মনুষ্য পরিচয়ের কোন লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না,—সহসা তাহাকে বনের পশু বলিয়াই বোধ হইত। জ্ঞান ছিল না, বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না,কেবল সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করিত। তবে বল দেখি সৃষ্টিকালে মানুষের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহার কথাই বা কিরূপ এবং লোকক্রমাগত জনশ্রুতিই বা কি চলিয়া আসিয়াছে? আমরা বলিতেছি, এ সম্বন্ধে ঋজুচিত্ত প্রাকৃত লোকেরাই যে কোন মত প্রকাশ করুক না কেন, কিম্বা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরাই যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করুন না,—কল্পনা সকলেরই মীমাংসার অভিনেত্রী। পাঠক! তবে বলুন দেখি, আর্য্যমতের সঙ্গে প্রাকৃত মতের এত সাদৃশ্য কেন? আর্য্যেরা ভারতবর্ষের বহির্ভাগের হিমমণ্ডিত প্রদেশ-বিশেষ হইতে এখানে আগমন পূর্ব্বক অনার্য্য জাতিকে পরাভূত করিয়া উপনিবেশ করিয়াছেন, আমরা এই বৈদেশিক মতের পক্ষপাতী নহি। এস্থলের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রেরা এই ভারতবর্ষেরই আদিম নিবাসী; প্রকৃত বৈশ্যেরা কেবল দিগ্বিদিক হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই কেবল ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, সকল দ্বীপেরই ব্রাহ্মণেরা গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়েরা কৃষ্ণবর্ণ (৪) এবং বৈশ্যেরা তাম্র বা বিমিশ্রবর্ণ। ইহার তাৎপর্য্য এই,

---

(৪) খাদ্যদ্রব্যাদির কারণগুণে মনুষ্যের বর্ণাদি কার্য্যগুণেরও পরিবর্ত্তন হয়, প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহা স্বীকার করিতেছেন।—মিশ্রবর্ণঃ পতন ইত্যর্থঃ কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্তে

আর্য্যদিগের আদিম নিবাস কশ্মীরদেশে ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা প্রস্ফুটিত চম্পকদল সদৃশ গৌরবর্ণ। ক্ষত্রজাতি কৃষ্ণবর্ণ হইবার একটী বিশেষ গূঢ় কারণ আছে। সর্ব্বকালই ব্রাহ্মণজাতি নিতান্ত নিরীহ, যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহাদের বড় একটা প্রবৃত্তি ছিল না। শাস্ত্রালাপ এবং পরমার্থ ধ্যানেই তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। ঋগ্বেদ পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, ব্রাহ্মণদিগের কিছুমাত্র আত্মরক্ষা ক্ষমতা ছিল না; অসুরদিগের নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নিয়তই তাঁহারা কাতরোক্তিতে স্তব করিতে করিতে দেবগণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যিনি স্বয়ং বীরপুরুষ হন, তাঁহাকে অপরের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না, কৃতিমান সক্ষম পুরুষ পরপ্রত্যাশী হইতে লজ্জানুভব করেন। চিরকাল চিত্তবৃত্তিতেই ব্রাহ্মণজাতির বীরত্ব; নৃপতি একটী স্বর্ণবালুকাকণার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না, দীন হীন নিরন্ন ভিক্ষুর ন্যায় তল্লাভের জন্য অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু বিষয়-নির্লিপ্ত পবিত্র ব্রাহ্মণজাতি পরমার্থ পীযূষের ভিখারী, সম্মুখে মারকত পর্ব্বত ধরিয়া দিলেও অপাঙ্গকোণে ফিরিয়া দেখেন না।

আমরা অদ্যাবধি দেখিতে পাই, বনবাসী এবং পার্ব্বতীয় লোকেরাই বিগ্রহ প্রিয়। তাহারা সমরকার্য্যে অসমসাহসিকতায় এবং শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া থাকে। বোধ করি এই সমস্ত অনার্য্য জাতি ভুজবীর্য্যে আপন আপন আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক এক এক স্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের বনাঞ্চলে অদ্যাবধি ইহার দৃষ্টান্ত প্রতীয়মান রহিয়াছে; বনবাসী ভূঁয়েরাজগণ নিজ নিজ বাহুবলে এক এক স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। ক্ষত্রগণ আদৌ বনবাসী কোল প্রভৃতির ন্যায় দৃঢ়কায় ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ।

বৈশ্যের তাম্রবর্ণ হইবার কারণ এই, প্রকৃত ভারতবর্ষবাসীরা কস্মিন্‌কালে বাণিজ্যকার্য্যে নিরত হন নাই। বণিকেরা পোতারোহণে সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেন, তদ্দর্শনে বৈদিক ঋষিগণ কত চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইতি ন্যায়েন শ্যামপর্ব্বতভবঃ শ্যামবর্ণঃ শাকাদ্যন্নপরিণামেন মনুষ্যা অপি শ্যামবর্ণা ইত্যর্থঃ।

আফ্রিকার এপ্‌ বান্দরেরা কাফ্রিকন্যা হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা প্রথম প্রথম একপ্রকার নিকৃষ্টজাতীয় মনুষ্য হয়। পরিশেষে ক্রমশঃ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি হয়।

পুরাকালে ভারতবর্ষীয়দের যথার্থ বাণিজ্যব্যাপার না থাকিবার তাৎপর্য্য এই, গ্রাসাচ্ছাদনের অসদ্ভাব না ঘটিলে মনুষ্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয় না। জননী জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, নিতান্ত জীবিকার অপ্রতুল না হইলে সকলেই জন্মভূমিতে কালযাপন করিতে ভাল বাসেন। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা যথেষ্ট উর্ব্বরা, মেঘ কালবর্ষী হইলে এখানে অন্ন বস্ত্রের অসঙ্গতি হয় না; সুতরাং চিরকাল বৈদেশিকেরাই বাণিজ্যোপলক্ষে এদেশে গতিবিধি করেন। বোধ করি, পরিশেষে সেই বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এতদ্দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য ভারতবর্ষে বৈশ্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। চীনবাসী, আরব, ফিনিক, ইহুদী প্রভৃতি জাতিগণ বাণিজ্যকার্য্যে বিশেষ তৎপর। ইহাঁরাই ভারতবর্ষে উপনিবেশ করিয়া পরিশেষে বৈশ্যজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিবেন; তজ্জন্য তাঁহারা তাম্র এবং মিশ্রবর্ণ।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, স্ত্রীলোক ও দস্যু সকলেই ঋগ্বেদমন্ত্র রচনা করিয়া পাঠ করিতেন। যজ্ঞকাল হইতেই জাতিভেদ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিল; কিন্তু তথাচ অনার্য্য জাতিরা ব্রাহ্মণদের সহবাস করিত এবং শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিতে পাইত। ব্রাহ্মণেরা কল্পনাবলে সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে যে কিছু সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই মত অনার্য্য জাতির মধ্যেও অনুসৃষ্ট হইয়া পড়িল। তন্নিমিত্ত ঋষিপ্রণোদিত কোন কোন সিদ্ধান্তপদ অসভ্যজাতির মধ্যেও বিদ্যমান আছে; তবে কালসহকারে উভয় পক্ষেই কিছু কিছু শাখা প্রশাখা সংযোজিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। সম্প্রতি সাঁওতালদিগের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, বস্তুতঃ মূলে তাহা অভিন্ন ছিল।

পাঠক! ঐন্দ্রজালিক মুকুরপ্রভায় আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আছে; আসুন একবার নিরাশ্রয় চক্ষে দর্শন করি, সাঁওতালদিগের "মারাংবুরু" দেবতাটী কে? এই অসভ্য জাতি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে, মারাংবুরু তাঁহার অনুচর। সাঁওতালদিগের মতে ইনি প্রেতাত্মা; তাঁহার প্রসাদে সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাঁহার রোষে বিশ্বের প্রলয় ঘটে। রোগ শোক তাপ মারাংবুরুর আজ্ঞাধীন। তিনি সাঁওতালদিগের যিনি হউন, আমাদের কি কেহই নহেন? বোধ করি

মারাংবুরু আমাদের মহাবরাহ হইবেন। সাঁওতালদের মতে মারাংবুরুর আদেশানুসারে অন্যান্য জীব ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছে; কিন্তু পৌরাণিক মতে মহাবরাহ স্বয়ং দংষ্ট্রাগ্রে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন (৫)।

পূর্ব্বে পৃথিবী জলময় ছিল, তৎপরে স্থলের উৎপত্তি হইয়াছে। সাঁওতালদিগের কীটরাজ এবং কর্কট পৌরাণিক মৎস্যাদি অবতার হইতে পারে (৬)। এদিকে কূর্ম্মের নামোল্লেখ উভয়বিধ মতেই শ্রুত হইতেছে। পাঠক! এগুলিকে কল্পনা-সম্ভূত অলীক বৃত্তান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না, ইহার মধ্যে কেমন অপূর্ব্ব ভৌতিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, বিচার করিয়া দেখুন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা আজ এই কল্পনার কীদৃশ আদর বাড়াইতেছেন, পাঠক! শুনিবেন আসুন। আদরের সামগ্রী হইলেই সকলে আদর করেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের একবার মহীয়সী ধীশক্তি দেখুন। পূর্ব্বে জগৎ একার্ণব ছিল, ক্রমশঃ তন্মধ্যে পরমাণুরাশি নিমগ্ন হওয়ায় অসীম জলধিগর্ভে কিঞ্চিৎ মৃৎপিণ্ডের উৎপত্তি হইল। কালসহকারে তাহাতে জলচর কীট এবং মৎস্যাদি জন্মে। আমরা "সমুদ্রমন্থন এবং চন্দ্রের উৎপত্তি" শীর্ষক প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, পৃথিবীতে একবার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়া যায়, তদ্দ্বারা পর্ব্বতাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গলিত উদ্ভিদ কিম্বা জান্তব দ্রব্য সঞ্চিত না থাকিলে দাহ্য পদার্থ জন্মে না এবং দাহ্য পদার্থ ভিন্ন অগ্ন্যুৎপাতও হইতে পারে না। সে কারণ ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হই-

---

(৫) স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উত্থিতঃ
সংরুরুচে রসায়াঃ। ভাগবত ৩।১৩।৩০

স্বীয় দংষ্ট্রাবিলগ্ন পৃথিবীকে উত্তোলন করিবার সময় তাঁহার সম্যক শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

অন্যত্র

ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ। বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।২৬

তৎপরে প্রস্ফুটিত পদ্মলোচন সেই মহাবরাহ স্বীয় দংষ্ট্রা দ্বারা ধরণীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ইত্যাদি।

(৬) মৎস্যকূর্ম্মাদিকা শুদ্ধাবরাহং বপুরাস্থিতঃ। ৭
× × × +
সমুদ্ধৃত্য চ পাতালাম্ভ মোচ সলিলে ভুবং। ৯
মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৪৭ অঃ

তেছে যে, স্থলজ উদ্ভিদ এবং স্থলচর জন্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রলয়-জলে নানা প্রকার জলচর কীট ও অন্যান্য প্রাণী বাস করিত। তাহাদের বিগলিত দেহে দাহ্যপদার্থ উৎপন্ন হইলে প্রবর্ত্তক বহ্নি দ্বারা জগৎ বিদগ্ধ হয়, অতঃপর ভূমণ্ডল এবং পর্ব্বতাদি প্রকাশ হইয়া পড়ে। মৎস্য কূর্ম্মাদির গলিত দেহ হইতে মৃদ্রাশির উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্য পৌরাণিকেরা তত্তৎ অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাদি জন্মিয়াছিল, তৎপরে মৎস্য, কর্কট ও কূর্ম্মাদি জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের গলিত দেহে পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল না। ক্রমে উত্তরোত্তর আরও বহুবিধ জীবের মৃতদেহ সঞ্চিত হইলে মৃদ্রাশির বৃদ্ধি হইল। মধুকৈটভবধবৃত্তান্ত মৃৎসঞ্চয়ের একটী কৌতুককর ভৌতিক নিয়মের উদাহরণ, সন্দেহ নাই। কালীপুরাণ প্রণেতা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তরল পৃথ্বীতলকে দৃঢ়ীভূত করিবার (৭) জন্যই মধুকৈটভের সৃষ্টি এবং বিনাশ সাধন করা হইয়াছিল। কিন্তু মধু এবং কৈটভ কে?—তাহারা অঙ্গমল (৮) ভিন্ন আর কিছুই নহে; নানা প্রকার জীবের মলবৎ গলিত দেহ সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হইলে মৃদুৎপত্তি হয়। অনন্তর পার্থিবাঙ্গার, যবক্ষার, গন্ধক এবং অন্যান্য দাহ্যপদার্থ উৎপন্ন হইলে উৎকট অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। জলাংশ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল, মৃত্তিকাদি সারভাগ দ্রবীভূত হইয়া টল টল করিতে লাগিল; অবশেষে আবার সমস্ত পদার্থ শীতল হইলে বাষ্পরাশি ক্রমশঃ জল হইয়া আসিল এবং দগ্ধ পদার্থ উচ্চ পর্ব্বতরূপ ধারণ করিল। পৌরাণিকেরাও কেমন বিচক্ষণরূপে এই ভৌতিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মার্কণ্ডেয়

---

(৭) তাং বৈ দৃঢ়তরাং কর্ত্তুং পৃথ্বীং প্রতি তদেশ্বরী।
উপায়ং চিন্তয়ামাস কথং পৃথ্বী ভবেদ্দৃঢ়া।
কালীকাপুরাণ।

(৮) তৎকর্ণমলচূর্ণেভ্যো মধুনামাসুরোঽভবৎ।
ততো দক্ষিণহস্তস্য কনিষ্ঠাগ্রস্তু দক্ষিণে।
কর্ণে ন্যবেশয়েদ্দেবী তস্মাদপ্যুদ্ধৃতং মলং।
তচ্চাপি খোদয়ামাস করশাখাগ্রজেন তু।
ততোঽভূৎ কৈটভো নাম বলবানাসুরো মহান্।
কালিকাপুরাণ।

(৯) পুরাণপ্রচয়িতারা ইহার কোন অংশ পরিত্যাগ করেন নাই। মহর্ষিগণ পর্ব্বত নদ নদীকে দেবাধিষ্ঠান বলিয়া যতই কেন বর্ণনা করুন না, তত্ত্ব নির্ণয়কালে তাঁহারা বিপথগামী হন নাই।

জলমধ্যে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইলে মহাবরাহ দংষ্ট্রাগ্রে বসুমতীকে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে পদ্মপত্রে সংস্থাপন করিলেন। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—(১০) সর্ব্বগুণাত্মক সেই লোকপদ্মে বিষ্ণু প্রবেশ করিলেন।

---

(৯) ততঃ ক্ষিতিং সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোঽচিনোদ্‌গিরীন।
প্রাক্ সর্গে দহ্যমানে তু তদা সংবর্ত্তকাগ্নিনা।
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ।
শৈলা একার্ণবে মগ্না বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ।
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্র-তত্রাচলাভবন্।
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপোপশোভিতং।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৪৭। অঃ।

পূর্ব্বে প্রলয়াগ্নি দ্বারা সর্গ দগ্ধ হইলে পৃথিবীকে সমীকরণান্তর পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে পর্ব্বত সমস্ত বিশীর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইল এবং বায়ু দ্বারা জল সংযত হইয়া গেল; পরে যে যে স্থলে পর্ব্বত ছিল পুনর্ব্বার তত্তৎস্থলে তাহারা উত্থিত হইল। অনন্তর তিনি সপ্তদ্বীপোপশোভিত ভূমি বিভাগ করিলেন।

যদিচ এখানে সৃষ্ট জগতের ধ্বংসের পর পুনর্ব্বার কি প্রণালীতে পর্ব্বতাদির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বর্ণিত হইল, কিন্তু ভূগর্ভ হইতে কি প্রকারে পর্ব্বত উত্থিত হয় এবং অগ্ন্যুৎপাত কালে কিরূপে বায়ু বাষ্পরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঋষিগণ এ প্রকার সৃষ্টিপ্রকরণ যে অবগত ছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও এই প্রকার সৃষ্টিপদ্ধতি স্বীকার করিতেছেন। "সমুদ্র মন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি" নামক প্রস্তাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ
সর্ব্বগুণাবভাসং। তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো
বিধাতা স্বয়ংভুবং যংস্ম বদন্তি সোঽভূৎ। ১৬
তস্যাং স চাম্ভোরুহ কর্ণিকায়ামবস্থিতো
লোকমপশ্যমানঃ। পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্ত—
নেত্রশ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি। ১৭
তস্মাদ্‌যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ
সলিলাদ্বিরূঢ়ং। অপশ্রিতঃ কঞ্জমুলোক-
তত্ত্বং নাত্মানমদ্ধা বিদদাদিদেবঃ। ১৮

যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নামে প্রথিত, সেই বেদময় পুরুষ বিষ্ণু অধিষ্ঠিত পদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পদ্মের কেশর মধ্যে অবস্থিত হইয়া লোক নিরীক্ষণার্থ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চারিটী বদন হইয়াছে। প্রলয়-পবন তাড়িত তরঙ্গ ঘূর্ণিত বারিরাশির উপর পদ্মপুষ্পটী উৎকম্পিত হইতেছিল, সে কারণ ব্রহ্মার লোকতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই স্মরণ ছিল না। তিনি মনে মনে এই বিতর্ক করিলেন,—পদ্মপৃষ্ঠে রহিয়াছি আমি কে? আর জলোপরি এ পদ্মপুষ্পটীই বা কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই এই পদ্মের আধারভূত কোন আশ্রয় স্থান নিম্নে থাকিবে। তিনি এইরূপ বিচার করিয়া পদ্মে তন্তুর রন্ধ্র দিয়া জলমগ্ন হইলেন, কিন্তু সম্যক প্রবিষ্ট হইয়াও অনেক অনুসন্ধানে পদ্মের আধারস্থান বিষ্ণুনাভি উপলব্ধি হইল না। হে বিদুর! বিষ্ণু সুদর্শন দ্বারা ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক দেহিদিগের যে জীবিতকাল ক্ষয় করেন, আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সেই কাল (১০০ বৎসর) ক্ষয় হইল।

অনার্য্য সাঁওতালেরা এবং সমাধিসিদ্ধ ঋষিগণ জলময় জগতে একটী পদ্মপুষ্পের অস্তিত্ব কল্পনা করিতেছেন। এটী কি নিরর্থক প্রলাপবাদ মাত্র? না ইহার অন্তর্নিহিত কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে? পাঠক! এই পদ্ম বিফল যাইবে না; কমলযোনি ব্রহ্মা পদ্মের মৃণাল-ছিদ্র অবলম্বন পূর্ব্বক জলমগ্ন হইয়া তাহার মূলাধার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, আমরাও কবিদিগের ভাবগাম্ভীর্য্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার মর্ম্মনির্দ্ধারণ করি,—আসুন। মজ্জমান দেখিয়া আপনারা অপসৃত হইবেন না,—আমি ডুবিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ক এষ যোসাবহমজ-পৃষ্ঠে এতৎ কুতো
বাজমনন্যদপ্সু। অস্তি হ্যধস্তাদিহ
কিঞ্চনৈতদধিষ্ঠিতং যত্র সতানুভাব্যং। ১৯
স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জ-নাল-নাড়ীভিরন্ত—
র্জলমাবিবেশ। নার্ব্বাগ্‌গতস্তৎ খর
নালনালনাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ। ২০
তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং বিচিন্বতোভূৎ
সুমহাংস্ত্রিনেমিঃ। যো দেহভাজাং ভয়—
মীরয়াণঃ পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ। ২১

ভাগবত ৩। ৮

ভিক্ষা।

দেখেছি উদিতে ভানু পূরব গগনে—
তরুণ অরুণ শোভা,
মরি কিবা মনোলোভা,
চাকি অঙ্গ সুচিকণ গৈরিক বসনে ;—
দেখিয়াছি কতবার,
মালা পরি তারকার
শর্ব্বরী হাসিছে গলি মনের গরবে ;—
দেখেছি পূর্ণিমা চাঁদ
নির্ঝরিণী কলনাদ,—
শুনিয়াছি কত বার মৃদুল আরবে ;—
দেখেছি চন্দ্রকিরণ,
হইতেছে বরিষণ—
আদরিণী তটিনীরে চুমিয়া আদরে ;—
দেখিয়াছি থর থর
সরোজিনী কলেবর
কাঁপিতেছে মন্দ মন্দ প্রভাত সমীরে ;—
তমোময় রজনীতে,
দেখিয়াছি দীপ্তি পেতে
অসংখ্য খদ্যোতকুল বৃক্ষে সারি দিয়া ;—
চাঁদ মুখ করি ম্লান,
চন্দ্রের অস্তগমন
দেখিয়া ভেবেছি কত ভাবেতে ভরিয়া ;—
প্রকৃতির শোভা কত
দেখিয়াছি শত শত,
এ পাগল প্রাণে আর (ও) হইয়া পাগল ;—
দেখিয়া প্রেয়সী মুখ,
বিমল পবিত্র সুখ
করিয়াছি অনুভব হইয়া বিকল !

মানি এ শোভা নিকর,
অতি মন মোহকর ;
ভাবুক জনার হৃদি ভাবেতে ভাসায় ;
কিন্তু কল্পনার প্রভা
সৃজিয়াছে যেই শোভা
ও শোভা এ শোভা মুখ না হেরে লজ্জায়।
কিবা অমূল্য রতন
সৃষ্টির সার সৃজন
শোভার নিধান সর্ব্ব সুখের আকর,—
প্রণয়, শিক্ষা, সঙ্গীত,
এ তিন গুণে ভূষিত
রমণীয় নারীরত্ন মরি কি সুন্দর !
এ হেন দুর্লভ ধন
যে হৃদে করে ধারণ
অতি ভাগ্যবান সেই নাহিক সংশয় ;
তার কাছে এ সংসার,
সুধু সুখেরি আগার,
দূরে থাকে দুঃখ সদা হেরিয়ে তাহায়।
সংসার অরণ্য মাঝে,
যথা এ প্রসূন রাজে
সে অরণ্য নহে বন—নন্দন কানন—
স্বর্গীয় সৌরভে তার
আমোদিত চারি ধার ;
অতি ভাগ্যবান সেই বনবাসী জন।
অহো ! সুন্দর রমণী
এ সংসার বৈতরিণী,
পারাপার হইবার একই উপায় ;
নচেৎ ভীম কল্লোলে
যেত সব রসাতলে ;—
বাঁচিয়াছে সকলে এক নারীর কৃপায়।

কে বা চিত্তে সাধ করে
দুঃখ ভার বহিবারে
দুঃখ বিনা এ জগতে কিছু নাহি আর ;—
কিন্তু বল দেখি মোরে—
আশাশূন্য অভাগারে—
বাঁচা সাধ হৃদে তার কে আনে আবার !
কে তোমার কাণে কাণে
বাজাতেছে নিশি দিনে—
সুখময় এ অবনী, নয় দুঃখময় ;
যবে পরিতাপ হায়,
হৃদয় খুলিয়া যায়,
অমিয় ক্ষরিয়া শান্তি কে দেয় তোমায় ;
কে দেয় তোমায়ে আশা,
সুখ, শান্তি, ভালবাসা,
কে দিয়ে তোমায়ে করে পূর্ণ মনোরথ।
সংসার সুখের ব'লে
কে ধরে নয়নে তুলে ;
কুপথ হইতে লয়ে কে যায় সুপথ ,—
সেই একই রমণী—
দয়া, মমতার খনি,
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, পুণ্যের নিবাস,—
সত্য, সারল্যের ছবি,
একই সুখের রবি,—
হৃদি অন্ধকার সদা যে করে বিনাশ।
ব'ল না ব'ল না মোরে,
(কেহ হেন বলিতে পারে)
পুরুষ সরল প্রাণ—প্রণয়ের দাস—
না, না, তাত কভু, নয়,
পূর্ণ স্বার্থপরতায়,
পুরুষ পাষাণপ্রাণ জগতে প্রকাশ।

আপন লক্ষ্য সাধন,
উচ্চ পদ, উচ্চ মান,
আশার তৃষায় সদা দহিছে অন্তর ;
বিশ্বাস তিলেক তরে,
ক'রোনাক পুরুষেরে—
মানব আকারে দৈত্য অবনী ভিতর !
চাও যদি সরলতা
নিরমল পবিত্রতা
কর গিয়ে অন্বেষণ রমণী হৃদয়ে ;—
দেখিবে অন্তরে তার
প্রণয়ের শতধার
বহিতেছে ধীরে গুপ্ত নির্ঝরিণী প্রায়।
যা কিছু পবিত্র আছে
এ পাপ ধরণী মাঝে—
এক বাক্য হয়ে সবে যেন পলাইয়া,
শান্তির আবাস স্থান
করি মনে স্থির জ্ঞান,
আশ্রয় রমণীহৃদে লইয়াছে গিয়া।
স্বর্গদূতি ! হে রমণি !
কেন যে তা নাহি জানি
অসার সংসারে তুমি হয়েছ প্রেরিত ;
এ যে নিষ্ঠুর সংসার
হেথা ধর্ম্ম আছে কার ?
পাপের পঙ্কিল স্রোতে সব কলুষিত।
কোমল হৃদি তোমার,
জানে না যে কিছু আর,—
বিনা সরলতা, ধর্ম্ম, পবিত্র প্রণয় ;
হেথা পাপ কোলাহল
ঘাতিয়ে মরম স্থল
ব্যথিত করিবে তব কোমল হৃদয়

রমণি! তোমার কাছে
কিবা ভিক্ষা আর আছে ;—
একটী সামান্য ভিক্ষা আছে গো আমার—
এই জলবিন্দু যবে
কালসাগরে মিশাবে,
হাসি মুখে সুধাক্ষরে চেও একবার!

শ্রীপ্রাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

অনন্তর কাশীনাথ রায়ের বিধবা পত্নী (১) যথাকালে শুভগ্রহে এবং শুভলগ্নে

---

(১) অথ কাশীনাথ--পত্নী অনুকূলাখিলগ্রহ-শুভলগ্নে শুভলক্ষণলক্ষিতং পুত্রমেকং সুষাব। তস্য চ রমণীয়মূর্ত্তিত্বাৎ পণ্ডিতা রামেতি নাম নির্দ্দিদিশুঃ। সমুদ্দারোঽপি পুত্ররহিত-স্তস্মিন পুত্রস্নেহং বর্দ্ধয়ামাস। শ্রীরামবৎ শৈশবাভ্যস্তসমস্তবিদ্যে, প্রাপ্তোপনয় সংস্কারে, নীতিশাস্ত্রপারগে, প্রাপ্ত যৌবনে, সমুদ্দারঃ স্বীয়রাজ্যকর্ম্মণি স্নেহাধিক্যেন, সুকুমারগুণতয়া, মহা-বংশতয়া চ, পরিতুষ্টো নিয়োজয়ামাস। অমাত্যাশ্চ সর্ব্বে তদাজ্ঞামেবানুবর্ত্তন্তে স্ম। সমুদ্দার-বাটীজাতত্বাৎ, প্রাপ্ত-সমুদ্দার-রাজ্যত্বাচ্চ, তমপি সর্ব্বে রাম-সমুদ্দারনাম্না প্রথয়ন্তি স্ম। ততঃ স্বানুরূপ-গুণ-কুলবিবাহিতপত্ন্যাং চতুরঃ পুত্রান্, দুর্গাদাসহরিবল্লভজগদীশসুবুদ্ধিসংজ্ঞকান্, জনয়ামাস ; ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষান্ রাজ্যং পালয়ামাস চ।

তেষাং জ্যেষ্ঠো দুর্গাদাসরায় একাদশবর্ষবয়সি বর্ত্তমানঃ প্রাপ্তাভিনবোপনয়নসংস্কারো ধনতপুর গ্রামসমীপবর্ত্তী নদীতটে কৌতুকং দিদৃক্ষুঃ কদাচিদুবাস। তস্মিন্নেব কালে ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরযবন-প্রেষিতঃ কশ্চিদ্যবনামাত্যো, মহতা সৈন্যেন পরিবৃতস্তরিমারুহ্য তত্রাজগাম। তং সৈন্যং চ দৃষ্ট্বা ইতরে ভীত্যা পলায়িতাঃ দুর্গাদাসস্তত্রৈব তস্থৌ।

যবনামাত্যস্তমুবাচ। ভো ব্রাহ্মণ! হুগলীতি প্রসিদ্ধ নগরমিতঃ কিয়ৎ ক্রোশান্তরিতং? তত্র গমনে বা কঃ পন্থাঃ? জানাসি চেৎ কথয়। ততো দুর্গাদাসোঽঞ্জলিকথায়া বিদিতাখিলমার্গ-বৃত্তান্তস্তত্র গমনাখ্যানং, তত্রাধ্বসমীপে যাবন্তো গ্রামা নদ্যাং যাবন্তি নক্রাণি তেষু পরিমাণং তেষু চ যাবন্মাত্রং জলমেতৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষদৃষ্টমিব কথয়ামাস। যবনাধিপোঽপি তস্য সৌন্দর্য্যং মেধাবিত্বং প্রাগল্‌ভ্যং চ সংস্মৃত্য প্রাহ। ভবতা প্রাগল্‌ভ্যাদিনা ভৃশং পরিতোষিতোঽস্মি, তস্মান্ মার্দ্ধং হুগলিপ্রদেশে সমাগচ্ছেতি। সোঽপি ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রয়িত্বা তথা চকার। তত্র গতে চ তস্মিন বহুমানপুরঃসরং বস্ত্রালঙ্কারাদিকং ভক্ষণাদার্থবস্তিতব্যধনং চ দত্বা পারসীকশাস্ত্রমধ্যেতুং নিয়ো-জয়ামাস ; নিয়োজিতশ্চ তীক্ষ্ণবুদ্ধিত্বাৎ স্বল্পেনৈব কালেন সমধিগতাখিলপারসীকশাস্ত্রার্থস্তত্র যবনাধিপস্য তোষমধিকং জনয়ামাস। পরিতুষ্টশ্চ যবনেশ্বরোঽখিলদেশিকভাষাপ্রসিদ্ধকানুনগোই

সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার অপূর্ব্ব মুখচন্দ্রদর্শনে পৌরজনের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। নবপ্রসূত কুমারের কুসুম-সুকুমার অঙ্গ-নিপীড়নে প্রণয়ি-বিরহবিধুরা হতভাগিনী কামিনীর মন প্রাণ হৃদয় দিন দিন শীতল হইতে লাগিল। কুলপুরোহিত এবং পণ্ডিত-বর্গেও রামের সদৃশ শিশুর অনন্যানুপম রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন। হরেকৃষ্ণ সমুদ্দারও নিঃসন্তান ছিলেন; গুণোপেত রামচন্দ্র লাভ করিয়া তাঁহারও হৃদয় আহ্লাদে উথলিয়া উঠিল। শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে পিণ্ডবিচ্ছেদশঙ্কা বার পর নাই মহান্ ক্ষোভের হেতু, সুতরাং পিণ্ডসেকসাধনের নিধি আজ হস্তে পাইয়া তাহাকে কৃত্রিম পুত্ররূপে বহু স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কশ্চিদ্ নিয়োজয়িতুমুদ্যতো দুর্গাদাসোজগাদ বয়ং পুরুষক্রমেণ রাজ্ঞানঃ, পরসেবাং কদাপি ন জানীমঃ। ততোযবনাধিপঃ পুনরাহ ময়া লিপিদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরং নিবেদ্য ভবতো নাম্না সমুৎকর্ষো রাজ্যং চ দাপয়িষ্যতে। ইদানীং ময়োক্তং কুরু। অনন্তরং তথা কুর্ব্বতঃ তস্য কিয়দ্দিনানন্তরং ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরেণাদিষ্টভবানন্দমজুন্দারেতি খ্যাতিং লব্ধবতঃ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরাদিষ্টতয়া কানগোই কর্ম্মণি স্থৈর্য্যং বভূব।

কিয়ৎকালানন্তরং নিজালয়মাগত্য ভ্রাতৃভির্বিভক্তো বল্লভপুরনামনগরে পুরীং নির্ম্মায় সমু-ন্নারপ্রাপ্তপৈতৃকরাজ্যং বিংশতিবর্ষান্ শশাস। হরিবল্লভরায়শ্চ ফতেপুরনামগ্রামে জগদীশঃ কুড়ালগাছিগ্রামে সুবুদ্ধিরায়ঃ পাটকাবাড়িগ্রামে পুরীং নির্ম্মায় সুখমবাৎসুঃ। তদানীং চ বঙ্গালি-বিষয়েষু * তেষ্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্ত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোপি করং গ্রহীতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশনৃপতীন্ স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্তু পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরবহুসৈন্যানি নির্জ্জিত্য দ্বিতীয়েন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জাঁহাগীরনগরাধিকৃতামাত্যেন কুশলিসংস্থিতামাত্যেন চ প্রতাপা-দিত্যস্য দৌর্জ্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরং বিজ্ঞাপয়ামাস, যথা প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রবর্ম্মিণঃ, একপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিনঃ, অশ্বারোহাঃ অপি বহবঃ, মত্তহস্তিনাং বহুযূথাঃ সন্তি অন্যে চাসংখ্যামুদ্গর-প্রাসাদিহস্তাঃ। এভির্ব্বলৈঃ স ক্ষুদ্রান্ নৃপান্ বাধতে। কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়োনিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহত-পিত্রাদিস্বজন একশিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ। অতস্তং শিশুং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে সর্ব্বানুরূপলক্ষণশীলশ্চ প্রতাপাদিত্যাহুতং হন্তমন্বিদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতুং প্রবর্ত্ততে। অতোপজাতাদিপরিবারিতবহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াসাতি তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি।

---

* প্রতাপাদিত্যপ্রধানাদ্বাদশ রাজানোনিকরং পৃথিবীমুপভুঞ্জন্তে স্ম।

আকৃতিই হৃদয়ের পরিচায়িকা। রামচন্দ্রের যেমন প্রসন্ন মূর্ত্তি তাঁহার সদ্‌গুণও তদ্রূপ দিন দিন স্ফুটিত হইয়া পড়িল। তিনি শৈশবাবস্থায় সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী হইলেন এবং নীতিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিল। সমুদ্দার যথাকালে তাঁহার উপনয়নাদি সংস্কার সমাধান পূর্ব্বক যৌবনে বুদ্ধি বিবেচনার পক্কতা দেখিয়া তদীয় হস্তে স্বীয় সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিলেন। করিবেন না কেন?—সৎপাত্রই রাজ্য শাসনের প্রকৃত অধিকারী। হরেকৃষ্ণ সমুদ্দার কেবল যে স্নেহমুগ্ধ বাৎসল্য নিবন্ধন রামচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এমত নহে, কাশীনাথ পুত্র একে ত মহদ্বংশজাত তাহাতে আবার সকল সদ্‌গুণের আকর; অতএব তিনি রাজসিংহাসনে আসীন হইবেন না কেন?—অমূল্য মরকত পাইলে কণ্ঠহারে পরাইতে কার না সাধ হয়?

রামচন্দ্রের পিতা কাশীনাথ রায়; পরন্তু তিনি পিতার উপাধিতে লোক-সমাজে খ্যাত হন নাই। তিনি সমুদ্দারের অন্নে পালিত, পরিশেষে সমুদ্দারের ঐশ্বর্য্যেই সমৃদ্ধ, লোকে আর কি তাঁহার রায় উপাধি সংগত জ্ঞান করিতে পারে?—কাজেই তিনি রামচন্দ্র "সমুদ্দার" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

পাঠক! এই ত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত পুস্তকের মত। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, হরেকৃষ্ণ সমুদ্দার অপুত্রক ছিলেন; অতএব পিণ্ড লোপ ভয়ে তিনি কি রামচন্দ্রকে কৃত্রিম পুত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই? হরেকৃষ্ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া যে এমন সুযোগে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বোধ হয় না। একে তিনি অপত্যবিহীন তাহাতে আবার বিপুল-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; সে জন্য বিবেচনা হয়, তাঁহার বাটীতে রামচন্দ্রের জন্ম না হইলে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল বিধাতা গৃহে আনিয়া পুত্রধন মিলাইয়া দিলেন,—কাশীনাথকুমার পুত্রস্থানীয় করিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবেন, অনুমান হইতেছে এবং তজ্জন্যই তাঁহার উপাধি "সমুদ্দার" হইল। পরন্তু এ সম্বন্ধে একটী উৎকট আপত্তি আছে। রামচন্দ্র সমুদ্দার উপাধি দ্বারা বিখ্যাত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্র দুর্গাদাস রায় নামে প্রথিত হন, দেখিতেছি। যথা ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত পুস্তকে তেবাং জ্যেষ্ঠো দুর্গাদাসরায় ইত্যাদি। রামচন্দ্র বিধিমত সংস্কার দ্বারা পোষ্যপুত্র গৃহীত হইলে তদীয় কুলানুক্রমে সমুদ্দার উপাধি

চলিয়া আসিত, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা কি নিমিত্ত রায় উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ হইলেন বলিতে পারি না।

রামচন্দ্র মজুমদারের পত্নীর নাম সীতাদেবী (ক) এই রূপগুণসম্পন্না কুলশীলা কামিনীর গর্ভে চারিটী পুত্র জন্মে,—দুর্গাদাস, হরিবল্লভ, জগদীশ এবং সুবুদ্ধি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসই অতঃপর ভবানন্দ (খ) মজুন্দার নামে বিখ্যাত হন। তিনি শিশুকালেই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণবত্তা এবং মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই প্রীত হইতেন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ভবানন্দের উপনয়ন সংস্কার সমাপ্ত হইল; কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে মণিময় কেয়ূরবলয়, কটিতে বিশুদ্ধ ক্ষৌমবাস, নবীন ব্রহ্মচারী কৌতুকাবিষ্ট হইয়া বল্লভপুর সমীপবর্ত্তী জলঙ্গীতটে বসিয়া কল্লোচ্ছ্বাস-বাহ্যমান নৌকাশ্রেণী প্রভৃতির শোভাসৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় স্পষ্ট সৈনিক লক্ষণে উপলক্ষিত কতকগুলি তরণী সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট-প্রেরিত জনৈক অমাত্য ছিলেন। একে সৈন্যবল,—স্বেচ্ছাচারিতাই চিত্তের নিয়ন্ত্রী, মায়া, দয়া, সদ্বিবেচনা,—ইচ্ছাময় সৈনিকপুরুষদিগের ইচ্ছাই সব; এ আবার অন্যের সৈন্য নয়,—যদৃচ্ছাচারী যবন নৃপতির! কাজেই তত্রত্য যাবতীয় লোক অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কেবল নির্ভীক ভবানন্দ সহাস্যবদনে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহৎকুলজাতত্ব ভিন্ন হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্ভবে না, হৃদয়ের প্রশস্ততাব্যতিরেকে তেজস্বিতার সম্ভাবনা কোথায়? আবার তেজস্বিতা না থাকিলে ক্ষীণচিত্তে কি সাহস জন্মে? ভবানন্দ মহদ্বংশসম্ভূত বালক—সিংহশাবকের ন্যায় অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। আলোকে পতঙ্গ এবং সদ্‌গুণে গুণগ্রাহীর চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়; স্ফাটিকে প্রতিবিম্বের ন্যায় দৃষ্টিসঞ্চালন মাত্রেই ভবানন্দের প্রতি অমাত্যের নেত্র নিপতিত হইল। বালকের

(ক) তাহে রামসমুন্দার নাম একজন।
শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাঁহার গৃহিণী।

অন্নদামঙ্গল।

(খ) জন্মিল হইল নন্দকুমার স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥ ঐ

অসামান্য সাহস এবং অপরূপ রূপমাধুরী দৃষ্টে প্রীত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণ কুমার! এ স্থান হইতে হুগলি নগর কতদূর বলিতে পার? কোন্ কোন্ নদী দিয়া তথায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহা কি জান?" ?

ব্যসনাসক্ত সৌখীন জমিদারের সন্তান দেহের পারিপাট্য-সম্পাদনেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন। বহির্বাটীতে পদার্পণ করিলে পরিচারকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কেহ মস্তকে ছত্র ধরিতেছে, কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ কোমল গাত্রমার্জ্জনীতে অঙ্গের স্বেদবিন্দু মুচাইয়া দিতেছে;—নবনীততনু রবিতাপে গলিয়া পড়ে! দুর্গাদাস রায় তেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি দৃঢ়কায় ও অংসল, সর্ব্বদা ব্যায়ামাদিতে রত থাকিতেন, নদীকূলে বিচরণ করিতেন; কেবল দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে চিত্রপটখানি হইয়া থাকিতেন না। ঐশ্বর্য্যগরিমায় ভারী হইয়া নীচ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লজ্জিত হইতেন না। তিনি সমস্ত বিষয়ের তথ্যজিজ্ঞাসু ছিলেন; নদীকূলে বিচরণ করিতেন, নানা দিগ্‌দেশ হইতে নাবিকেরা আসিত, তাহাদের নিকট সমস্ত দেশের বিবরণ অবগত হইতেন। তিনি কখন বিদেশে যান নাই, কিন্তু নাবিকদিগের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন,—কোথায় কোন নদী, কোথায় তাহার কিরূপ গতিবক্রতা এবং কত জল, যবনাযাতাকে তাহার যথাবৎ যাবতীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন।

এক্ষণে আমরা ভাগীরথীর যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সম্প্রতি উহার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণ আসিয়া আজি যদি অধুনাতন ভাগীরথীর দশা দেখেন, তাঁহারা মনে কি করিবেন?—এ কি সেই সরস্বতী সহচারিণী জাহ্নবী? কই—আজ সে মুক্তবেণী কোথায়? তাঁহারা কি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন? কালস্রোতে পড়িয়া আজ সে স্রোতস্বিনী কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, আর ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না? সে সরস্বতী বা যমুনা কই?—এখন কোন স্থানে কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, কোন স্থানে বসুন্ধরা জননী আলুলায়িত বেণীর কেবল রেখা মাত্র দেখাইয়া দিতেছেন। আজি ত্রিবেণী নাম আছে, কিন্ত সরস্বতী, যমুনা আমাদের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অধুনা সামান্য খাত আর বালির রাশি,—সে তুমুল প্রবাহ আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

এখন চিহ্ন নাই আর সে সমৃদ্ধ নগরের কিছুই নাই; নহিলে পাঠক!

তোমাকে দেখাইয়া দিতাম,—ঐ সরস্বতী, ঐ সরস্বতীর সপত্নী-নিলয় সপ্তগ্রাম নগর,—কমলা সৌভাগ্যজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া কেমন এখানে হাসিতে হাসিতে বিশ্রাম করিতেন; তাঁহার ক্ষিপ্রপদ ত্রিভুবন পর্য্যটনে যেন শ্রান্ত হইয়াই বিগতক্লম হইবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল এখানে সুস্থির ছিল। নানা দেশের পোতাবলী বাণিজ্যোপকরণ বক্ষে করিয়া ছায়াপথের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে; স্রোতস্বিনী-হৃদয় তুষারবিচ্ছুরিত ধবল পতাকায় আলোকিত হইয়াছে; দ্রব্যের বিক্ষেপ ধ্বনি, শকটের সংঘর্ষনাদ, জনতার কোলাহল,—বলিব কি?—সে সমৃদ্ধ নগরের বিভব আর কিছুই নাই; সরস্বতী এখন শুষ্কসলিলা, বালুকায় অন্তর্লীনা; সরস্বতীর উত্তরতট আছে, কিন্তু সপ্তগ্রামের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে;—আর বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া বিনিময় করিতে আসেন না; কাল তাঁহাদের পথ আবরুদ্ধ করিয়াছে।

পাঠক! এখন আইস তোমাকে দেখাই; চিনিতে (২) পার?—এই সে কালকালিন্দী। যমুনা কলিন্দ দেশে উদ্ভূত হইলেন; সহচরী সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, দলিতকজ্জল স্বচ্ছ জলে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছেন; এখন পথে,—বনের পাখীও ভুলিয়াছে, যমুনাও কি আর বৃন্দাবন ছাড়িয়া

---

(২) ত্রিবেণী এবং হালিসহরের নিকট গঙ্গা কি পর্য্যন্ত ভরাট হইয়া গিয়াছে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল হালিসহরাদিপ্রদেশনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া পরমহংস হন। বোধ করি তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন; এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম এক শত বিশ বৎসরেরও অধিক হইবে। কয়েক বৎসর গত হইল, কাশীতে হালিসহরনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথায় বার্ত্তায় উভয়ে পরিচিত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হালিসহরের সমীপবর্ত্তী স্থান সকলের যে প্রকার বিবরণ বলিতে লাগিলেন, পরমহংস তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি বলিলেন,—পূর্ব্বে যেখানে খেয়া দেওয়া হইত, তথায় ঘাটমাঝির বাড়ী ও একটী তুলসী মণ্ডপ ছিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ মাঝীর বাড়ী অধুনাতন গঙ্গাতট হইতে নিতান্ত অল্প দূরে নয়, প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

এখনও আমরা দেখিতেছি, চড়া পড়িয়া গঙ্গার অনেকাংশ ভরাট হইয়া যাইতেছে; কিন্তু কবিকঙ্কণেও হালিসহরের নাম আছে,—"বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।" তবে উপরের গল্পটী কিরূপ প্রামাণিক? কই—লোকের বাসস্থান ত সরিয়া যায় নাই?

পাঠক! চণ্ডীকাব্যেও সপ্তগ্রামের সুখ্যাতি দেখুন,—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়, ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম। সপ্তঋষি শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম।

আসিতেন ?—উজান বহিলেন, স্থির হইলেন, থাকিতে মন,—স্থির থাকিতে পারিলেন না,—প্রিয়সখী জাহ্নবীর কাছে মোহনবেণুর সুসমাচার বলিতে আসিলেন। সহচরী পাইলে কার সাধ ছাড়িয়া দেন, প্রয়াগে আজ উভয়ের গাঢ় আলিঙ্গন দেখ! যুক্তবেণীর আজ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর! সেই কালকালিন্দী এখানে বিশ্লিষ্ট হইয়াছেন, গুপ্তের সন্নিকটে এই পূর্ব্ব-বাহিনী নদী সেই যমুনা। ইনি ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে টাকির সন্নিকটে ইচ্ছামতীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। ওদিকে সরস্বতী পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহিনী হইয়া উলুবেড়িয়ার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন।

যবনাধিপতি দুর্গাদাসের মধুর বাক্য শ্রবণে ও অনুপম সৌন্দর্য্য অসাধারণ মেধাবিত্ব এবং প্রাগলভ সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—বৎস! তোমার প্রাগলভ্যাদি দেখিয়া আমি যার পর নাই তুষ্ট হইলাম। আইস—"আমার সঙ্গে হুগলি যাইবে; আমি তোমাকে পারসীক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করাইয়া তোমার বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন করিব।" দুর্গাদাস ভ্রাতৃগণের সহিত পরা-মর্শ করিয়া অমাত্যের সঙ্গে হুগলি প্রস্থান করিলেন। হুগলিতে উপনীত হইয়া অমাত্যবর বহুসমাদরে তাঁহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং পারসীক বিদ্যা শিক্ষার্থ সদ্‌গুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। দুর্গাদাস অনন্য-সাধারণ প্রতিভাবলে স্বল্পদিনেই কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। হুগলির শাসন-কর্তা তদীয় ধীশক্তি অধ্যবসায় এবং বিদ্যানুরাগিতা দেখিয়া তাঁহাকে কানন-গোই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করেন; কিন্তু দুর্গাদাস জমিদারের সন্তান, স্বয়ংও সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রভুসেবা এবং পরোপাসনা কখন জানেন না, তিনি কি আনুগত্য স্বীকার করিতে পারেন? সুতরাং অমাত্যের আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। দুর্গাদাস দেশাধিপতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না; বরং স্নেহপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বৎস! তুমি আমার বাক্য ঠেলিও না; এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহাই কর। অতঃপর সম্রাটকে জানাইয়া তোমার পূর্ব্বরাজ্য অবশ্যই প্রত্যর্পণ করিব।" তৎকালে দুর্গাদাস যথার্থই বুদ্ধিমত্তার কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তিনি অমাত্যের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নবাব দিল্লীশ্বরের সনন্দ আনাইয়া তাঁহাকে স্থায়ী কর্ম্মভার এবং ভবানন্দ মজুমদার এই উপাধি প্রদান করিলেন।

কিছু দিন পরে ভবানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া মজুমদারত্ব তাঁহার

পৈতৃক বিষয় কনিষ্ঠগণের সহিত বিভক্ত করিয়া লইলেন। তিনি স্বয়ং বল্লভপুর গ্রামে অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বিংশতি বৎসর পরম ভোগ-সুখে রাজ্যশাসন করেন। এ দিকে তদীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে হরিবল্লভ রায় ফতেপুরে, কুড়ালগাছি গ্রামে জগদীশ রায় এবং পাটিকা খাড়ীতে সুবুদ্ধি রায় এক একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

তদানীন্তন বঙ্গদেশের দ্বাদশ জন (৩) প্রসিদ্ধ নৃপতির মধ্যে যশোহর নগরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যই অধিকতর প্রবল ছিলেন। তিনি কাহারও করদ রাজা ছিলেন না; স্বীয় ভুজবীর্য্যে বঙ্গদেশে একাধিপত্য স্থাপন করেন; তাঁহার তীব্র প্রতাপের কথা অধিক কি বলিব,—দিল্লীর সম্রাটকেও তিনি তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। ক্রমে ক্রমে সকল নৃপতিই পরাস্ত হইয়া যবনরাজকে কর দিতে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুতেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। দিল্লীশ্বর যতবার তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেন। সৈনিক-বলের সেনা-নায়কের ও অশ্বগজের রুধির-স্রোতে যশোহর নগরে প্রবাহ বহিতে লাগিল। বিভিন্ন দেহ বিচ্ছিন্ন মুণ্ড ও হস্তহস্তিমনুষ্যদেহে সুরম্য জানপদভূমিও ভীষণ শ্মশানের ন্যায় হইয়া পড়িল। তখন এ বঙ্গ নয়, তখন ক্ষীণ ক্ষুদ্র ছায়ানুকৃত কঙ্কালদেহ বায়ুর আশ্রয়ে বঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইত না। তখন বঙ্গবাসীরা বীরপুরুষ ছিলেন,—সংগ্রামে রুদ্ররূপী দুর্জ্জয় ধূর্জ্জটি।

ক্রমে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ যবনামাত্যদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। জাহাঙ্গীর নগরের (৪) এবং হুগলির শাসনকর্ত্তারা সর্ব্বদাই

---

(৩) এই দ্বাদশ জন নৃপতি সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন এ, লক্ষকোট, বর্দ্ধমান, রাজনগর বিষ্ণু, মল্লারপুর, নবদ্বীপ, যশোহর, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, নারায়ণ-গড়, তমোলুক এবং কুচবিহার। কেহ কেহ এতন্মধ্যে বর্দ্ধমান গণনা না করিয়া সিংপাহাড়ী গণনা করেন।

(৪) পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা নগর বহুকাল হইতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। ঢাকার চিকণ বিচিত্র কার্পাসবস্ত্র এবং জরির কাজ জগদ্বিখ্যাত। পরে যশোহর নগর স্থাপিত হইলে উহা ঢাকার অনেক যশোহরণ করে, তজ্জন্য উহার নাম যশোহর হইল। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় পর্ত্তুগিজ জলদস্যুরে প্রবল অত্যাচার আরম্ভ হয়। তাহার প্রতীকার নিমিত্ত

সশঙ্কিত থাকিতেন। তাঁহার দ্বারে বাবান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার ধন্বী, এবং অসংখ্য হয় হস্তী সুদৃঢ়প্রাসাদী বিদ্যমান থাকিত। অমাত্যেরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত দিল্লীশ্বরকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

প্রতাপাদিত্য রাজা নিতান্ত অত্যাচারী ছিলেন। কখন যে লোকের প্রতি সদয়াচরণ করিয়াছিলেন, এমন প্রতীতি হয় না। অন্যের কথা কি, তাঁহার আত্মীয় স্বজনও তদীয় নিষ্ঠুর হস্তের উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে (৫) তিনি সবংশে নিধন করেন। রোমক গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ কর, যেখানে অত্যাচার, বিনাশ তাহার অধিক দূরবর্ত্তী নয়। অত্যাচারীর প্রতি কেবল মনুষ্য কেন, বিধাতাও বিমুখ হন। এই ভৌতিক জগৎও যেন অদ্ভুত ভৌতিক নিয়ম দ্বারা তাহাকে অকষ্টবন্ধে ফেলিয়া দেয়। মহারথি কর্ণবীরের নিধন বিবরণ শুদ্ধ কেবল কবিকপোলসম্ভূত কল্পনা নহে; সূর্য্য তেজোহরণ করিলেন, বসুমতী রথচক্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; আমরা এই নৈসর্গিক নিয়মটীকে কিছু কিছু সত্যজ্ঞান করিয়া উহার পূজা করি। রাজা বল, প্রজা বল, ধনী বল, দরিদ্র বল, নিজ নিজ ক্ষমতার যথোচিত সদ্ব্যবহার না করিলে জগৎনিয়ন্তা ক্ষুব্ধ হন, তখন ভৌতিক নিয়মও প্রতিকূল আচরণ করিতে থাকে; তখন এক একটী ভৌতিক নিয়মই বিনাশের হেতু হইয়া পড়ে।

প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে সপরিবারে বিনষ্ট করেন; ধাত্রী কেবল একমাত্র শিশুসন্তানকে কচুবনে লুক্কায়িত (৬) রাখিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। তিনিই অতঃপর কচুরায় নামে বিখ্যাত হন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকেও বধ করিবার নিমিত্ত নিয়ত তদনুসরণে ফিরিতেন, কিন্তু তাঁহার

নবাব ইস্মাইল খাঁ ১৭০৮ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী করিয়া সম্রাটের নামে উহার নামকরণ করেন। তজ্জন্য উহা জাহাঙ্গীর নগর বলিয়া বিখ্যাত হয়।

চণ্ডীকাব্যেও পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের কথা উল্লিখিত আছে,—

ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামের ডরে॥

(৫) তার খুড়া মহাশয়, আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিল। অন্নদামঙ্গল।

(৬) তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল। (অন্নদামঙ্গল)

দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পাইল না। কচুরায়, যশোহরাধিপতির যাবতীয় দুর্ব্ব্যাচরণ আনুপূর্ব্বিক সম্রাটকে বিদিত করিলেন। এ দিকে প্রদেশীয় নবাবেরাও লিখিয়া পাঠাইলেন,—"যদি স্যাৎ জনৈক প্রধানামাত্য সমভিব্যাহারে বহু সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হয়, তবে আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিগড়বদ্ধ করিয়া পাঠাইতে (৭) পারি।" জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যের স্বাতন্ত্র্য উচ্ছেদের নিমিত্ত সংকল্প করিয়া রোষপ্রস্ফুরিত অধরে দ্বাবিংশতি সেনাপতি সঙ্গে রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দিলেন,—"মানসিংহ! তুমি বহু সৈন্যপরিবৃত হইয়া বঙ্গদেশে যাও; দুরাত্মা প্রতাপাদিত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া ঝটিতি তাঁহাকে আমার নিকট আনিয়া দিবে।"

সেনানায়ক প্রভুর আদেশানুসারে বহুসৈন্য-পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে তাঁহার ছাউনি হইল, তত্রত্য যাবতীয় রাজা ও ইতর লোক ভয়ে কোথায় অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন, কেহই জানিতে পারিল না। অনন্তর কিছু দিন পরে তিনি চাপড়া গ্রামের নদীতটে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও কোন একটী জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কেবল উগ্রতেজা মহাসাহসিক ভবানন্দ মজুন্দার সমুচিত আশীর্ব্বচন নিবেদনাদি পূর্ব্বক যথারীতি স্বর্ণমুদ্রাদি ভেট দিয়া সেনাপতির পরিতোষ সম্পাদন

---

(৭) অনন্তরমিন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জ্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েণাপি ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জ্জন্যং গোচরীকৃতং। অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ, যথা—মানসিংহ। ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধা সমানয়তু। ততোমানসিংহোমহাপ্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যপরিবৃতো নির্জ্জগাম; নির্গতশ্চ যত্র যত্রোবাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়াঞ্চক্রিরে; রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদভূবুঃ। অথ কতিপয়দিনানন্তরং চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্ত্তিনদীতটে তৎসৈন্যং সমাজগাম। তৎসমীপস্থরাজানঃ সপরিবারাস্তস্মাত্তিরোহিতা বভূবুঃ। ভবানন্দমজুন্দারশ্চ মহাসাহসিকএক এব সাক্ষাদ্ভূয় সমুচিতাশীর্নিবেদনাদিপুরঃসরং করবিনিহিত হেমমুদ্রাদিকং সাক্ষাৎ কারয়ন্ সৎকৃত্য মানসিংহং বহুপরিতোষয়ামাস জগাদ চ। প্রভো। মহাবলপরাক্রমাণাং ভবতামাগমনেনৈতদ্দেশীয়াঃ সকলরাজানঃ পলায়িতা অহমেকঃ কতিপয়গ্রামাধিপো ধর্ম্মবিনেতারং ভবন্তং নিরীক্ষিতুমিহাসং ময়াশীর্ব্বাদকেন যদি কিঞ্চিৎ কার্য্যমস্তি তদাজ্ঞাপয়েতি।

করেন। অতঃপর তিনি মানসিংহকে বলিলেন,—"প্রভু! দেখুন, এতদ্দেশে অনেক ধনাঢ্য জমিদার আছেন, কিন্তু আপনার আগমনে তাঁহারা কেহই উপস্থিত নাই। আমি কতিপয় গ্রামের সামান্য জমিদার, আপনি ধর্ম্মবিজেতা; মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমা হইতে আপনার যদি কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, আজ্ঞা করুন—সম্পন্ন করিব।"

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীরা নিতান্ত বীর্য্যহীন কাপুরুষ ছিলেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ বলবন্ত অস্ত্রকুশল এবং রণনিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এক এক জন মহাশূর জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের বলদর্পে মেদিনী কম্পিত হইত। রাধানাথ গোপ, ধনকৃষ্ণ রায়, রঘুনাথ রায়, রামদাস বাবু প্রভৃতি মহামহাবীর বঙ্গের এক একজন অসুর অবতার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রয়োজন হইলে, বীরসিংহপুরের নৃপতি দেশীয় মল্ল ভল্ল প্রভৃতি সমরদক্ষ জাতিকে প্রেরণ করিতেন। নবাব তাহাদের অপরিক্ষুণ্ণ সাহস এবং যুদ্ধে স্থিরতা দর্শনে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, মোগল পাঠান শকাদি বীর জাতিরাও তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিত না। পাঠক! তবে যে মানসিংহের আগমনে জমিদার ও প্রজাগণ পলায়নপর হইলেন, তাহার কারণ কি? এ ভীরুতার নিদর্শন কি নিমিত্ত লক্ষিত হয়? পূর্ব্বে সৈনিকেরা জমিদার এবং প্রজার প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত; এখনও যে, সে অত্যাচার এককালে নিরাকৃত হইয়াছে তাহা বলি না,—তবে অতি মন্দের কিছু ভাল। জমিদারেরা সৈন্যসামন্তের ভোজ্যাপকরণের ভাণ্ডারী ছিলেন, প্রজার শোণিতে সেনার উদর পূরণ করিতেন। এ দিকে কায়ক্লেশে অহোরাত্র সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে হইত,—কিন্তু বেতন নাই। পাঠক! বলুন দেখি, তবে লোকের অপরাধ কি? প্রত্যাসন্ন সৈনিকপুরুষের বার্ত্তা শুনিলে কেন না সকলে পলায়ন করিবেন? আমরা ইহাকে ভীরুতা বলি না,—এটী দুর্জ্জনের দূর পরিহার।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কর্ম্মই প্রধানপ্রবৃত্তির কারণ, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদির যে আপত্তি আছে, তদুত্থাপন করিয়া এক্ষণে তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবিচিত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥ সূ ॥

অপ্রত্যক্ষতয়া ধর্ম্মাপলাপো ন সম্ভবতি প্রকৃতিকার্য্যেষু বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্ত্যা তদনুমানাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতির কার্য্য অতি বিচিত্র। ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধন সেই বিচিত্রতা হইয়া থাকে। যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিত, জগতের এরূপ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইত না। ফলতঃ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ না হইলেও ধর্ম্ম যে আছেন, জগতের বিচিত্র তার দ্বারা সে অনুমান হইতেছে। সাংখ্যকারের মত এই, জগতে যে মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গাদি নানাবিধ জঙ্গম ও পর্ব্বত বৃক্ষাদি নানাপ্রকার স্থাবর পদার্থ আছে, কর্ম্মই এই বিভিন্ন দেহধারণের কারণ। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মময়। ধর্ম্ম যে আছেন, তাহা এই বিচিত্র সৃষ্টির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে।

ধর্ম্ম যে আছেন, তাহার অন্য প্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎ সিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥ সূ ॥

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন ভবতি পাপঃ পাপেনেত্যাদিশ্রুতেঃ স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেতেতিবিধ্যাদিরূপালিঙ্গাৎ যোগিপ্রত্যক্ষাদিভিশ্চ তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়, ইত্যাদি শ্রুতি এবং যে ব্যক্তির স্বর্গলাভ কমনা আছে তিনি অশ্বমেধ যাগ করিবেন, ইত্যাদি বিধিও আছে। অপর, ধর্ম্ম যোগিগণের প্রত্যক্ষ হয়। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম যে আছেন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ ॥ ২২ ॥ সূ ॥

প্রত্যক্ষাভাবাৎ বস্বভাব ইতি নিয়মোনাস্তি প্রমাণান্তরেণাপি বস্তূনাং বিষয়ীকরণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যে বস্তুর প্রত্যক্ষ না হয়, সে বস্তু নাই, এ নিয়ম নয়, অন্য প্রমাণ দ্বারাও

যে বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ধর্ম্ম নাই, এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারাও তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও যে আছে, তাহা প্রমাণ করা হইতেছে।

উভয়ত্রাপ্যেবং ॥ ২৩ ॥ সূ ॥

ধর্ম্মবদধর্ম্মেঽপ্যেবং প্রমাণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

যে যে প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মসিদ্ধি হইতেছে, সেই সেই প্রমাণ দ্বারা অধর্ম্ম যে আছে, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

যদি বল, স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ দ্বারা যাগ করিবে, এই বিধিবাক্য দ্বারা ধর্ম্মসত্তা যেমন প্রমাণ হইতেছে, তেমন অধর্ম্মসত্তা-বোধক কোন বিধি বাক্য নাই। তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ ॥ ২৪ ॥ সূ ॥

নম্বু বিধ্যন্যথানুপপত্তিরূপয়া অর্থাপত্ত্যা ধর্ম্মসিদ্ধিঃ না চ নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি কথং শ্রৌতলিঙ্গাতিদেশেঽধর্ম্ম ইতি চেন্ন যতঃ সমানমুভয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্নিরূপণমস্তি পরদারান্ন গচ্ছেদিতি নিষেধবিধ্যাদেরেবাধর্ম্মনিরূপণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ধর্ম্ম নাই, যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবে, এ বিধি বাক্য বিফল হয়। এই বিধি বাক্য দ্বারা যেমন ধর্ম্ম-সিদ্ধি হইতেছে, তেমনি পরদারগামী হইবে না, এই নিষেধ বিধিদ্বারাও অধর্ম্ম সিদ্ধি হইতেছে। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এ উভয়েরই সত্তাসম্বন্ধে প্রমাণ সমান।

ভ্রমসংশোধন।

আপনার প্রকাশিত কল্পদ্রুম ৪ র্থ ভাগ ৫ ম সংখ্যায় দেবগণের মর্ত্তো আগমন প্রবন্ধে দেবগণের বালি উত্তরপাড়ায় উপস্থিত হওয়ায় যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম, দুঃখের মধ্যে বরুণ দেব জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় দিতে গিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত রাজ কিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অযথা পিতৃ-পদ বাচ্যে বর্ণনা করিয়াছেন—বস্তুতঃ রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ৮ রামধন মুখোপাধ্যায়ের সন্তান, মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈমাত্রেয়, স্বর্গের মুখটী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান—ইনি মিলিটরী বা সৈনিক

বিভাগে ঐ একজামিনর আফিসে ২০।২১ বৎসর অডিটর পদে নিযুক্ত থাকিয়া এক্ষণেও বা ১৩০ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। আর জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় ফুলের মুখটী গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান—জয়কৃষ্ণ বাবু এবং জগন্মোহন বাবু উভয় পিতা পুত্রে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, কিছু দিন পরে ভরতপুর যুদ্ধে সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন—তথায় কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক দেশে প্রত্যাগমন করিয়া জমিদারি ক্রয় পূর্ব্বক উন্নতির সোপান ক্রমশঃ প্রশস্ত করেন। অতএব যখন উভয়ের সর্ব্বপ্রকারে এত প্রভেদ, তখন কিরূপে এক অন্তরদত্তে একের বর্ণনে অপরের সন্নিবেশ হইতে পারে? বোধ হয়, জলাধিপের বেলা আধিক্য বশতই হউক বা প্রখর রবিকিরণে তাপিত হইয়াই হউক বলিতে পারি না, যে, কি কারণে এরূপ বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল!!! তাঁহার জানা উচিত, যে তিনি, কি গুরুতর পদে বা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। যে পদে মায়া, দয়া, কারুণ্য, রাগ, দ্বেষ, ত্যাগ করিতে হয়, যে পদে নিঃস্বার্থভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও স্থির বিবেকবুদ্ধিতে প্রত্যেককেই সমভাবে দেখিতে হয়, সে পদে অযোগ্য যোজনা করিলে যে কত অসম্ভাবিত বিষয় সাধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি আছে!!! যাহা হউক, বারিধিপতির অত উতলা হইবার আবশ্যকতা কি ছিল? যখন প্রবাসে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন ইন্দ্রিয় দমনই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মহৌষধ। আর যদি একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তবে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া ভাল হয় নাই বোধ হয় রাত্রিবাস করিলে কষ্টেরও লাঘব হইত এবং যে উদ্দেশ্যে এ মর্ত্তাধামে আগমন তাহারও কতক কতক ফল প্রাপ্ত হইতেন।

দ্বিতীয়তঃ—ঝুলান বা দোলায়মান সেতু যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুরূপই হইয়াছে, তবে দুঃখের মধ্যে এই যে উক্ত বর্ণনার সেতুটী আর নাই। ইংরাজ বাহাদুরের সৈন্যগণ ও কামান প্রভৃতির গমনাগমনের জন্য উহাকে সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে লৌহস্তম্ভ প্রোথিত গার্টারব্রিজ বা দৃঢ়কায় সেতু বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতু বরণ এণ্ড কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হকেডে এবং ওভরসিয়ার বাবু নবীনচন্দ্র রায় এই দুই মহাত্মার অধ্যবসায় ও দৃঢ় যত্নে আট মাসের মধ্যে অতি সুচারুরূপে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। প্রস্তুত করিতে ৮০।৮৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

আপনার একান্ত বশম্বদ—শ্রীশিবনারায়ণ সিংহ।